উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

ডাক দিয়ে যাই তোমায়

হে মুসলিম তরুণী

ডাক দিয়ে যাই তোমায়

হে মুসলিম তরুণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

বর্তমান সমাজের নাজুক পরিস্থিতির কথা আমাদের কারও অজানা নয়। বাতিলের প্রতি প্রলুব্ধকারী হরেক বস্তু প্রতিনিয়ত মন্দের দিকে হাতছানি দিয়ে ডেকে চলছে আমাদের তরুণ-তরুণীদের। টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, নাট্যশালা, অশ্লীল গল্প-উপন্যাস... নানান মাধ্যমে নানান উপায়ে শয়তান ও তার দোসররা আমাদের তরুণ-তরুণীদের ডেকে যায় নিষিদ্ধ জগতের দিকে। পাশ্চাত্যের অশ্লীল-নোংরা কৃষ্টি-কালচারকে তারা ফোকাস করছে সভ্যতা ও উন্নত জীবনাচারের নামে। দুঃখজনক হলেও সত্য একদিকে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলছে গুনাহ ও অপরাধকর্মের দিকে বাতিলের এমন অনবরত আহ্বান আর অন্যদিকে পরিলক্ষিত হচ্ছে নিজেদের সন্তানদের নিয়ে বর্তমানের মা-বাবাদের অবহেলা-উদাসীনতা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারাত্মক প্রবণতা। ফলশ্রুতিতে আমরা কী দেখছি! মুসলিম দেশগুলোতেও এখন পাশ্চাত্যের মতো ঘটা করে আয়োজন চলছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নামে নারীদেহের নগ্ন প্রদর্শন! যত্রতত্র চলছে যুবক-যুবতিদের ফ্রি-মিক্সিং, গল্প-আড্ডার আসর ও বেহায়াপনার অবাধ বিচরণ! এখনকার অনেক তরুণ-তরুণীরই স্বপ্ন নাটক-সিনেমার কথিত মডেল-তারকা হবার। আর সে লক্ষ্যে সে স্বপ্ন পূরণের আশায় নিজেদের তারা ব্যস্ত রাখছে পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণে।

আসলে বাতিলরা ভালো করেই জানে, আজকের তরুণ-তরুণীরাই আগামী প্রজন্মের অভিভাবক। তারা যেমন মন-মানসিকতা লালন করবে, তাদের সন্তানদের সেভাবেই গড়ে তুলবে। তাই তো বাতিলদের অন্যতম লক্ষ্য হলো মুসলিম ভূখণ্ডের তরুণ-তরুণীদেরকে পাশ্চাত্যের লাইফ-স্টাইলমুখী করে তোলা। সে লক্ষ্যেই তারা কাজ করছে আর আমাদের মুসলিম সমাজেও এর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারীদেরকে পথভ্রষ্ট করে তাদেরকেই পথভ্রষ্টতার হাতিয়ার বানানোর এক গভীর চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে তারা। নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকার... এমন মুখরোচক হরেক বুলি আওড়িয়ে মুসলিম নারীদেরকে তারা ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি বিরাগভাজন করে তুলছে। পর্দাকে নারীর উন্নতির অন্তরায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। এভাবে

নানা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে আগামী প্রজন্মকে ইসলামবিমুখ করে তোলাই বাতিলদের মূল টার্গেট।

এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের মুসলিমদের বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের সামনে বাতিলের অসারতাগুলো তুলে ধরে তাদেরকে বাতিলের হীন চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দেওয়া যে কতটা জরুরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ লক্ষ্যেই বয়ান-বক্তৃতা, লেখালেখি, দাওয়াহর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে পথভোলা মুসলিমদের দ্বীনের পথে আহ্বান করে চলেছেন উম্মাহর দরদি দায়িগণ। এমনই একজন যুগসচেতন দায়ি ইলাল্লাহ হলেন উসতাজ হাসসান শামসি পাশা; যিনি পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা পূজারিদের বিভিন্ন সংশয়ের জবাব দিয়ে, তাদের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিক এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরে মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের উদ্দেশে স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তো মুসলিম তরুণীদের উদ্দেশে রচিত শাইখের দরদমাখা আহ্বান (همسة في أذن فتاة) গ্রন্থটিই আমরা প্রকাশ করেছি 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণী' নামে। হৃদয়গ্রাহী চমৎকার এক ভূমিকাসহ ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত তথ্যবহুল এ বইটিতে পথভোলা ও সত্যান্বেষী তরুণীদের জন্য রয়েছে আলোকিত পথের দিশা লাভের ইমানদীপ্ত কিছু দৃষ্টান্ত; রয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে আলোর পথে ফিরে আসা নারীদের কিছু উপাখ্যান, রয়েছে উত্তম চরিত্র গঠনের বেশ কিছু গুণাবলির বর্ণনা, রয়েছে বিভিন্ন সংশয়ের জবাব এবং সত্যের পথে চলার কিছু সদুপদেশ ও উত্তম দিকনির্দেশনা।...

আমরা আশা করি, বইটি অধ্যয়নে বিভিন্ন সংশয়ে নিপতিত পথভোলা নারীরা এবং আমাদের সত্যান্বেষী বোনেরা সঠিক পথের দিশা পাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন (আমিন)।

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ড. হাসসান শামসি পাশা সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দায়ি। বিরল মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী এই লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার হিম্‌স শহরে ১৯৫১ সালে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জন্মস্থান হিমস শহরেই শেষ করেন। তারপর তিনি হালব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে তিনি অনার্স শেষ করেন। মেধা তালিকায় তিনি শীর্ষ পাঁচ জনের অন্যতম ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন বিষয়ে মাস্টার্স করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি।' এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান।

ব্রিটেন থেকে ফিরে তিনি সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। আরবের বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। হৃদরোগ, স্বাস্থ্যবিধি, নববি চিকিৎসা, ইতিহাস, সাহিত্য, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক।

তারবিয়াহ, আত্মশুদ্ধি, প্যারেন্টিং, দাম্পত্য জীবন ইত্যাদি নিয়ে তার লেখা বিখ্যাত বইগুলো হলো :

- أسعد نفسك وأسعد الآخرين
- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان
- همسة في أذن شاب
- همسة في أذن فتاة
- سهرة عائلية في رياض الجنة
- عندما يحلو المساء
- همسة في أذن زوجين

ড. হাসসান শামসি পাশা একজন শক্তিমান লেখক ও দায়ি। কলমের দক্ষ কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন গঠনের মূল্যবান সব দিকনির্দেশনা। মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের দ্বীনি তারবিয়াহর প্রতি তিনি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনের মাধুরি মিশিয়ে তিনি লিখে গেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তার প্রতিটি আলোচনা আবর্তিত হয়েছে কালামুল্লাহ বা হাদিসে রাসুলকে ঘিরে। তার লেখার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দ্বীনি ভাবধারা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়াস।

উসতাজ ড. পাশা এখনো তার দায়িসুলভ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

- রফিকুল ইসলাম

প্রকাশক, রুহামা পাবলিকেশন।
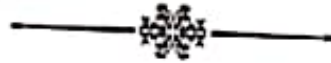
আল-ইহদা

- আমাকে ইসলামের ফিতরাত অনুযায়ী লালনপালনকারিণী মায়ের প্রতি। মা, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন।

- আমার দুনিয়াতে পাওয়া অনুপম নিয়ামত : ভালোবাসা, শান্তি ও সুখের ঠিকানা আমার স্ত্রীর প্রতি।

- দুই মেয়ের উত্তম প্রতিপালন করতে পেরেছি বলে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা, আমার দুই মেয়ে—পেশায় যারা ফার্মাসিস্ট—রিমা ও লিনার প্রতি।

- প্রত্যেক মুসলিম যুবতির প্রতি, যে প্রভুর সন্তুষ্টি তালাশ করে, উভয় জাহানের সৌভাগ্য প্রার্থনা করে।

তাদের সকলের প্রতি আমার এ বইয়ের সাওয়াবটুকু।

- হাসসান

সূচিপত্র

ভূমিকা

যখন আমরা সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখি, কোনো এক আরব দেশের মাধ্যমিকের যুবক ছাত্রদের মধ্যে ৪৫% তরুণই এ বয়সে হারাম যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত! তাদের মধ্যে ২০% যুবক মদ্যপান ও নেশা সেবন করছে, অন্তত একবার হলেও!

তালাকের তালিকা দেখে থমকে যেতে হয় যে, এক আরব রাষ্ট্রের রাজধানীতে তালাকের হার ৫০% এ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ প্রতি দুটি দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একটি তালাকের মাধ্যমে শেষ হয়ে গেছে!

আমরা আশ্চর্য হই, যখন শুনি, একই ঘরের যুবক-যুবতিরা পালাক্রমে ২৪ ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে; যেন সেসব প্রোগ্রামের কোনো তামাশাময় অংশ তাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়।

আমরা দেখছি, মিডিয়া সত্য-মিথ্যার মাঝে মিশ্রণ করে ফেলেছে।... বরং বলা ভালো, নির্দিষ্ট মহলের স্বার্থের জন্য মিডিয়া মিথ্যাকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে ছড়িয়ে দিচ্ছে।... সংস্কৃতি চর্চা, স্বাধীনতা চর্চার নামে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজকে।...

টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, রেডিও, ইন্টারনেট সব মাধ্যমই অবাধ্যতা ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি মিডিয়া-মাধ্যমই এমন বাজে কন্টেন্ট প্রচার করছে, যা আমাদের যুবক-যুবতিদের ধ্বংসের পথে ধাবিত করছে। নির্বুদ্ধিতা ও অসারতা প্রচার করছে।... কুপ্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করছে।... ইতিবাচকতাকে গ্রাস করছে। সমাজকে অবক্ষয়ে নিপতিত করছে।... এমনকি দেখা যায় রাস্তাঘাটে যুবক-যুবতিরা বিকৃত ফ্যাশন করে বেড়ায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আত্মপরিচয়হীন কিছু মানুষের আনাগোনা, যাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যাদের কেউ পুরুষত্ব খুইয়েছে, কেউ নারীত্বের অলংকার হারিয়েছে, কেউ স্থানের পবিত্রতা নষ্ট করেছে, সবাই ভুল ও নীচতার গর্তে গিয়ে পড়েছে।...

এ সময়ে এসে আমাদের মনে হতে পারে, আমরা একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছি; বরং বলা ভালো, আমরা একটা মহামারির মাঝে রয়েছি, যা আমাদেরকে প্রতিটি দিক থেকে ঘিরে আছে।...

যখন একটা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ একজন মহিলা, যার না আছে পার্থিব জ্ঞান, আর না আছে দ্বীনের জ্ঞান—যে তার মুখাবয়বকে নিকৃষ্ট রঙের মেকাপে রাঙাতে ব্যস্ত থাকে, মুখ বাঁকা করে কথা বলে, যেন মনে হয় যে, সে বিদেশ থেকে পড়ে এসেছে—এমন মা কখনো সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারে না; বরং সন্তানের মৌলিক ভিত্তি নষ্ট করে দেয়, সন্তানের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সন্তানের মাঝে কোনো রকম আত্মসম্মান থাকে না, পুরুষত্ব থাকে না, দায়িত্ব বহনের সক্ষমতা থাকে না। এরপর তখন আসে সবচেয়ে বড় বিপদ, যখন এমন কোনো সন্তান জাতির পরিচালনার দায়িত্ব পায়। এদের মতো লোকদের কারণেই অনেক জাতি, অনেক সভ্যতা ধ্বংস হচ্ছে!

যখন মা তার সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে দেয় সেবিকার হাতে, সেবিকা সন্তানকে খাওয়ায়, পরায়, দিন-রাত কোলে-পিঠে করে শিশুকে বড় করে তোলে, বাল্যবয়সে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে ঘুম পাড়ায়, ছোট শিশুর জন্য গান গায়—তখন শিশুর অন্তরে জন্মদাত্রী মা ও জন্মদাতা বাবা নয়; বরং সেবিকার মমতা ও ভালোবাসা প্রোথিত হয়!

তাই এ প্রজন্মকে আমরা নাম দিতে পারি 'সেবিকার সন্তানদের প্রজন্ম'। আবার এটাও বলতে পারি যে, আত্মভোলা, তুচ্ছ প্রজন্ম—যে প্রজন্মের বাবা-মা জানে না, তাদের সন্তান কোথায় রাত-দিন কাটিয়ে আসে। জানে না, কোন পথে চলছে তাদের সন্তান, কোন ঘাটে তার তরি ভিড়ছে, কোন দিকে তার গাড়ি চলছে!

এটাকে আমরা 'মহাসংকট' আখ্যা দিতে পারি।...

অন্যদিকে আমরা আরেকটা প্রজন্মকে দেখি, যারা এমন পঙ্কিলতার বাধ্যবাধকতা মানতে নারাজ, যারা বাতিলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে, খাঁটি ইসলামকে

হৃদয়ে লালন করে, কোনো কুপ্রবৃত্তি বা হীন প্রবণতা বা পশ্চিমা ঢেউ তাদের টলাতে পারে না।

এ প্রজন্মই হচ্ছে আমাদের আশা, তারাই ভবিষ্যৎ, এ প্রজন্মই সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের হকদার।...

একজন তরুণী তার কৈশোরে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। এ সময়ে তার নারীত্ব ও ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়। তখন সে বিশেষ জরুরি মুহূর্ত পার করে মানসিক ও মেজাজগত দিক থেকে। কখনো বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করে সে তার বাস্তবতার বিরুদ্ধে, কখনো পরিবারের বিরুদ্ধে। এমন সময়ে ক্রোধ ও অস্বীকৃতির দিকে ঝুঁকে যায় সে, প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলে খুব দ্রুত। সবশেষে তার আচরণের জন্য নিজেই লজ্জিত হয়। কখনো কখনো এ স্তরটা কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। তাই এমন বয়স যারা পার করে, সেসব যুবতির বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ ও আচরণের দরকার হতে পারে।...

একজন সচেতন মা জানেন, তার মেয়ে কখন বয়সের কোন স্তর পার করছে। সচেতন মা তার মেয়ের সাথে নৈকট্য বাড়িয়ে দেয়। তার সাথে বান্ধবীর মতো থাকে। তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাকে দ্বীন শেখায়, সচ্চরিতের সবক দেয়, জীবন-অভিজ্ঞতার কথা শোনায়।

প্রজ্ঞাবান মা তিনিই হন, যিনি শান্তভাবে নসিহত করেন, দূরে থেকেও খেয়াল করেন মেয়ের অবস্থা, শাস্তি নয় বরং কখনো কখনো তিরস্কার করে সঠিক পথে রাখেন মেয়েকে, মেয়ের সাথে এমন অবস্থান তৈরি করেন—যেন দুজন পরস্পরের বান্ধবী। ফলে মা তার মেয়েকে যথাযথ সম্মান করতে পারেন, তার আবেগ-অনুভূতির যথাযথ যত্ন নিতে পারেন। মেয়েকে দায়িত্ববোধ শেখাতে পারেন। পোশাকের শালীনতা, আচরণের আদব ও প্রজ্ঞাময় কর্মঠতা শেখাতে পারেন।

নিঃসন্দেহে একজন তরুণীর তার কৈশোরে গ্রহণ করা ইমানি প্রতিপালন তার পুরো জীবনকে সাজাতে ও ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করবে।

***

একজন যুবতি এ বয়সে বহু ছলনাময় আহ্বান ও মিডিয়ার বহু পথভোলানো কথার শিকার হয়।...

তাই এ কথা জিজ্ঞেস করা আমাদের দায়িত্ব যে, 'কেন তারা মুসলিম নারীদের ওপর এতটা জোর দিচ্ছে যে, মুসলিম নারীর স্বাধীনতা প্রয়োজন?'

খারাপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য একজন মুসলিম নারীর বোরকা পরার ইবাদত থেকে বিচ্যুত করে পোশাকহীন করাই কি স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি?

সন্তানদের প্রতিপালন করা, সঠিকভাবে তাদের পরিচর্যার ইবাদত থেকে বঞ্চিত করাই কি স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কি?

কেন তারা মরণপণ যুদ্ধ করে সচ্চরিত্রা নারীদেরকে রাস্তায় পোশাকহীন উলঙ্গ করে নামিয়ে আনতে চাচ্ছে?!

যুবতিদের উদ্দেশে আমার কথা বলার প্রয়োজন কেন পড়ল?!

যুবতিদের উদ্দেশে আমার আহ্বানে আশ্চর্য হয়ো না। কেননা :

১. আজকের তরুণী-যুবতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিপালনকারী মা।

২. ইসলামবিরোধী শক্তি দাবি করছে নারীরা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত। তাদের অনেকে নারীদের নিয়ে কথা বলে। সাহিত্যিকরা কবিতা ও গদ্য রচনা করে। সাংবাদিকরা কলম চালিয়ে যায়। প্রত্যেকে নারীদের নিয়ে কথা বলছে। নিজেদের এমনভাবে তুলে ধরছে, যেন তারা সত্যিই নারীদের নিয়ে চিন্তিত-উদ্বিগ্ন!

৩. আমার এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে স্বয়ং নবিজি ﷺ নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, তাদেরকে বিশেষ তত্ত্বাবধানের প্রক্রিয়ায় রাখতেন। প্রত্যেক ইদের সময় পুরুষদের প্রতি খুতবা দেওয়ার পর নারীদের সমাবেশেও খুতবা রাখতেন। নারীদের জন্য এ বিশেষ আয়োজন তাদেরকে আরও বেশি প্রফুল্ল করত। একবার এক নারী এসে রাসুল ﷺ-কে বললেন,

'পুরুষরা আপনার কাছে গিয়ে আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ পায় বেশি, আমাদের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন।...'[১] নবিজি ﷺ একটা দিন নির্ধারণ করে দিলেন, সেদিন তিনি পুরুষদের বিষয় বাদ দিয়ে বিশেষ করে নারীদের উদ্দেশে কথা বলতেন।

তা ছাড়া বিদায় হজের দিন নবিজি ﷺ নারীদের বিষয়ে বলেছেন :

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ،

'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ।'[২]

আবার স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করাকে একজন উত্তম পুরুষ হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত করেছেন রাসুল ﷺ। তিনি বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।'[৩]

কেবল এতটুকুই নয়; বরং নবিজি ﷺ একটি সেনাবাহিনীকে অপেক্ষায় রেখেছেন তাঁর স্ত্রী আয়িশা ؓ-এর হার হারিয়ে যাওয়ার সময়ে। তখন আবু বকর ؓ আয়িশার কাছে এসে তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, 'তুমি আল্লাহর রাসুলকে বাধ্য করেছ মানুষদেরকে অপেক্ষা করাতে। মানুষের সাথে পানি নেই, তারা বিনা পানিতে কষ্ট পাচ্ছে।'

যখন উট উঠে গেল, তখন তার নিচে হারটি পাওয়া গেল। সে সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাজিল হলো। উসাইদ বিন হুসাইন ؓ বলেন, 'আবু

১. সহিহুল বুখারি : ৭৩১০।
২. সুনানু আবি দাউদ : ১৯০৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩০৭৪।
৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

বকরের পরিবার, এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়, এমন বহু বরকত আমরা আপনাদের মাধ্যমে পেয়েছি।'

নারীদের মর্যাদা নবিজি ﷺ-এর কাছে এতটা উচ্চ ছিল যে, একবার উম্মে হানি ؓ আসলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে। বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার মায়ের ছেলে আলি বলছে, সে ওই লোককে হত্যা করবে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি!'

নবিজি ﷺ বললেন, (قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ) 'উম্মে হানি, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম।'[৪]

৪. কারণ নারীরাই নেককারদের জন্ম দিয়েছে, আলিমদের জন্মদাত্রী তো তারাই। নারীদের কেউই তো শাফিয়ি ؒ-কে জন্ম দিয়েছে; তাদের কেউই তো উমর বিন আব্দুল আজিজের জন্মদাত্রী; ইবনে তাইমিয়া, আবু হানিফা, মালিক, আহমাদের মতো আলিমদের জন্মদাত্রী তো নারীরাই।...

তাই ভুলে যেও না, সে সকল বড় আলিমসহ প্রত্যেকেরই ছিল একজন নেককার মা। যিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন; আল্লাহ যেন তার সন্তানকে তার চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দেন। আর সে সকল বড় আলিমের মধ্যে প্রত্যেকেরই ছিল জীবনসঙ্গিনী, যার কাছে গিয়ে তিনি শান্তি ও সুস্থিরতা পেতেন।

এরপরও কি যুবতিদের প্রতি আমার এ সম্বোধন যথাযথ নয়?!

কত যুবতি এমন রয়েছে, যার জন্ম নেককার বাবা-মার কোলে হয়েছে, একটি রক্ষণশীল পরিবারে জীবনযাপন করেছে; কিন্তু এ যুগের কিছু ফিতনাও তাকে গ্রাস করেছে, তার সাথে সাথে টেলিভিশনে যা সে দেখছে, এমন কোনো যুবতি হয়তো কোনো যুবকের কাছে কল করছে, যাকে কখনো দেখেনি সে, কেবল কণ্ঠই শুনেছে, অথবা ইন্টারনেটে কোনো যুবকের সাথে বার্তালাপ করছে, যার নামও সে জানে না, অন্য কিছু জানেই না।

---

৪. সহিহুল বুখারি : ৩৫৭, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৮৯৬।

এভাবে যুবতি সর্বদা লড়াইয়ে লিপ্ত থাকে।... কখনো তার কানে আসে কর্কশ স্বর, যা তাকে নিষ্কলুষতা ছুড়ে ফেলে গুনাহের অধঃপতনে যেতে আহ্বান করে।

আরেকটা স্বর তাকে ডেকে যায়, তার ভেতর থেকে উৎসাহে আন্দোলিত করতে বলতে থাকে, থামো থামো, এটা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের পথ।... এ স্বরগুলো তার ভেতরে লড়াইরত থাকে।

এ যুবতি আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানে। হালাল-হারাম সম্পর্কে জানে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করা অনেক কঠিন কাজ।

আজকের যুবতির বাবা নিজের ব্যবসার কাজে ব্যস্ত, ব্যস্ত নিজের বন্ধুদের সাথে, বন্ধুদের সাথে আড্ডা শেষে বেশ রাত করে ফিরে আসেন।...

যুবতির মা তার থেকে অনেক দূরে থাকেন।... নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ব্যস্ত থাকেন নিজের বান্ধবীদের সাথে কথা চালাচালির মাঝে।...

যুবতি তার বাবা-মার মধ্যে কাউকেই কাছে পায় না, তার আবেগ-অনুভূতি, অভিযোগ-অনুযোগ প্রকাশ করার মতো কাউকে কাছে পায় না।...

কিন্তু সে তার এ অভাবের জায়গাটা পূরণ করে সে বান্ধবীর মাধ্যমে, যে তাকে ভুল পথে নিয়ে যায়, খারাপ পথে নিয়ে যায়।...

অথবা সে তার এ অভাবের জায়গাটা পূরণ করে সে ভ্রষ্ট যুবকের মাধ্যমে, যে তাকে কথার ফাঁদে ফেলে ভুল পথে নিয়ে যায়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে মন ভুলিয়ে দেয়!

দুঃখজনক হচ্ছে, অনেক সংক্রামক ব্যাধি, নিকৃষ্ট ধারাবাহিক প্রচারণা, অনেক কণ্ঠস্বর যুবতিকে আহ্বান করছে পরিবারের শৃঙ্খল ছুড়ে ফেলে মুক্ত-স্বাধীন হতে, ইসলামের শিক্ষাকে পেছনে ফেলে নিজের মনের কথা শুনতে, খেয়াল-খুশিমতো জীবন পরিচালনা করতে!

জর্জ হরবার্ট তার বই Sexual revolution-এ বলেন :

'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উদ্বিগ্ন বোদ্ধামহলের মতে, প্রতিদিন অনেক বড় বড় যৌন বিস্ফোরণ হচ্ছে। এ বিস্ফোরণের সাথে সাথে ব্যাপক আকারে ধ্বংসিত হচ্ছে মানবতা। উঠতি প্রজন্মগুলোর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঘেরা।

আজকের শিশুরা একাকিত্ব বরণ করে নিয়েছে, কারণ দিন-রাত তারা বিভিন্ন উত্তেজনা জাগ্রতকারী উপকরণের মাধ্যমে ঘেরা থাকে।

মানবজাতি যে পথে চলছে, খুব শীঘ্রই অনেক নিকৃষ্ট বিকৃতি দেখা দেবে তাদের মাঝে!

যৌনতার বিস্ফোরণের কারণে যেকোনো শহরে বিনা বাধায় চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ।... প্রত্যেক দিক থেকে ধেয়ে আসছে নগ্ন যৌনতার আক্রমণ।... বিভিন্ন বিলবোর্ড ও বিজ্ঞাপনে যৌনতার অবাধ ব্যবহার।... ফিল্মের মধ্যে যৌনতার অবাধ প্রদর্শন।... টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জবাবদিহির আওতায় না রাখা।... (কিন্তু আল্লাহর কসম, অচিরেই তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে, যেদিন না তাদের সম্পদ কাজে আসবে, আর না তাদের সন্তানাদি তাদের কোনো উপকার করতে পারবে!)'

লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, অনেক আরব রাষ্ট্র ইন্টারনেটের ওপর নজরদারি রাখার তাগাদাও অনুভব করছে না। এখানে বিভিন্ন অশ্লীল ওয়েবসাইটে শিশু, যুবক, বয়স্করা অবাধে প্রবেশ করছে।

আফসোসের কথা হচ্ছে, অনেক আরব ও ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলিমরা উত্তেজনা জাগ্রতকারী মাধ্যমসমূহের পথ খুলে দিচ্ছে; যাতে মানুষের ভেতরের সুপ্ত সহজাত বাসনা উসকে ওঠে।... টিভি চ্যানেলের পর্দায় বিজ্ঞাপনে নারীর নগ্ন দেহের ব্যবহার, নির্লজ্জ লিরিক্সের গানের ব্যবহার হচ্ছে। এমন উন্মাদনাভরা ভিডিওতে পূর্ণ হয়ে আছে টিভি চ্যানেল।

যখন আমাদের ওপর পশ্চিমা সভ্যতা বিজয়ী হয়ে গেছে, তখন অনেক নারী পশ্চিমা নারীদের অনুকরণ শুরু করেছে—তাদের মতো পোশাক পরা, তাদের

মতো চেহারা সুন্দর করার প্রতি উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। পশ্চিমাদের ফ্যাশন-স্টাইল অনুকরণই তাদের চোখে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড!

টিভি চ্যানেলে কিছু আছে পোশাক দেখানোর অনুষ্ঠান, কিছু অনুষ্ঠান নাচ-গানের আয়োজন, কিছু অনুষ্ঠান পাপ ও মানুষকে দেখানোর প্রবণতা উসকে দেওয়ার...

অন্যদিকে আত্মউন্নয়ন, দ্বীন শেখা, চারিত্রিক গুণাবলির শিক্ষার্জন—এসব দিক মনোযোগ পাওয়ার উপযোগী নয়। কেননা, এসব তাদের কারও সাথে যায় না, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এগুলো!

নারীকে যখন এভাবে পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন তার আর কতটুকু সম্মান বাকি থাকছে!

সাবানের প্যাকেটে নারীর ছবি দেওয়ার অর্থ কী?!

মোমবাতির প্যাকেটে নারীর ছবি দেওয়ার মানে কী?!

যুবতির ছবি দিয়ে ম্যাগাজিনের কাভার করার অর্থ কী?!

এসব কি পণ্য বিক্রয়ের জন্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে উসকে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে নারীকে ব্যবহারের অসদুপায় নয়?!

এ রকম কি ঘটেনি যে, ফ্রান্সের এক অভিনেত্রীকে যখন ক্যামরার সামনে একটা কদর্য চিত্রায়ণ করতে বলা হয়, তখন সে চিৎকার করে বলেছিল, 'কুকুরেরা, তোমরা পুরুষরা কেবল আমাদের নারীদের শরীরটাই চাও; যাতে তোমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হতে পারো আমাদের শরীর বেচে।' এরপর এ অভিনেত্রী কান্নায় ফেটে পড়ল।...

বহু বছর নিকৃষ্ট জীবনযাপন করা সত্ত্বেও মুহূর্তেই এ নারীর সহজাত ফিতরাত জেগে উঠল। আধুনিক সভ্যতা যেটাকে 'স্বনির্ভর নারী' ও 'স্বাধীন নারী' বলে অভিহিত করছে, এ নারীর সহজাত ফিতরাত জেগে উঠে সেসবের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল পেশ করল!

সারা... বয়ফ্রেন্ড ও সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে

গল্পটি এক তরুণীর। যে তরুণী আল্লাহর দিকে এগোতে শুরু করলে আল্লাহ তাকে তাঁর আরও বেশি নৈকট্যশীল করলেন।...

দুঃখময় একটা অতীত। দ্বীন থেকে দূরে। আল্লাহ তার জন্য সে পথ খুলে দিলেন, যার মাধ্যমে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারল। দাওয়াতের মাধ্যম খুলে দিলেন তার জন্য। এ গল্পটা সারার। সে একটা রেডিওতে উসতাজ আমর খালিদের প্রোগ্রাম শুনেছিল। একদিন উসতাজের কাছে একটা চিঠি আসলো। চিঠিতে লেখা :

'আমি একজন তরুণী। নাম সারা। আমার বাবা লেবানিজ মুসলিম। মা লেবানিজ খ্রিষ্টান। তারা পূর্বের জায়গা ছেড়ে ভেনেজুয়েলায় এসে বসবাস শুরু করেন। কিছু কাল পর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা একে অপরকে ছেড়ে নিজেদের মন মোতাবেক ভিন্ন ভিন্ন জনকে বিয়ে করেন।

এদিকে আমি দিশেহারা হয়রান হয়ে পড়ি।... আল্লাহ আমাকে অপরূপ সৌন্দর্য দিয়েছেন। আমার পদস্খলন ঘটল। আমি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম। এভাবে একসময় ঘটনাচক্রে আমাকে বারের কাজও করতে হয়। আমার বয়ফ্রেন্ড হলো। আমি আমার দ্বীনকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম যে, আমি একজন মুসলিম।... আমার কেবল ইসলামের নামটাই স্মরণ থাকল। আর সবই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল।

হঠাৎ একদিন আমি ইকরা নামক এ চ্যানেলটি খুঁজে পাই।... আমর খালিদ নিষ্পাপতার বর্ণনা করছেন। তখন আমি প্রথমবারের মতো মনের ভেতর লজ্জা অনুভব করি। বুঝতে পারি যে, আমি বদমাশদের হাতের সস্তা পণ্য হয়ে গেছি...!

আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম। আমি আপনি ছাড়া আর কোনো মুসলিমকে চিনি না।... আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এতসব গুনাহে জড়িত হওয়ার পরও কি আল্লাহ আমাকে গ্রহণ করে নেবেন?!'

উসতাজ আমর খালিদ বলেন, 'আমি তাকে উত্তরে আল্লাহর রহমত, তাঁর করুণা ও দয়া, তাওবাকারীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা বললাম।'

এরপর সে লিখল, 'আমি নামাজ পড়তে চাই; কিন্তু আমি তো সুরা ফাতিহা ভুলে গেছি। আমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করতে চাই।'

আমর খালিদ বলেন, 'এরপর আমি দ্রুততর ডাকযোগে হারাম শরিফের ইমাম শাইখ সাউদ আশ-শুরাইমের তিলাওয়াতের ক্যাসেট পাঠালাম তার কাছে।

তিন দিন পর সে জানাল, "আমি সুরা আর-রহমান, সুরা নাবা মুখস্থ করেছি।... এবং এখন নামাজ পড়া শুরু করেছি।"

পরের বার লিখল, "আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে ত্যাগ করেছি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তেমনিভাবে সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও বারের কাজও ছেড়ে দিয়েছি।"

তরুণী আল্লাহর দিকে এগিয়ে আসা শুরু করল। নিজের রবকে চেনার পর সে নিজ সত্তাকে খুঁজে পেল।...

এ চিঠি প্রেরণের দুই সপ্তাহ পরে চিঠি এল তার :

"আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম বিধায় চিঠি লিখতে পারিনি।" বেশ কষ্টের মাঝে তার দিনাতিপাত হচ্ছিল। ডাক্তারের রিপোর্ট সম্পর্কে সে বলে, "উসতাজ আমর, আমি আসলে এখন ব্রেইন ক্যানসারের রোগী!"

আশ্চর্য হচ্ছি এরপর সে বলল, "কিন্তু আমার এত বড় রোগ সত্ত্বেও আমি চিন্তিত নই; বরং আমি বেশ খুশি। কারণ আমি আমার রবকে চিনতে পেরেছি, আমি তাঁকে ভালোবাসার সৌভাগ্য পেয়েছি। রোগ ও বিপদ আসার আগেই আমি তাঁর নৈকট্য তালাশ করতে পেরেছি। দুদিন পর আমার অপারেশন হতে চলেছে। আমি ভয় পাচ্ছি, আল্লাহর ক্ষমা না পেয়ে মারা যাচ্ছি কি না!"

আমি তাকে বললাম, "এটা কীভাবে হতে পারে, আল্লাহ তাওবাকারীদের ক্ষমা করবেন না?! আল্লাহ তো তোমাকে প্রত্যাবর্তনের তাওফিক দিয়ে সম্মানিত করেছেন, সুরা আর-রহমান মুখস্থ করার তাওফিক দিয়েছেন, আর এখন তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালুর সামনে রয়েছ।"

আমরা তাকে সান্ত্বনা দিলাম, তার হতাশা দূর করলাম।

এরপর সে বলল, "আপনার দেওয়া ইমামুল হারাম শাইখ শুরাইমের কণ্ঠের তিলাওয়াতের ক্যাসেটগুলো ও আমার সংগ্রহ করা কিছু ক্যাসেট মসজিদে দান করে দিয়েছি; যাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তা আমার জন্য সদাকায়ে জারিয়া হয়।..."

এর একদিন পর তার এক খ্রিষ্টান বান্ধবী আমাদের কাছে চিঠি লিখে জানাল,

"সারা মারা গেছে।"'

বোন আমার, নিজেকে জিজ্ঞেস করো :

ইসলামের নিয়ামত পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আল্লাহর প্রশংসা করেছ কি?

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিত আদায় করো কি?

খুশু ও তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করো কি?

প্রতিদিন কি কুরআনের একটা অংশ নির্ধারিত করে নিয়েছ তিলাওয়াতের জন্য?

মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করো তো?

প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, সেটা মনে আছে তো?

আল্লাহর আদিষ্ট হিজাব-পর্দা ঠিকমতো পালন করছ তো?

সৎ ও নেককার বান্ধবী গ্রহণ করেছ নাকি অসৎ বান্ধবী?

মোবাইলে কথা বলার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করো তো?

দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করো তো?

শেষ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছ তো?

নশ্বর দুনিয়া থেকে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করছ তো?

তোমার উদাসীন অবস্থায় আকাশ থেকে ফেরেশতা এসে তোমার প্রাণ কবজ করে নিতে পারে, সেটা কল্পনা করে দেখেছ কখনো?

কবরের প্রথম রাত কেমন হবে, সেটা কল্পনা করে দেখেছ তো?

কিয়ামত কেমন হবে, সেটা কি কখনো কল্পনা করে দেখেছ? যেদিন সব মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে!

আসমান ও জমিনের মালিকের সামনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিয়েছ কি? যিনি তোমাকে তোমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন।

তোমার জীবন যাপন করো

ইসলাম তোমাকে তোমার জীবন যাপন করতে নিষেধ করছে না। তুমি যেমন চাও, জীবন যাপন করো।... ইসলাম চায় না যে, তুমি দুনিয়াকে একেবারেই ত্যাগ করো। বরং ইসলাম চায়, তুমি দুনিয়া ছেড়ে যাওয়া মানুষদের মধ্যে উত্তম একজন হও।...

তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখো।...

তুমি ধনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে দান ও কল্যাণকর কাজ করো।

তুমি তোমার শরীরের হক সম্পর্কে জানো, যেমন : খাবার ও ব্যায়াম, ঠিকমতো এগুলো আদায় করো।

সুষ্ঠু ও হালালভাবে বিনোদন গ্রহণ করো।...

তোমার পরিবারের অধিকার সম্পর্কে জানো এবং তা আদায় করো।

তাদের ঠিকমতো দেখাশুনা করো এবং তাদের সময় দাও।...

তোমার স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানো। স্বামীর কথা শোনা ও মান্য করা তোমার দায়িত্ব। তাই গুনাহের কাজ ছাড়া স্বামীর কথার অবাধ্য হবে না।...

তোমার সন্তানের অধিকার সম্পর্কে জানো। তাদের সঠিক প্রতিপালন ও দিকনির্দেশনা দেওয়া তোমার দায়িত্ব ও তাদের অধিকার।

ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কাজ করে সমাজের অধিকার আদায় করো।

সবকিছুর ওপরে আল্লাহর হক সম্পর্কে জানো। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, সুন্দর করে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা তাঁর হক।

***

এ কয়টি অসিয়তের পর... নিষ্পাপ তরুণীদের প্রতি... কল্যাণময় নারীদের প্রতি...

আমার এ লেখা সেসব মুমিন নারীর প্রতি, যাদের চারপাশে ফাসাদ বেড়েই চলছে।... যেসব নারী ফিতনা-ফাসাদের আতিশয্যে আকাশ পানে চোখ তুলে দুআ করে :

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

> 'হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।'[৫]

এ বইটি ও একই সাথে (همسة في أذن شاب) বইটি লেখার প্রেরণা পেয়েছি হিমসের উলওয়ানুল আমিরা গ্রন্থাগারে। মরহুম মুরব্বি আহমাদ উলওয়ানের সন্তান ভাই উসতাজ বাসসাম আমাকে বললেন, 'আপনি সকল মানুষকে সম্বোধন করে আপনার বই (أسعد نفسك وأسعد الآخرين) লিখেছেন, পিতামাতাদের সম্বোধন করে লিখেছেন (كيف تربي أبناءك في هذا الزمان)। এ দুটো বই অনেক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অনেক বার মুদ্রিত হয়েছে। আপনি কেন তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে দুইটা আলাদা বই লিখছেন না? অথচ এটা করা অনেক প্রয়োজন? এমন একটা বই আসা দরকার, যেটা একই সাথে মন ও মস্তিষ্ক উভয়টাকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে।'

তাই আমি এমন একটা বই লেখার ইচ্ছা করলাম, যেখানে মুসলিম তরুণীদের মনের উসকে দেওয়া কথাগুলোর জবাব দেবো। এমন একটা বই লেখার ইচ্ছা করলাম, যে বই তাদের ইমান বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে, তাদের অন্তরকে দ্বীনের ওপর অটল রাখতে সহায়ক হবে, তাদের অন্তরকে আরও বেশি পরিতুষ্ট করবে, তাদেরকে ইসলাম মানতে সাহায্য করবে।

---

৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৮৩, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯২৬।

তাদের চারপাশের বিপদাপদ থেকে আমি তাদের সতর্ক করব। অকর্মা যুবক, নষ্ট মিডিয়া, ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাদের সতর্ক করব।

হে আল্লাহ, আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, আমি এ বইয়ের মাধ্যমে কেবলই চেয়েছি যে, এ বইটি মুসলিম তরুণীদের চলার পথকে আলোকিত করবে, তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিশা দেবে, ইসলাম থেকে দূরে থাকা তরুণীদের ইসলামমুখী করবে, সফলতা ও শান্তির পথ দেখাবে।

হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমার চাওয়া হচ্ছে, আপনি এ বইয়ের মাঝে কল্যাণ দান করুন, এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকাকে উপকার দান করুন, এ বইয়ের লেখক ও প্রকাশককে সাওয়াব দান করুন, আর এসব কাজকে একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য বানিয়ে নিন, সেদিনের জন্য সহায়ক করে নিন—যেদিন কোনো সম্পদ ও সন্তান কাজে আসবে না, তবে সে ব্যক্তি নিরাপদ থাকবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আসবে।

হে আল্লাহ, আমাকে এমন ইমান দান করুন, যা আমার অন্তর অনুসরণ করবে, যার মাধ্যমে আমার গুনাহ মাফ হবে। আপনার দিদার দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। এ চাওয়ার ওপরে কি আর কোনো চাওয়া আছে?!

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

২০ আগস্ট, ২০০৫ ইসায়ি

১৬ রজব, ১৪২৬ হিজরি

হিমস

প্রথম অধ্যায়

নারীদের কীর্তিগাথা

তাঁদেরই করো অনুসরণ

প্রতিটি যুগের নারীর জন্য নেক আদর্শবান নারীকে অনুসরণ করতে হয়। আদর্শবান নারীদের পথে চলতে হয়, তাঁদের মতো হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। যে আদর্শবান নারীগণ এমন অন্তরের অধিকারী ছিলেন, যা আল্লাহকে সকল কিছুর উর্ধ্বে রাখে।...

ফাতিমা ﵂

জান্নাতি নারীদের নেত্রী হলেন অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়দের তালিকার মধ্যে অন্যতম। তিনি হলেন প্রিয় রাসুল ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ﵂।

তাঁর বিয়ে হয় আলি বিন আবি তালিব ﵁-এর সঙ্গে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে বিয়ের পর মণিমুক্তা, স্বর্ণ-অলংকার ও দামি দামি পোশাকাদি নিয়ে তিনি স্বামীর ঘরে যাননি। স্বামীর ঘর হিসেবে প্রাসাদ বা অট্টালিকা পেয়েছেন এমনও নয়; বরং তিনি একটি মাটির ঘর হিসেবে পেয়েছেন স্বামীর ঘরকে।...

সরঞ্জাম বলতে তাঁর কাছে ছিল আঁশভর্তি বালিশ... পানপাত্র... দুটি পানির পাত্র... আটা পেশার জন্য একটা জাঁতা। অথচ তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বের সুলতানের মেয়ে, ফাতিমা ﵂, নবির মেয়ে। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানের মেয়ে আঁশভর্তি বালিশে মাথা রেখে ঘুমায়! নিজ হাতে জাঁতা দিয়ে আটা পিষে!

হ্যাঁ, এমনই ছিলেন তিনি। তিনি এমন কাজ করেছেন; কিন্তু এ কাজটা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, তাঁর মর্যাদাও কমিয়ে দেয়নি।

তাঁর মৃত্যুর পর আলি ﵁ তাঁর সম্পর্কে বলেন :

'রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মেয়ে জাঁতা দিয়ে আটা পিষত।... এমনকি তাঁর হাতের ওপর ছাপ পড়ে গিয়েছিল।...

কাঁধে করে কলসি বয়ে আনার ফলে তাঁর শরীরে রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল।...

ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সময় তাঁর কাপড় ধূলিমলিন হয়ে যেত।...

উনুনের আগুনে তাঁর অবস্থাই বদলে গেল।...

এতে করে তাঁর কী ক্ষতি হলো? কোন ক্ষতিটা হলো?

সুবহানাল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা জাঁতা দিয়ে আটা পেষার কারণে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গেল! বাড়ির কাজ করতে, স্বামীর কাজ করতে গিয়ে যে অহংকারে পড়ে যাও, শুনেছ তো এবার!

সেদিনটা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো, যেদিন আলি ﵁ ফাতিমা ﵂-কে রাসুল ﷺ-এর কাছে পাঠিয়েছেন দাসীদের মধ্য থেকে একজন খাদিমা চেয়ে আনার জন্য।... রাসুল ﷺ ও ফাতিমা ﵂-এর মাঝে সেদিন কী কথা হয়েছিল?

তিনি কি বলেছিলেন, 'খুব শীঘ্রই তোমাদের এ কাজটা হয়ে যাবে?'

তিনি কি সাহাবিদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমার মেয়ে ও তাঁর স্বামীর জন্য একজন খাদিমা দিয়ে দাও?'

না, তিনি এমনটা বলেননি; বরং তিনি বলেছেন :

'না, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের তা দিতে পারব না। যেখানে আহলুস সুফফা না খেতে পেয়ে যন্ত্রণা পাচ্ছে আর আমি তাদের খাবার দিতে পারছি না, সেখানে তোমাদের এ চাওয়া পূরণ হবে না। বরং আমি দাস-দাসীদের বিক্রি করে তাদের জন্য খরচ করব।'

এরপর স্বামী-স্ত্রী দুজন বাড়িতে ফিরে গেলেন। নবিজি ﷺ সেদিন রাতে তাঁদের ঘরে এলেন। দেখলেন, ফাতিমা ও তাঁর স্বামী আলি একটি বিছানায় শায়িত।... তাঁদের গায়ে একটি মাত্র চাদর। মাথা ঢাকতে গেলে পা ঢাকা যায় না। পা ঢাকতে গেলে মাথায় চাদর থাকে না।

তখন নবিজি ﷺ তাঁদের বললেন, (أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا) 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদেরকে তার চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু শিখিয়ে দেবো?'

তাঁরা দুজন বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।'

রাসুল ﷺ বললেন,

> إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ
>
> 'যখন তোমরা শুতে যাবে, তখন ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার", ৩৩ বার "সুবহানাল্লাহ", ৩৩ বার "আলহামদুলিল্লাহ" পড়বে। এ আমল তোমাদের জন্য একজন খাদিমের চাইতে উত্তম হবে।'[৬]

আলি رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর কসম, সেদিন থেকে কখনো আমি এ আমল ছাড়িনি।'

নারীশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আয়িশা رضي الله عنها

আয়িশা رضي الله عنها পৃথিবীকে তাঁর জ্ঞানে আলোকিত করেছেন। এমনকি ইমাম জুহরি তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'যদি পৃথিবীর সব নারীর জ্ঞানকে আয়িশা رضي الله عنها-এর জ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে একজন আয়িশা رضي الله عنها-এর জ্ঞানই বেশি হবে এবং তাঁর জ্ঞান অধিক উত্তম ও উপকারী হবে।'

তবাকাতু ইবনে সাদে এসেছে, 'আয়িশা رضي الله عنها ছিলেন অধিক জ্ঞানী।... রাসুল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবিগণও তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞেস করতে আসতেন।'

---

৬. সহিহুল বুখারি : ৩৭০৫, সহিহু মুসলিম : ২৭২৭।

আবু সালামা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর সুন্নাতগুলো সম্পর্কে আয়িশার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি আমি।... যদি কোনো অভিমতের প্রয়োজন পড়ে, তখন অভিমত দেওয়ার ক্ষেত্রে আয়িশার চেয়ে অধিক সমঝদার কাউকে দেখিনি।... আয়াতের শানে নুজুল, কোনো ফরজের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আয়িশার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।'

আয়িশা ﷺ উমর ও উসমান ﷺ-এর সময়কালে ফতোয়া দিতেন।

ইবরাহিম ﷺ-এর স্ত্রী সারা

সারাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় জোর করে। তৎকালীন মিসরের তাগুত শাসকের ঔদ্ধত্যবলে। মিসরের এ বাদশাহ তার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইছিল।

একজন নারী। বাহ্যিক শক্তিতে দুর্বল। কিন্তু আল্লাহর রজ্জু যে ধারণ করে, সে কখনো দুর্বল হয় না।

সারা অজু করলেন। নামাজ পড়ে রবের কাছে সাহায্য চাইলেন। দুআ করলেন :

'হে আল্লাহ, আপনি যদি জেনে থাকেন যে, আমি আপনার প্রতি ইমান এনেছি এবং আপনার রাসুলের প্রতিও... আমি আমার লজ্জাস্থানের হিফাজত করেছি... তবে আমার ওপর এ কাফিরকে চাপিয়ে দেবেন না... হে আল্লাহ, যেভাবেই হোক তার কাছ থেকে আমাকে বাঁচান।...'

কাফির বাদশাহ যখন সারার দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছে করল, তখন সে নিজের জায়গাতেই জমে গেল। নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল।

সুখের সময় সারা তাঁর রবের অধিকার আদায় করেছেন, এখন বিপদের সময় তাঁর রব তাঁকে বাঁচালেন।

কাফির বাদশাহ তার স্থানেই জমে গেল, একটুও নড়তে পারল না।... একটু পর তাকে এ জমে যাওয়া থেকে আল্লাহ রেহাই দিলেন।... কিন্তু সে আবার

ইবরাহিম ﷺ-এর স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াতে উদ্যত হয়েছে, এমন মুহূর্তে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জমে গেল আবার।

এভাবে তৃতীয় বার, চতুর্থ বার ঘটল।... সবশেষে কাফির বাদশাহ তার সেবকদের বলল, 'তোমরা আমার কাছে একটা শয়তানকে নিয়ে এসেছ! তাকে ইবরাহিমের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। আর তার সেবায় হাজারকে[৭] দিয়ে দাও।' একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে সারা ﷺ ফিরে এলেন নিরাপদে।... এমনকি সাথে করে একজন সেবিকাও নিয়ে এলেন।...

ফিরআওন-কন্যার কেশ-বিন্যাসকারিণী

ইমাম আহমাদের বর্ণনা। রাসুল ﷺ মিরাজের রজনী সম্পর্কে বলেন :

'যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন আমি একটা সুঘ্রাণ পেলাম। আমি বললাম, "জিবরিল, এটা কীসের সুঘ্রাণ।" তিনি বললেন, "এ সুঘ্রাণ ফিরআওন-কন্যার কেশ-বিন্যাসকারিণী ও তাঁর সন্তানদের।..."

এ নারী ফিরআওনের কন্যার চুল আঁচড়ানোর কাজ করতেন।... একদিনের কথা। ফিরআওন-কন্যার চুল বিন্যাস করার সময় তাঁর হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেল। তিনি "বিসমিল্লাহ" বলে চিরুনি তুললেন। ইতিপূর্বে তাঁর ইমানের কথা গোপন করে আসছিলেন; কিন্তু এখন তো তাঁর বিসমিল্লাহ বলা ফিরআওন-কন্যা শুনে ফেলেছে!

ফিরআওন-কন্যা বলল, "আর আমার বাবা! তিনি কি তোমার রব নন!"

তিনি বললেন, "আমার রব, তোমার বাবার রব, সমস্ত জগতের রব আল্লাহর নামে।"

ফিরআওন-কন্যা বলল, "আমি এ কথা বাবার কানে তুলব।"

তিনি বললেন, "যা ইচ্ছে হয় করো।"

---

৭. ইবরাহিম ﷺ-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম। আমাদের দেশে 'হাজির' উচ্চারণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই উচ্চারণ ভুল।

ফিরআওন-কন্যা তার বাবাকে জানাল। ফিরআওন ভীষণ অহংকার ও প্রভাব দেখিয়ে তাঁর সামনে এসে বলল, "আমি ছাড়াও কি তোমার আর কোনো রব আছে?!"

তিনি বললেন, "আমার রব, তোমার রব, সমস্ত জগতের রব এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।"

ফিরআওন ক্রোধে ফেটে পড়ল এবং বলল, "তুমি কি এ বিশ্বাসেই অটল থাকবে?!"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

ফিরআওন বলল, 'তাহলে আমি তোমাকে শাস্তি দেবো বা তোমাকে হত্যা করব।'

তিনি বললেন :

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

> "কাজেই তুমি যা করতে চাও, তা-ই করো। কেননা, তুমি কেবল এ পার্থিব জীবনেই কর্তৃত্ব খাটাতে পারো।"[৮]

ফিরআওন তাঁকে শাস্তি দিতে শুরু করল। তাঁর দুহাত, দু-পা বেঁধে ফেলল শক্তভাবে। তাঁকে নানান শাস্তি দিতে লাগল। তাঁর অন্তরের ভেতর ইমানের মিষ্টতার সাথে শাস্তির তিক্ততা মিশ্রিত হতে লাগল।

দুঃখ-কষ্টে নিজেকে তিনি বলতে লাগলেন, "আর অল্প কিছুক্ষণ, এরপর স্থান হবে বাগান ও নির্ঝরিণীর মাঝে, মহান মালিকের কাছে।"

তাঁর ওপর কতগুলো বিচ্ছু ছেড়ে দেওয়া হলো; যেন বিচ্ছুর বিষক্রিয়ায় শাস্তি পান তিনি। বলা হলো, "ফিরআওনের ইবাদতের দিকে ফিরে আসো।" কিন্তু এ মহীয়সী নারী বলতে লাগলেন, "আমার রব ও তোমার রব মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন।"

---

৮. সুরা ত্বহা, ২০ : ৭২।

তাঁর ওপর বিভিন্ন রকমের সাপ ছেড়ে দেওয়া হলো; কিন্তু এ মহীয়সী নারী বলতে লাগলেন, "আমার রব ও তোমার রব মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন।"

তখন ফিরআওন বলল, "তবে আমি তোমাকে হত্যা করব, তোমাকে আগুনে পোড়াব।"

এরপর পিতলের একটা গরু নিয়ে আসতে বলা হলো। (কেউ কেউ বলে, সেটা ছিল গরুর আকৃতিতে একটি পাতিল) আদেশমতো সেটা নিয়ে আসা হলো। এরপর এ মহীয়সী নারী ও তাঁর সন্তানদের নিয়ে আসা হলো। প্রথম সন্তানকে ধরে তাকে টগবগে ফুটতে থাকা তেলের ভেতর ফেলে দিল! কিছুক্ষণ তেলে সামান্য ঢেউ হলো। এরপর থেমে গেল!

দ্বিতীয় সন্তান তাঁকে বলল, "মা, আপনি ধৈর্য ধরুন। যদি ধৈর্য ধরেন, তবে আল্লাহর কাছে এ এ প্রতিদান পাবেন।"

এরপর দ্বিতীয় সন্তানকে নিক্ষেপ করা হলো।

এক সন্তানের পর আরেক সন্তানকে নিক্ষেপ করা হলো ফুটন্ত তেলে, এদিকে এ মহীয়সী নারী বলতে থাকলেন, "আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ রব্বুল আলামিন।"

এবার বাকি রইল দুগ্ধপোষ্য শিশুটি। তার পালা এল। শিশুর কথা চিন্তা করে মাতৃহৃদয় একটু ইতস্তত করে উঠল যেন। এদিকে আল্লাহ শিশুটিকে কথা বলার শক্তি দিলেন। শিশুটি বলে উঠল :

"মা, তুমি ঝাঁপ দাও, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় নগণ্য মাত্র।...

এ মহীয়সী নারী তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে নিয়ে ঝাঁপ দিল ফুটন্ত তেলের পাতিলে।...

এদিকে আসিয়া (ফিরআওনের স্ত্রী) ছিল তাঁর স্বামীর বিপরীত। এ ভয়ানক দৃশ্য তিনি দেখছিলেন। তিনিও ছিলেন ইমানদার। কিন্তু তখনও তিনি নিজের ইমান প্রকাশ করেননি।...

কেশ-বিন্যাসকারিণীর সাথে ফিরআওনের আচরণ দেখে তিনি বললেন, "তোমার ধ্বংস হোক... তুমি আল্লাহর বিরুদ্ধে এত বড় স্পর্ধা দেখালে!"

ফিরআওন : কেশ-বিন্যাসকারিণীর পাগলামো তোমাকেও পেয়ে বসল!

আসিয়া : আমি আল্লাহতে বিশ্বাস রাখি, তিনি আমার রব, তিনি এ কেশ-বিন্যাসকারিণীর রব। আমি জগৎসমূহের রব আল্লাহর প্রতি ইমান আনলাম।

তখন ফিরআওন আসিয়ার মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "আমি তাকে সেভাবে শাস্তি দেবো, যেভাবে কেশ-বিন্যাসকারিণীকে দিয়েছিলাম। তাকে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আসিয়ার মা এলেন তাঁর কাছে। তাঁকে বোঝালেন, যেন তিনি দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করেন।

আসিয়া বললেন, "মা, আমি আল্লাহকে অস্বীকার করব?! আমি কখনো আল্লাহর সাথে কুফরি করব না!"

তখন তাঁর হাত-পা বেঁধে ফেলা হলো। এরপর তাঁকে সূর্যের খরতাপে ফেলে রাখা হলো। পানাহার বন্ধ করে দেওয়া হলো। নির্মমভাবে তাঁকে প্রহার করা হলো। আর তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে আশ্রয় চাইলেন।

তাঁর দুআর সাথে সাথে তাঁর ও জান্নাতের মধ্যকার পর্দা তুলে নেওয়া হলো। তিনি জান্নাতে নিজের বাড়ি দেখতে পেয়ে হেসে দিলেন। তাঁকে যখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, সেই চরম মুহূর্তে তাঁর মুখে হাসি! এ অবস্থা দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "এ তো বড্ড উন্মাদ! তাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; অথচ সে কিনা হাসছে?!"

এরপর ফিরআওন আদেশ দিল বাঁধা অবস্থায় তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে।... পাথরের আঘাত আসার আগেই আল্লাহ তাঁর রুহ কবজ করে নিলেন। এভাবে আসিয়া হয়ে উঠলেন ইমানদারদের জন্য অনুপম আদর্শ!

পক্ষান্তরে আমরা দেখি, রাসুল ﷺ-এর চাচা আবু লাহাবের স্ত্রী প্রিয় নবি ﷺ-কে মুহাম্মাদ (প্রশংসিত) নামের স্থলে মুজাম্মাম (নিন্দিত) নাম দিয়েছিল। সে

বলত, (مُذَمَّمًا أَبَيْنَا وَدِينَهُ قَلَيْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا) 'মুজাম্মামকে আমরা অস্বীকার করলাম, তার দ্বীনকে অপছন্দ করলাম, তার আদেশ অমান্য করলাম।'[৯]

সে এ ছন্দ কেটে বেড়াত কুরাইশদের মজলিশগুলোতে। রাসুল ﷺ-এর নিন্দা করে বেড়াত। ফিতনা ছড়িয়ে বেড়াত। কুফরকে শক্তিশালী করাই ছিল তার এজেন্ডা!

এরপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন :

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ - فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

> 'এবং তার স্ত্রীও—যে লাকড়ি বহন করে। তার গলদেশে খেজুর-বাকলের রজ্জু রয়েছে।'[১০]

এ নারী ছিল কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়। লাকড়ি সংগ্রহ বা বহন করার প্রয়োজন হতো না তার। আর্থিকভাবে যথেষ্ট সচ্ছলতা ছিল তাদের। এখানে তার আক্রমণ, নোংরামি ছড়ানো ও ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা ছড়িয়ে বেড়ানোর কারণে তাকে ইন্ধনদাতা লাকড়ি বহনকারীর সাথে তুলনা দেওয়া হয়েছে!

বলা হয়ে থাকে, এ নারী কাঁটা নিয়ে রাতের বেলা রাসুল ﷺ-এর চলাচলের পথে বিছিয়ে দিত; যাতে সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় রাসুল ﷺ-এর পায়ে কাঁটা বিঁধে তিনি কষ্ট পান।

ইহুদি হত্যাকারিণী সাফিয়া رضي الله عنها

রাসুল ﷺ-এর ফুফু সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব رضي الله عنها। হামজা رضي الله عنه-এর আপন বোন। আওয়াম رضي الله عنه-এর স্ত্রী। সে মহীয়সী নারী, যিনি মহান বীর জুবাইর ইবনুল আওয়াম رضي الله عنه-কে প্রতিপালন করেছেন।

উহুদের দিনের ঘটনা। সাফিয়া যখন মুসলিমদের দুরবস্থা দেখলেন, তখন তিনি মুসলিমদের পানি পান করার কাজ ছেড়ে বীরাঙ্গনার মতো একজনের

---

৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩৩৭৬।

১০. সুরা আল-মাসাদ, ১১১ : ৪-৫।

হাত থেকে বর্শা নিয়ে যোদ্ধাদের সারি অতিক্রম করতে করতে এগিয়ে এলেন সামনের দিকে আর বলতে লাগলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমরা দেখছি রাসুল ﷺ-কে ব্যর্থ করে দেবে!'

নবিজি ﷺ যখন তাকে দেখতে পেলেন, তখন তার ছেলে জুবাইরকে বললেন, 'তোমার মায়ের নিরাপত্তা দাও।'

জুবাইর বলে উঠলেন, 'মা, সাবধানে সাবধানে।'

সাফিয়া বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি জানতে পেরেছি আমার ভাইয়ের চেহারা বিকৃত করা হয়েছে, আমি অবশ্যই আল্লাহর জন্য ধৈর্য ধরব।'

যুদ্ধ শেষ হলো। তিনি তাঁর ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পেট ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কলিজা বের করে ফেলা হয়েছে। তাঁর দুই কান কেটে নেওয়া হয়েছে। আর চেহারা বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। সাফিয়া তখন বলে উঠলেন, 'আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।'

তিনি গাল চাপড়ালেন না।... হা-হুতাশ করলেন না।... কাঁদলেন না।... কারণ, তিনি মেনে নিলেন যে, এটাই আল্লাহর ফয়সালা।

খন্দকের ঘটনা। নবিজি ﷺ নারীদেরকে হাসসান দুর্গে রেখেছেন। এটা একটা দুর্গম দুর্গ। নারীদের সাথে সেদিন পুরুষদের কোনো বাহিনী রেখে যাওয়া হয়নি।

মুসলিম বাহিনী খন্দকে গেলেন যুদ্ধ করতে। তখন এক ইহুদি শিকল বেয়ে দুর্গে ঢুকছিল এটা দেখার জন্য যে, দুর্গের ভেতর পুরুষেরা আছে কি না, না শুধু নারীরাই আছে। যদি শুধু নারী থাকে, তবে তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের বন্দী করে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার।

কিন্তু তার কপাল মন্দ। সাফিয়া ﷺ তাকে দেখে ফেলেছিলেন। একটা লৌহদণ্ড দিয়ে ইহুদির ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে ফেললেন তিনি। এতটুকুতেই ক্ষান্ত হলেন না। তার মাথাটাও কেটে নিলেন।... এরপর দুর্গের চূড়ায় উঠে এসে ইহুদির মাথা নিক্ষেপ করলেন নিচে।... ইহুদির মাথাটা তার বাকি সঙ্গীদের

সামনে গড়িয়ে নেমে এল। তখন ইহুদিরা বলল, 'বুঝলাম যে, মুহাম্মাদ দুর্গে নারীদের একা রেখে যায়নি, পুরুষদেরও রেখে গেছে।' অর্থাৎ তারা ধারণা করেছে যে, দুর্গের ভেতর পুরুষদের একটি দল আছে, তারা এ ইহুদিকে হত্যা করেছে!

সাফিয়া হলেন প্রথম এমন নারী, যিনি কোনো মুশরিক পুরুষকে হত্যা করেছেন। একই সাথে তিনি ইহুদিদের বন্দিত্ববরণ থেকে মুসলিম নারীদের রক্ষা করলেন।

মুসলিমদের উদ্ধারকারী নারী

হুদাইবিয়ার ঘটনা। কাফিররা তাদের ঔদ্ধত্য দেখাল। তারা জাহিলিয়াতের ওপরই অটল থাকল এবং সন্ধিপত্রে 'আল্লাহর রাসুল' কথাটি লেখার ব্যাপারটা অস্বীকার করল। তা ছাড়া সন্ধির শর্তগুলোও আদতে মুসলিমদের প্রতিকূলে ছিল।... অথচ তারা অনেক দূর থেকে এসেছে আল্লাহর ঘর পরিদর্শন করতে। এখন তাদেরকে আল্লাহর ঘর পরিদর্শনে বাধা তো দেওয়া হলোই, আবার সাথে অনেক শর্তও জুড়ে দিল।

উমর ﷺ বেশ রেগে গেলেন। তিনি আবু বকর ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আবু বকর, তিনি কি আল্লাহর রাসুল নন?'

আবু বকর : অবশ্যই।

উমর : আমরা কি মুসলিম নই?

আবু বকর : অবশ্যই।

উমর : ওরা কি মুশরিক নয়?

আবু বকর : অবশ্যই।

উমর : তাহলে কেন আমরা আমাদের দ্বীন গ্রহণকারীকে তাদের হাতে তুলে দেবো?

আবু বকর : উমর! তাঁর পথকে আঁকড়ে থাকো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসুল।

উমর : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর রাসুল।

নবিজি ﷺ যখন চুক্তিপত্র লিখে শেষ করলেন, তখন তিনি সাহাবিদের বললেন, 'তোমরা পশু কুরবানি করে মাথার চুল ফেলে দাও।' তিনি তিনবার বললেন।

কিন্তু কেউই উঠলেন না। তাঁরা পূর্বের দুঃখে তখনও ভারাক্রান্ত, সে দুঃখ রাসুল ﷺ-এর আদেশ সম্পর্কে তাঁদের বেখবর করে রেখেছিল যেন।

তখন রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা رضي الله عنها-এর কাছে এলেন। এ সফরে আল্লাহর রাসুলের সাথে আসার লটারিতে তাঁর নাম এসেছিল। রাসুল ﷺ বিষয়টা তাঁর কাছে তুলে ধরলেন এবং বললেন, 'মুসলিমরা ধ্বংস হয়ে গেছে।'

উম্মে সালামা ছিলেন বেশ বুদ্ধিমতী। তিনি বললেন, 'আল্লাহর নবি, আপনি বের হয়ে কারও সাথে কথা না বলে নিজের কুরবানির পশুটা জবাই করে দিন আর আপনার নাপিতকে ডেকে নিলে সে আপনার চুল মুণ্ডন করে দেবে।'

রাসুল ﷺ বের হয়ে গেলেন, কারও সাথে কথা না বলে পরামর্শ মোতাবেক কাজ করলেন।

যখন সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-কে এমন করতে দেখলেন, তাঁরাও উঠে এসে জবাই করলেন এবং একে অন্যের মাথা মুণ্ডন করে দিলেন, কেউ কেউ চুল ছোট করলেন।

দেখলে, যখন পুরুষরা রাসুল ﷺ-এর আদেশ কর্মে পরিণত করতে পারছিল না, তখন কীভাবে একজন নারী মুসলিমদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন!

যে নারীকে আল্লাহর রাসুল ﷺ বিয়ে দিয়েছেন

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবির নাম ছিল 'জুলাইবিব'। তার চেহারায় লাল রঙের দাগ দেখা দিল। রাসুল ﷺ তাকে বিয়ে করতে বললেন।

একবার রসিকতার সময় জুলাইবিব বলেছিলেন, 'আমাকে বিক্রি করতে গেলে আপনি খুবই কম মূল্য পাবেন!'

রাসুল ﷺ তখন বলেছিলেন, (غَيْرَ أَنَّكَ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ) 'না, বরং তুমি আল্লাহর কাছে অনেক দামি।'[১১]

রাসুল ﷺ জুলাইবিব-কে বিয়ে করানোর সুযোগ খুঁজছিলেন।

একদিন এক আনসার সাহাবি এলেন তার বিধবা মেয়ের প্রস্তাব নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে।

রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি তাকে নিজে বিয়ে না করলেও, আমি তোমার মেয়েকে জুলাইবিবের জন্য চাইছি।'

মেয়ের বাবা বললেন, 'আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে দেখি।'

সাহাবি নিজ স্ত্রীর কাছে বললেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের মেয়েকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিতে চান।'

তার স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমরা মেয়েকে জুলাইবিবের কাছে বিয়ে দেবো না! তার জন্য কত বড় বড় লোকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি আমরা!'

সাহাবি এ কথা শুনে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার জন্য উঠলেন।

তখন তার মেয়ে ভেতর থেকে বলে উঠলেন, 'আপনাদের কাছে কে প্রস্তাব দিয়েছেন?'

---

১১. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৩৩৪৩।

তারা দুজন বললেন, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ।'

মেয়ে বললেন, 'আপনারা আল্লাহর রাসুলের আদেশ ফিরিয়ে দিচ্ছেন?! আমাকে আল্লাহর রাসুলের মর্জি মোতাবেক বিয়ে দিন, তিনি আমার অধিকার নষ্ট করবেন না নিশ্চয়।

তার বাবা তাকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তিনি তাকে জুলাইবিবের সাথে বিয়ে দিলেন। তার জন্য দুআ করলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তাদের মাঝে কল্যাণ ঢেলে দিন, তাদের জীবনকে কষ্টময় করবেন না।'

কয়েক দিন পরই রাসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার সময় হয়ে গেল। জুলাইবিব রাসুল ﷺ-এর সাথে বের হলেন। যুদ্ধ শেষে সাহাবিগণ একে অপরকে খোঁজ করছিলেন। রাসুল ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাকে খোঁজ করছ?'

তাঁরা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে খোঁজ করছি।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি জুলাইবিবকে খুঁজছি।'

সবাই তখন জুলাইবিবকে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তাকে পাওয়া গেল না।

এরপর খুঁজতে খুঁজতে তাকে নিকটবর্তী এক জায়গায় পাওয়া গেল। সাত জন মুশরিকের সাথে তার দেহ মাটিতে পড়ে আছে। তিনি এদের সবাইকে হত্যা করেছিলেন।

রাসুল ﷺ তার দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, (قَتَلَ سَبْعَةً، ثُمَّ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ) 'সে সাত জনকে হত্যা করেছে, এরপর তারা তাকে হত্যা করেছে। সে আমার থেকে, আমিও তার থেকে।'

এরপর রাসুল ﷺ তাঁর দুই বাহুতে তাকে উঠিয়ে নিলেন, তার কবর খনন করলেন, এরপর তাকে কবরে শুইয়ে দিলেন।[১২]

---

১২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪০৩৫, মুসনাদু আহমাদ : ১৯৮১০।

আনাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ, এ মেয়ের চেয়ে অধিক দানশীল আনসারদের মধ্যে কেউ ছিল না, জুলাইবিবের মৃত্যুর পর সকল পুরুষ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে প্রতিযোগিতায় লেগে গিয়েছিল!'

যে নারীর চুল ঘোড়ার লাগাম

আবু কুদামা বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন দিমাশকের মিম্বারে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন। জিহাদের ফজিলত শুনালেন। মানুষ মসজিদ থেকে এমনভাবে বের হলো যে, যুদ্ধের ময়দানে কার আগে কে যাবে, সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা লেগে গেছে।

হঠাৎ এক নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আবু কুদামা, আস-সালামু আলাইকুম।'

আবু কুদামা সালামের উত্তর দিলেন না ফিতনার ভয়ে।

সে নারী আবারও সালাম দিলেন। এবারও আবু কুদামা উত্তর দিলেন না।

তৃতীয় বার নারীকণ্ঠ বলল, 'আস-সালামু আলাইকুম, আবু কুদামা! এ নেককার মহোদয়গণ কী এমন করেন!'

আবু কুদামা বলেন, 'এরপর আমি থমকে দাঁড়ালাম। সে নারী আমার কিছুটা কাছে এসে বললেন, "আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনি জিহাদের পথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। আমি জিহাদের পথে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সম্পদ খোঁজ করলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না, আমার এ চুলের খোপা ছাড়া। আমি আমার চুলের বেনিদুটা কেটে নিলাম। এই নিন। এগুলো দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ছুটে চলা আপনার ঘোড়ার লাগাম বানিয়ে নেবেন। আশা করি আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাকেও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারিণীদের একজন হিসেবে লিখে নেবেন।"'

যে নারী স্বামীকে ইলম শেখালেন

বলছি, সাইদ বিন মুসাইয়িবের কন্যার কথা। স্বামী তখনও তালিবে ইলম। প্রথম রাত কাটানোর পর সকালে চাদর পরলেন সাইদ বিন মুসাইয়িবের ইলমের দরসে যোগ দেবেন ইলম শেখার জন্য।

স্ত্রী জানতে চাইলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

স্বামী : আপনার বাবার দরসে, ইলম শিখতে।

স্ত্রী : এখানে বসুন, আমিই আপনাকে সাইদের ইলম শিখিয়ে দিচ্ছি।

তিনি সাইদ বিন মুসাইয়িবের কাছে যা শিখতেন, সেটা তার মেয়ের কাছে পেলেন একই রকমে।

এভাবেই একজন শিক্ষিত মুসলিম নারী তার স্বামী ও সন্তানদের ইলম শিখিয়ে ঘর আলোকিত করতে পারেন।

ইমাম আহমাদের মা

ইমাম আহমাদের বাবা তাকে ছোট রেখেই মারা গেলেন। এবার ছেলের তারবিয়তের ভার পড়ল মায়ের কাঁধে।

ইমাম আহমাদ বলেন, '১০ বছর বয়সেই আমার মা আমাকে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করিয়ে শেষ করেন।... আমাকে তিনি ফজরের বেশ আগে জাগিয়ে দিতেন। বাগদাদ ছিল বেশ ঠান্ডা জায়গা। তাই তিনি আমার জন্য পানি গরম করে দিতেন। আমাকে কাপড় পরিয়ে দিতেন। এরপর আমরা যতটুকু পারতাম নামাজ পড়ে নিতাম। অতঃপর মসজিদের দিকে নিয়ে যেতেন ১০ বছর বয়সী ছেলে আহমাদকে তার সাথে নামাজ পড়ার জন্য, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ছেলের সাথে মসজিদে কাটাতেন তাকে ইলমে শেখানোর উদ্দেশ্যে।'

ইমাম আহমাদ বলেন, 'যখন আমার বয়স ১৬'র কোঠায় পৌছল, তিনি বললেন, "ছেলে আমার, ইলমে হাদিস শেখার জন্য সফর করো। কারণ, হাদিস অন্বেষণে যাওয়া আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার সমান।"'

মা তাকে সফরের প্রয়োজনীয় সামান প্রস্তুত করে দিলেন। এরপর বললেন, 'যখন আল্লাহর কাছে কিছু আমানত রাখা হয়, আল্লাহ সে আমানতের হিফাজত করেন।... আমি তোমাকে সে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম, যিনি কোনো আমানতদাতার আমানতকে নষ্ট করেন না।'

ছেলে আহমাদ মদিনা-মক্কা ও সানাতে গেলেন 'ইমাম আহমাদ' হয়ে মায়ের কাছে ফিরে আসার জন্য এবং উম্মতের যে সেবা করবেন সেটা আঞ্জাম দেওয়ার জন্য।

এ সকল মা হচ্ছেন নারীজাতির আদর্শ। আজকের নর্তকী-অভিনেত্রীরা নয়। এতটুকু বোঝা সত্ত্বেও কি তুমি তাদের পথে চলবে না?! যদি তাদের আদর্শে আদর্শবান হও, আশা করি আল্লাহ তাদের সাথেই তোমার হাশর করবেন জান্নাতে, বাগান ও ঝরনাসমূহের মাঝে, মহান মালিকের সান্নিধ্যে।

নারী ফকিহ ফাতিমা

'তুহফাতুল ফুকাহা' গ্রন্থের লেখক শাইখ আলাউদ্দিন সমরকন্দির মেয়ে। শাইখ সমরকন্দি ৫৩৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার মেয়ে ফাতিমা বেশ সম্মানিত ফকিহ ছিলেন।

বাবা শাইখ আলাউদ্দিনের ছাত্র শাইখ আলাউদ্দিন কাসানির (মৃ. ৫৮৭ হি.) সাথে তার বিয়ে হয়। কাসানি ছিলেন 'আল-বাদায়িউ' গ্রন্থের লেখক, গ্রন্থটি শাইখ সমরকন্দির উপরিউক্ত গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা।

ফাতিমা ﵅-এর ফিকহের ওপর দখল এতটাই ছিল যে, যখন তার স্বামী কোথাও ভুল করতেন, তখন তিনি ঠিক করে দিতেন।

যে ফতোয়া তার বাড়ি থেকে বের হতো, তাতে তার বাবা শাইখ সমরকন্দি ও মেয়ে ফাতিমার স্বাক্ষর থাকত।

বিয়ের পর সে বাড়ি থেকে যে ফতোয়া আসত, তাতে বাবা শাইখ সমরকন্দি, মেয়ে ফাতিমা ও স্বামী কাসানির স্বাক্ষর থাকত।

যে নারী হাজার পুরুষের সমান

এ নারীর নাম খাজান্দারা। তিনি আল্লাহর জন্য নিজের সব সম্পদ ওয়াকফ করে দিলেন। ঘটনা অতি নিকটের বিংশ শতাব্দীর। কায়রোতে তিনি উসুলে দ্বীনের ওপর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, এ প্রতিষ্ঠান থেকে আজহারের অনেক বড় বড় আলিম শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে আছেন, শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি, ড. ইউসুফ কারজাবিসহ আরও অনেকে।

শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি ﷺ বলেন, 'আফসোসের কথা হচ্ছে, আমরা খাজান্দারা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না। তিনি যে পরিবেশে বড় হয়েছেন, সেখানকার রীতি হচ্ছে নারীদের সব বিষয়েই গোপনে রাখা হয়। এখানে মায়ের নাম, স্ত্রীর নাম কাউকে জানানোও নিষিদ্ধ। এটাকে তারা এমন দোষ মনে করেন, যা কোনো মুমিনের ওপর লাগতে পারে না!

একজন নারী একাই দ্বীনি শিক্ষার একটি উন্নত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন, যে প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট উচ্চমানের সার্টিফিকেট হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।...

কেবল এ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানই নয়, তিনি খাজান্দারা হাসপাতালেরও প্রতিষ্ঠাতা। এরপর খাজান্দারা মসজিদ, আরও আছে খাজান্দারা আশ্রয়কেন্দ্র।

একজন দানবীর নারী ইলমের প্রসার ও ইবাদতের খিদমতে নিয়োজিত হলেন, এতিমদের প্রতিপালন করলেন, রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন!

এ কেমন হৃদয়ের অধিকারিণী, যিনি একের পর এক আল্লাহর দ্বীনের পথে করজে হাসানাহ করে গেলেন! নিজের যত যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিলেন!

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم

'সেদিন তুমি মুমিন নর-নারীদের দেখবে, তাদের সামনে আর তাদের ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে।'[১৩]

---

১৩. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১২।

আল্লাহ তাআলা খাজান্দারার ওপর রহম করুন, যিনি নিজের সব সম্পদকে আল্লাহর কাছে আমানত রেখেছেন, আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছেন নিজের সম্পদকে রোগীর চিকিৎসায়, ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবারণে, ইলমের অন্বেষণে। তিনি সকল নর-নারীর জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ভাস্বর হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে।

নারীদের হাতে ইসলাম গ্রহণকারী বীরগণ

উমর বিন খাত্তাব ﵁। তাঁর বোন ফাতিমার হাতে তিনি ইসলামের প্রথম সবক পান। উমরের বোন ফাতিমা তাঁর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন উমর শুনলেন তাঁর বোন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তিনি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে ফাতিমার গালে চড় মেরে তাঁর রক্ত ঝরিয়েছেন। তখন বোন ফাতিমা তাঁকে বললেন, 'উমর, তোমার দ্বীনের সত্যতা নেই, সত্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।...' উমর একটু পরই ছুটলেন আল্লাহর রাসুলের কাছে নিজের ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার জন্য!

আবু তালহা তখনও মুসলিম হননি। তিনি মুসলিম নারী উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেন, 'আবু তালহা, তুমি কি দেখো না তুমি যে খোদার ইবাদত করো, মাটি থেকে কোনো মানুষই তাকে বানিয়েছে?!'

আবু তালহা : হ্যাঁ।

উম্মে সুলাইম : একটা গাছের ইবাদত করতে তোমার বাধে না? ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া আমি তোমার মোহর কবুল করব না!

আবু তালহা : আমাকে কিছুটা সময় দাও, আমি ভেবে দেখি।

আবু তালহা চলে গেলেন। এরপর ফিরে এসে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।'

উম্মে সুলাইম ছিলেন আবু তালহার ইসলাম গ্রহণের কারণ।

আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নারীগণ

উম্মে শুরাইক কুরাইশি আমিরি নারীদের কাছে গিয়ে তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করতেন। ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহী করে তুলতেন। একসময় মক্কাবাসী তার এ গোপন দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারল। তারা উম্মে শুরাইককে বেঁধে নির্যাতন করতে লাগল, সে ছিল এক কঠিন নির্যাতন।

সামুরা বিন নুহাইকের কন্যা নারীদের শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধে বেশ তৎপর থাকতেন।...

এরপর শোনো, খাওলা বিনতে মালিক -এর কথা। একদিন উমর -এর সাথে রাস্তায় দেখা। উমর তাঁকে সালাম দিলেন। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, 'উমর, আমি তোমাকে তখন থেকে চিনি, যখন তুমি উকাজের বাজারে শিশুদের লাঠি দিয়ে ভয় দেখাতে, তখন তুমি ছিলে উমাইর (বালক উমর)। এরপর কিছু দিন যেতে না যেতে তোমার নাম পড়ল উমর। এরপর কিছু দিন না যেতেই তোমার নাম এখন আমিরুল মুমিনিন। জনসাধারণের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, যে মন্দ পরিণতিকে ভয় করে, সে তা থেকে বাঁচতে পারে; আর যে মৃত্যুর ভয় করে, সে হারানোর ভয় করে।'

উমর -এর সাথে থাকা এক লোক বললেন, 'থামো এবার হে নারী, অনেক বলেছ!'

উমর বললেন, 'তাঁকে বলতে দাও, তুমি কি তাঁকে চেনো না? ইনি হলেন আওস বিন সামিতের স্ত্রী খাওলা, সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ তাঁর কথা শুনেছেন, এখন উমর কি তাঁর কথা শুনবে না?!'

শেষ একটি কথা বলি, এমন সব অনুপম জীবনের অধিকারিণীগণ কি মুসলিম নারীদের আদর্শ হিসেবে যথার্থ নয়?!

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রথম যুগের মহীয়সী নারীগণ

মসজিদে নারীদের উপস্থিতি

ইসলামের প্রথম যুগে নারীরা মসজিদে এসে জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমআর নামাজ আদায় করতেন। রাসুল ﷺ তাদেরকে নসিহত করতেন। নারীগণ একেবারে শেষ কাতারে অবস্থান করতেন।

প্রথম প্রথম নারী ও পুরুষ সবাই যে দরজা দিয়ে সুযোগ হতো তা দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতেন। কিন্তু যাতায়াতের সময় ভিড় হতো বিধায় রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা এ দরজাটি নারীদের জন্য রেখে দাও।' আজও এ দরজাটির নাম 'বাবুন নিসা' তথা নারীদের প্রবেশপথ রয়ে গেছে।

নবুওয়তের যুগে নারীগণ জুমআতে উপস্থিত হতেন। খুতবা শুনতেন। এমনকি কেউ কেউ সুরা কফ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শুনে শুনেই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। রাসুল ﷺ জুমআর দিনে সুরা কফ পড়তেন।

নারীগণ দুই ইদের নামাজেও উপস্থিত হতেন। ইসলামের সবচেয়ে বড় উৎসব ইদের দিন—যেদিন ছোট-বড়, নর-নারী সবাই তাকবির ও তাহলিলের ধ্বনিতে পরিবেশ মুখরিত করে ইদগাহে আসতেন।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, উম্মে আতিয়্যাহ বলেন, 'রাসুল ﷺ আমাদের সকলকে দুই ইদের সময় ইদগাহে যাওয়ার আদেশ করতেন, এমনকি পর্দা যাদের জন্য ফরজ হয়েছে তাদেরও, কুমারি মেয়েদের ওপরও এ আদেশ ছিল।'[১৪]

---

১৪. সহিহ মুসলিম : ৮৯০।

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুল ﷺ আমাদেরকে ইদুল ফিতর ও ইদুল আজহাতে ইদগাহে আসতে নির্দেশ দিলেন। সকল তরুণী, ঋতুবতী, সদা পর্দার উপযুক্ত হওয়া নারীর ওপর এ আদেশ ছিল। ঋতুবতীগণ নামাজ থেকে বিরত থাকতেন; কিন্তু কল্যাণ এবং মুসলিমদের দুআয় শরিক হতেন। আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের একজনের জিলবাব নেই, সে কীভাবে ইদগাহে আসবে।" রাসুল ﷺ বললেন, "তার বোন নিজের জিলবাব তাকে পরিয়ে দেবে।"'[১৫]

ইলমের মজলিশে নারীদের উপস্থিতি

পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ইলমের দারসে উপস্থিত হতেন, দ্বীনি বিষয়ে নারীসংক্রান্ত প্রশ্নসহ এমন বিভিন্ন দিক জানতেন, যে সম্পর্কে জানার চেষ্টা না করে আজকের নারীরা অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এমনকি আয়িশা ؓ স্বয়ং আনসার নারীদের প্রশংসা করেছেন এ বিষয়টিতে। তাঁরা দ্বীনি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে মিছে লজ্জার ধার ধারতেন না। তাঁরা জানাবাত, স্বপ্নদোষ, ফরজ গোসল, হায়িজ, ইসতিহাজা প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের জিজ্ঞাসা তুলে ধরতেন।

রাসুল ﷺ থেকে ইলম শেখার তীব্র পিপাসা ছিল তাঁদের। সর্বসাধারণের পরিবেশের এ ইলমি দারস তাঁদের তৃপ্ত করতে পারেনি। তাই তো তাঁরা রাসুল ﷺ-এর কাছে আবেদন করলেন, তিনি যেন নারীদের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে দেন, যেদিন পুরুষরা আগ বেড়ে নিজেদের জন্য সময় নিতে পারবে না, পুরুষদের সাথে তাঁদের কোনো অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে না। তাঁরা এ বিষয়ে স্পষ্ট রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, পুরুষরা আমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে; তাই আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন।' রাসুল ﷺ নারীদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিলেন, এ দিনে তাঁদের সমাবেশে যেতেন তিনি, তাঁদের উপদেশ দিতেন, আদেশ করতেন।

---

১৫. সহিহ মুসলিম : ৮৯০।

নারীদের এ কর্মতৎপরতা যুদ্ধের ময়দানেও একই হারে ব্যয়িত হয়েছে মুসলিম সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের সেবায়। নারীগণ যে কাজ করতে সক্ষম ছিলেন এবং যে কাজটা সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারতেন, সেসব কাজে নিয়োজিত থাকতেন তারা। যেমন : আহতদের সেবা করা, তাদের দেখাশুনা করা, রোগাক্রান্তদের শুশ্রূষা করা, রান্না করা, পানি সরবরাহ করা, মুজাহিদদের প্রয়োজনীয় বেসামরিক জিনিসগুলো তৈরি করা।

উম্মে আতিয়্যাহ ﵂ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। সাতটা যুদ্ধে তাঁর পাশে থেকে লড়াই করেছি। তাঁদের সামানাপত্রের পাশে আমরা থাকতাম, তাঁদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা ও রুগ্‌ণদের সেবা করতাম।'[১৬]

সহিহ মুসলিমে এসেছে, আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা ও উম্মে সুলাইম ﵄ উহুদের দিন ধাবমান ছিলেন। পানির পাত্র পিঠে বহন করে নিচ্ছিলেন আর যোদ্ধাদের পান করাচ্ছিলেন, পানি শেষ হলে আবার ফিরে এসে পানির পাত্র পূর্ণ করে নিচ্ছিলেন।'[১৭]

মুসলিমদের যুদ্ধে নারীদের বীরত্বের কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধের বিষয়াদিতে পূর্ণ কিতাবুল মাগাজিতে অনেক রয়েছে।

নুসাইবা বিনতে কাব। উপনাম উম্মে উমারাহ। মুসলিম যোদ্ধাদের পানি পান করানোর কাজে ছিলেন উহুদের ময়দানে। মুসলিমগণ যখন সাময়িক পরাজয়ের সম্মুখীন হন, তিনি হাতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন। নবিজি ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে যুদ্ধের সারিতে ঢুকে পড়লেন। একপর্যায়ে আহত হলেন। রাসুল ﷺ-কে বাঁচাতে তিনি নিজের জীবন দিয়ে দিলেন। সত্যকে বিজয়ী করতে ও মিথ্যাকে ধূলিসাৎ করতে মৃত্যুও তাঁর কাছে মিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

---

১৬. সহিহ মুসলিম : ১৮১২।
১৭. সহিহ মুসলিম : ১৮১১।

রাসুল ﷺ তাঁর জন্য, তাঁর স্বামী ও সন্তানের জন্য দুআ করলেন এবং বললেন, 'আমি ডানে-বামে যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই দেখি, উম্মে উমারা লড়ে যাচ্ছে।'

উম্মে উমারার ছেলেকে সম্বোধন করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমার মায়ের মর্যাদা অমুক অমুকের চেয়েও বেশি।'

ইমাম আহমাদ রাহ. বর্ণনা করেন, 'খাইবার অবরোধের সময় ছয়জন মুমিন নারী ছিলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে। তাঁরা তির তুলে দিতেন, সাবিক খাওয়াতেন, আহতদের চিকিৎসা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করে উৎসাহ দিতেন। নবিজি ﷺ তাঁদেরকে গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন।'

একইভাবে উম্মে সুলাইমের হাতে হুনাইনের যুদ্ধের দিন একটি খঞ্জর ছিল। তিনি সেটা দিয়ে শত্রুদের যাকে নাগালে পেতেন, তার পেট ফেড়ে দিতেন।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, 'উম্মে সুলাইমের ছেলে আনাস রা. বলেন, "উম্মে সুলাইম হুনাইনের যুদ্ধের দিন একটি খঞ্জর নিলেন। এটা তাঁর সাথে ছিল। তাঁর স্বামী আবু তালহা দেখে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, দেখুন, এ তো উম্মে সুলাইম, তাঁর হাতে খঞ্জর!"

রাসুল ﷺ বললেন, "এ খঞ্জর কেন?"

উম্মে সুলাইম উত্তর দিলেন, "যদি কোনো মুশরিক আমার নাগালে আসে তার পেট ফেড়ে দেবো।"

তখন রাসুল ﷺ হাসতে শুরু করলেন।'[১৮]

বুখারি রাহ. সহিহ বুখারিতে মুসলিম নারীদের যুদ্ধের শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন।

মুসলিম নারীদের বীরত্বগাথা এ দৃষ্টান্ত কেবল নববি ও সাহাবি যুগে মক্কা-মদিনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (খাইবার-হুনাইন)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না;

১৮. সহিহ মুসলিম : ১৮০৯।

বরং মুসলিম নারীগণ সাগর পাড়ি দিয়েও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পৃথিবীর দূরদূরান্তেও পাড়ি দিয়েছেন তারা।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এসেছে, আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন দুপুরে উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে কাইলুলা করছিলেন। তিনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠে হাসছিলেন।

উম্মে হারাম জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি হাসছেন কেন?'

রাসুল ﷺ বলেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোককে আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধরত অবস্থায় ছিল। তারা ওই সাগরের ওপরে আরোহণ করবে, বাদশাহরা যেভাবে খাটে আরোহণ করে।'

উম্মে হারাম বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, আমি যেন তাদের একজন হই।'

রাসুল ﷺ তাঁর জন্য দুআ করলেন। উম্মে হারাম ﷺ উসমান ﷺ-এর সময়ে সাগরের বুকে আরোহণ করেছেন তাঁর স্বামী উবাদা বিন সামিতের সাথে কিবরিস যাওয়ার সময়ে। হঠাৎ করে বাহন থেকে পড়ে যান তিনি। সে জায়গাতেই তিনি মারা যান এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১৯]

সামাজিক জীবনে নারী

ইসলামের প্রথম যুগে সামাজিক জীবনে নারী ছিল কল্যাণের দিকে আহ্বানকারিণী, সৎ কাজের আদেশকারিণী, মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারিণী।

এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে উমর ﷺ-এর বক্তৃতার সময় প্রতিবাদ করা সে নারীর ঘটনাটি। মোহরের বিষয়ে উমর ﷺ মসজিদে নববিতে কথা বলছিলেন। সাথে সাথে একজন নারী প্রতিবাদ করে তাঁকে সঠিকটা বাতলে দিলেন। উমর ﷺ প্রকাশ্যে নিজের মতকে রদ করে বললেন, 'এ নারী সঠিক বলেছে, উমর ভুল করেছে।'

---

১৯. সহিহুল বুখারি : ২৭৮৮, সহিহ মুসলিম : ১৯১২।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ তাঁর খিলাফতকালে শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ আল-আদাবিকে বাজারের ওজন-মাপ পরিদর্শকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

আল্লাহর জন্য মানতকারী রমণী

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাবিব বিন ইয়াজিদকে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের কাছে পাঠালেন তার সাথে কথা বলার জন্য এবং তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। হাবিব ছিলেন একজন টগবগে যুবক, মুমিন-হৃদয়ের অকুতোভয় সাহসের অধিকারী। মুসাইলামা তাঁকে দেখামাত্র তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল।

মুসাইলামা জানতে চাইল, 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?'

হাবিব : 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

মুসাইলামা : 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল?'

হাবিব বধির হওয়ার অভিনয় করলেন। মুখের দিকে ইশারা করে বোঝালেন তিনি শুনতে পারছেন না। মুসাইলামা কয়েকবার একই কথা বলল। আর হাবিব ﷺ-ও চুপ থেকে ঠাট্টার মাধ্যমে জবাব দিলেন।

এরপর মুসাইলামা হাবিব ﷺ-এর একটি একটি করে অঙ্গ কাটতে শুরু করে। প্রতিবার তাঁকে তার প্রতি বিশ্বাস করতে বলে, হাবিব ﷺ প্রত্যাখ্যান করেন আর মুসাইলামা তাঁর একটি অঙ্গ কেটে ফেলে।

দেহের কয়েকটি অংশ এভাবে কেটে ফেলা হলো। প্রচণ্ড রক্ত ঝরল। একসময় মুসলিম যুবকের আত্মা তাঁর রবের কাছে চলে গেল।

হাবিব ﷺ-এর মা নুসাইবা বিনতে কাব আনসারি ﷺ ছেলের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা শুনে মানত করলেন ছেলের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত, মুসাইলামাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি গোসল করবেন না।

কিছু সময় পার হলো। নুসাইবা ﷺ তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহকে নিয়ে যুদ্ধ অভিমুখে বের হলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। মুসাইলামার সেনাবাহিনীর

বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ হলো। নুসাইবা যুদ্ধের সামনের সারিতে, তাঁর গায়ে ১২টি আঘাত লাগল। ভয়ানক এ যুদ্ধের সময় তাঁর হাত কাটা পড়ল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসাইলামাকে শাস্তি দিলেন। সত্যের বিজয় হলো, মিথ্যা ভূলুণ্ঠিত হলো। নুসাইবা তাঁর মানত পূর্ণ করে ফিরলেন।

তাঁর মতো নারীর সাথে কেউ পেরে উঠবে নাকি?! কখনো না। ইতিপূর্বে তিনি উহুদের যুদ্ধ দেখেছেন, দেখেছেন হুদাইবিয়ার বাইয়াতে রিজওয়ান, দেখেছেন মক্কা-বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধ। তারও আগে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন বাইআতুল আকাবাতে।

মুসলিমা মুজাহিদা নারীদের জন্য নুসাইবা ﵂ একজন অনুপম আদর্শ। প্রত্যেক নারী তাঁর পরিবার ও দ্বীনের কাজে তাঁর অনুসরণ করে নিজেকে ধন্য করতে পারে।

খানসার পূর্বাপর

খানসা ﵂। তাঁর হাতে বহু বীর সন্তান গড়ে উঠেছে। তিনি তাঁর চার ছেলেকে কাদিসিয়ার যুদ্ধে পাঠালেন সন্তুষ্টচিত্তে, আখিরাতের আশায় বুক বেঁধে।

যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে ছেলেদের প্রতি খানসার উপদেশ ছিল :

'আমার প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইসলামে এসেছ, তোমরা হিজরত করেছ সন্তুষ্টচিত্তে। জেনে রাখো, এ নশ্বর দুনিয়া থেকে আখিরাতই উত্তম। তোমরা সবর করো, পরস্পরের সাথে টিকে থাকো, রিবাতে থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, তিনিই তোমাদের সফল করবেন।

যখন দেখবে, যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে, যুদ্ধের আগুন বেশ জোরে শোরে জ্বলে উঠেছে, তখন সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তোমরা আখিরাতে অনেক সম্পদ ও সম্মানের অধিকারী হবে।'

যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তাঁরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একে একে সবাই আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিলেন।

ছেলেদের শাহাদাতের খবর তাঁদের মায়ের কাছে যখন পৌছল, তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমার সকল ছেলেকে শাহাদাত দিয়ে আমাকে মর্যাদামণ্ডিত করেছেন, আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি আমাকে তাঁদের সাথে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন।'

একজন নারীর চার ছেলের সবাই শহিদ হয়ে গেল। তিনি না হায় হায় করলেন, আর না কাঁদলেন, না কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি করলেন।

তিনি জানেন ছেলেরা তাঁর আগে জান্নাতে চলে গেছে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই তিনিও তাঁদের সাথে মিলিত হবেন সে জান্নাতে, যার পরিধি কয়েক আসমান ও জমিনের সমান, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।

মুসলিমদের যুদ্ধক্ষেত্রে নারী

মুসলিমদের অনেক যুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেছে। ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিমগণ এক প্রচণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হন। যখন মুসলিম সেনাদের কাতার দুর্বল হলো, তখন মুসলিম নারীরা টিলার ওপরে উঠে তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের পরাজিত স্বামী ও ভাইদের মুখে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলেন, ঘোড়ার গায়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে থাকলেন; যেন মুসলিমরা শত্রুদের ওপর দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ওয়াকিদি রচিত ফুতুহুশ শামে এসেছে, আবু সুফইয়ান তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহকে বললেন, 'হে আমির, আমাদের নারীদের নির্দেশ করুন; তারা যেন এ টিলার ওপরে উঠে যায়।'

আবু উবাইদা ﵁ চিৎকার দিয়ে উঠলেন, 'হে মুমিন নারীরা, তোমরা তাঁবুর খুঁটি হাতে নিয়ে নাও। পাথর-কঙ্কর নিয়ে নাও। মুমিনদেরকে কিতালের ওপর উদ্বুদ্ধ করতে থাকো। যদি বিজয় আমাদের দিকে হয়, তবে তোমরা যেভাবে আছ, সেভাবে থাকবে। আর যদি মুসলিমদের মধ্যে কোনো পরাজিত মানসিকতার কাউকে দেখো, তাহলে তার দিকে খুঁটি ছুড়ে মারবে, তার দিকে পাথর মারবে, তার দিকে তোমাদের সন্তানদের উঁচু করে তুলে ধরে বলবে, 'তোমার পরিবার ও দ্বীন ইসলামের জন্য লড়াই করতে থাকো।...'

সকল নারী সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আপনি যেমনটা চান, হে আমির!'

যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠল, রোমানরা মুসলিমদের ওপর কঠিন হয়ে উঠল। রোমানরা ছিল মুসলিমদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। উভয় সেনাবাহিনীর সংখ্যায় বেশ বড় একটা পার্থক্য ছিল। মুসলিম সেনাদের ডান পার্শ্ব উন্মুক্ত হয়ে গেল। যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় ঘোড়াগুলো পেছনের দিকে সরে আসছিল যেন। মুসলিম নারীগণ তাঁদের পুরুষদের ভেঙে পড়তে দেখে বলে উঠল, 'মুসলিম মেয়েরা, তোমরা তোমাদের পুরুষদের বাঁচাও। তাঁদেরকে ব্যর্থমনোরথ থেকে যুদ্ধের দিকে পাঠাও।'

এরপরের ঘটনার বর্ণনায় সায়িদা বিনতে আসিম বলেন, 'সেদিন আমি টিলার ওপর নারীদের সাথে ছিলাম। যখন মুসলিমদের ডান পাশ উন্মুক্ত হয়ে গেল, তখন উফাইরা বিনতে গিফার ডাক দিয়ে বলে উঠল, "হে মুসলিম নারীরা, তোমরা তোমাদের পুরুষদের বাঁচাও। তোমাদের সন্তানদের হাতে নিয়ে উঁচু করে তুলে ধরো। পুরুষদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকো।"

নারীরা তখন ঘোড়ার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। আস বিন মুনাব্বিহের কন্যা জোরে বলে উঠলেন, "আল্লাহ সে পুরুষের মুখ ধূলিমলিন করুন, যে পুরুষ তার সঙ্গিনীকে রেখে ময়দান ছেড়ে পালায়।"

নারীরা তাঁদের স্বামীদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'যদি তোমরা আমাদের থেকে এসব আক্রমণকারীদের প্রতিহত না করো, তবে তোমরা আমাদের স্বামী নও।'

খাওলা বিনতে আজওয়ার মুমিনদেরকে যুদ্ধের ওপর উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন।

তখন মুসলিম বীর পুরুষেরা নিজেরাই নিজেদের একে অপরকে উৎসাহ দিতে শুরু করেন। এ সময় মুসলিমরা রোমানদের ওপর বেশ শক্ত আঘাত হানেন এবং তাদের বড় ক্ষতি করতে সক্ষম হন।

এ সময় হিন্দ বিনতে উতবা ﷺ বীণা হাতে বেরিয়ে আসেন। তাঁর পেছনে মুহাজির নারীগণ। তিনি সে পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে থাকেন, যা তিনি উহুদের দিন আবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলে উঠলেন :

نحن بنات طارق نمشي على النمارق

والدر في المخانق والمسك في المناطق

إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق

أو تدبروا نفارق فراق غير وامق

‘আমরা তারিকের কন্যারা বাহনে চড়ে বেড়াই, কণ্ঠে আমাদের মুক্তোর হার, মাথায় খুশবু তেল। যদি এগিয়ে যাও পাবে আমাদের, আমরা বিছিয়েছি তোমাদের জন্য নরম বিছানা। যদি পিছিয়ে আসো হারাবে আমাদের, সে বিচ্ছেদ হবে বড় দুঃখের।’

এরপর তিনি পিছিয়ে আসা মুসলিমদের ডান পাশের সেনাদের দিকে ফিরলেন, তাঁদেরকে ব্যর্থমনোরথ দেখে বললেন, ‘তোমরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে যাচ্ছ কেন?! তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? অথচ তিনি তোমাদের দিকে চেয়ে আছেন!’

নিজের স্বামী আবু সুফইয়ানের ব্যর্থমনোরথের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীর মুখের ওপর বাড়ি দিলেন খুঁটি দিয়ে। তাঁকে বললেন, ‘ইবনে সখর, কোথায় যাচ্ছ?! যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যাও। নিজেকে বিলিয়ে দাও; যেন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে করা কাজগুলোর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।’

হিন্দার কথায় আবু সুফইয়ান উৎসাহিত হলেন, মুসলিমদের মাঝেও উৎসাহ সঞ্চারিত হলো।

জুবাইর বিন আওয়াম ﵁ বলেন, ‘আমি দেখলাম, নারীরা তাঁদের পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তাঁদের হাতে খুঁটি। তাঁরা ঘোড়ার সামনে এগিয়ে গেছে। আমি দেখলাম, এক নারী রোমানদের এক বড় সৈনিকের দিকে ফিরল। সে তার ঘোড়ার ওপর ছিল। এ নারী তার পেছনে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার ঘোড়া উল্টে তাকে ফেলতে সক্ষম হলো। এরপর তাকে হত্যা করে বলল, “মুসলিমদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের বয়ান এটাই।” মুসলিম নারীরা রোমানদের যুদ্ধের অনেক বড় বড় বীরকে হত্যা করেছিল।’

মুসলিম পুরুষরা যখন দেখল, তাঁদের নারীরা বেশ বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছে, তাঁরাও যুদ্ধের ওপর ধৈর্য ধরে অটল থাকল।

একজন তাঁর পাশের জনকে বলতে লাগল, 'যদি আমরা যুদ্ধে অটল না থাকি, তবে আমাদেরই ওড়না পরে নেওয়া উচিত।'

এ ছিল মুসলিম নারীদের বীরত্বের একটা মর্যাদাময় কাহিনি। এ ঘটনা পড়ার পর আজকের নারীদের বেশ খানিকটা সময় হতচকিত হয়ে যাওয়া উচিত। এ যুগের নারীদের কতই না প্রয়োজন সেসব নারীদের অনুসরণ করার, যাদের অংশগ্রহণে যুগের পর যুগ ধরে ইসলামি ইতিহাস তৈরি হয়েছে।
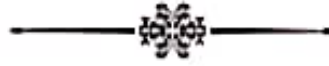
তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম তরুণীর চরিত্র

বেশি কথা বোলো না

যখন কোথাও হইচই-গোলমাল থাকে, তখন চুপ করে থাকাই শ্রেয়। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।'[২০]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ

'নিশ্চয় বান্দা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো কথা বলে; অথচ সে কথা সম্পর্কে তার চেতনা নেই; কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।'[২১]

---

২০. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৫, সহিহ মুসলিম : ৪৭।
২১. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৮।

আবু দারদা ﷺ-এর অসিয়ত ছিল এমন :

'তোমার কানের চাইতে মুখের ব্যবহার পরিমাণে অর্ধেকের মতো করো। আল্লাহ তাআলা দুটি কান ও একটি মুখ সৃষ্টি করেছেন; যেন তুমি বেশির ভাগ সময় শুনো এবং কম কথা বলো।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ বলেন :

'মুমিন কম কথা বলে, কাজ বেশি করে। মুনাফিক বেশি কথা বলে, কাজ কম করে।'

মানুষের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না

অপরের দোষ খোঁজার চাইতে তুমি নিজের দোষত্রুটি ঠিক করার প্রতি মনোযোগী হও। জাইনুল আবিদিন ﷺ একজন মুসলিমের নিজের দোষত্রুটি জ্ঞাত থাকাকে প্রভু-প্রদত্ত দান বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এটি এ রকমই। অন্যদিকে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের দোষ খোঁজে, সে এ হীন কাজ এ জন্যই করে যে, তার নফস তাকে গাফিলতিতে ফেলেছে।'

আস-সারি আস-সাকাতি 'অন্যের দোষ খোঁজা'-কে একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে দেখতেন। তিনি বলেন, 'অন্তরের জন্য অধিক ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক এবং একজন মুসলিমকে খুব দ্রুত শেষ করে দেওয়ার মতো রোগ, যে রোগের ভয়ে আমি সব সময় তটস্থ থাকি, সেটা হচ্ছে নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে জ্ঞাত না থাকা এবং অন্যের দোষত্রুটি তালাশ করা।'

অনর্থক কথা পরিত্যাগ করো

ইবনে রওয়াহা ﷺ আবু দারদা ﷺ-এর হাত ধরে বলতেন, 'চলুন, আমরা কিছু সময় ইমানের চর্চা করি।'

এরপর তাঁরা ইমানের বিষয়ে আলোচনা করতেন, পরস্পরকে তাওবার বিবিধ পদ্ধতির বর্ণনা দিতেন, নফসের উপকারে আসে এমন কথা বলতেন, মানুষের মাঝে সংশোধনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

তেমনই মাইমুন ﷺ যেতেন তাবিয়িকুল শিরোমণি হাসান বসরি ﷺ-এর কাছে। মাইমুন এসে হাসান বসরির দরজায় কড়া নাড়তেন। বলতেন, 'আবু সাইদ, আমি আমার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার আভাস পেয়েছি, আপনার কাছে যা আছে, তা দিয়ে আমার অন্তরকে নরম করে দিন।'

যদি তুমি একজন নেককার সঙ্গিনী না পাও, তবে এ সময়টা রব্বুল আলামিনের সাথে একান্ত আলাপনে কাটিয়ে দাও। সাহাবিগণ ও তাবিয়িগণ নফসের তাজকিয়া ও ইমানের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কিছু কার্যকর মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, যেমন :

- চলো, কিছুক্ষণ বসে আমরা ইমানের চর্চা করি।
- চলো, কিছুক্ষণ হাঁটি আর ইমানের চর্চা করি।
- বসো, কিছু ইলম শেখাও যে জানে না তাকে।
- আমার অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার আভাস পাচ্ছি, আমার অন্তরকে নরম করে দিন।
- চলো, আমরা যুদ্ধের কথা বলি।

এসবই আল্লাহর সাথে কিছুটা সময় কাটানোর মতো আমল।

সত্যবাদী হও

ইমান ও মিথ্যা কখনো মুমিনের অন্তরে একত্রিত হয় না। নারীরা যেসব কারণে মিথ্যা বলতে উদ্যত হয়, সেগুলোর কিছু কারণ হচ্ছে, গর্ব-অহংকার করার জন্য, নিজেকে অপর থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য বাড়িয়ে কথা বলা।

কিছু মানুষ সংখ্যার দিকটা বাড়িয়ে বলে। এতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সেটা হতে হবে নির্দিষ্ট সীমার ভেতর, যেন কথা অনর্থক পর্যায়ে চলে না যায়। যেমন তুমি বললে, 'আমি তোমাকে ২০ বার কল করেও পাইনি।' আসলে তুমি তাকে ২০ বার নয়; বরং পাঁচ বার কল করেছিলে। অথবা তুমি তাকে বললে, 'আমার

ছেলেকে আগুন নিয়ে খেলতে ৬০ বার নিষেধ করেছি; কিন্তু তবুও সে কথা শুনল না।' আসলে তুমি তাকে তিন বার নিষেধ করেছ।

এমন বাড়িয়ে বলা দোষের কিছু নয়। কথার সময় এমন বাড়িয়ে বলার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। মানুষ এ রকম বলে থাকে। এ বিষয়ে তাকে শক্তভাবে ধরা হয় না। কিন্তু এটা একটা সীমার ভেতর হতে হবে। অবশ্য এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।

নেককার মুসলিম কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেও এমন বাড়িয়ে বলা থেকে বিরত থাকে; যদিও এমন কথা সামান্য ভুলেরও হয়, তবুও বিরত থাকে। বর্ণিত আছে, এক দুনিয়াবিমুখ মুমিনের মৃত্যুশয্যায় তার ফুফু এলেন দেখা করতে।

ফুফু : ছেলে আমার, কেমন আছ?

- আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন?
- না।
- আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন?
- না।
- তাহলে আপনি যদি 'ভাতিজা' বলতেন, সেটাই ভালো হতো! যদি আপনি মিথ্যা না বলতেন!

মিথ্যার বিরুদ্ধে এমন শানিত অনুভূতির দিকটা লক্ষ করো। এমনকি বাড়িয়ে বলার ক্ষেত্রে এ দিকটা লক্ষ রাখো। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণকারী কী করে এমন কিছুকে এড়িয়ে যেতে পারে!

অহংকার-গৌরবের প্রতিযোগিতায় কথা বলা আরেকটা রোগ। এ রোগে অনেক নারী আক্রান্ত। এমনকি অনেক পরহেজগার নারীও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়।

যেমন তুমি খেয়াল করলে দেখবে, কোনো মহিলা তার বিয়ের উপযুক্ত মেয়েকে নিয়ে অতিরিক্ত প্রশংসা করে বেড়াচ্ছে।...

সাধারণ গৌরবময় প্রতিযোগিতার কথার চাইতেও আরও হীনতর স্তর রয়েছে। এটা খুবই নিন্দনীয়। সুস্থ মস্তিষ্ক কখনো এটাকে সঠিক হিসেবে বিবেচনা করবে না।

যেমন : কেউ বলল যে, তার মেয়ে এক ঘণ্টায় এক পারা কুরআন হিফজ করেছে। এ কথাটা এ নারী যেখানেই যায় সেখানেই বলতে থাকে। তখন তুমি দ্বিধায় পড়ে যাও যে, তার মেয়ে কি দেড় দিনে পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছে কি না! এমন গৌরবময় প্রতিযোগিতামূলক কথা বলা নিন্দনীয়। মানুষ কখনো এমন কিছুকে সমর্থন করে না।

অন্যদিকে নিজেকে অন্যের চাইতে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের আগ্রহ অনেক বেশি কাজ করে নারীদের মাঝে। এটা বেশ কঠিন একটা রোগ। এমনকি এ রোগটা কাউকে মিথ্যা বলতে, একই মিথ্যা বারবার বলতেও বাধ্য করে। তারা একই মিথ্যা বারবার বলতে থাকে, যতক্ষণ না সেটা তাদের নিজেদের অনুভূতিতে খারাপ লেগে না উঠছে।

যখন তুমি কারও সামনে বললে যে, তোমার ছেলে মাদরাসায় প্রথম স্তরে উন্নীত হয়েছে, তখন তুমি সে বোনটির মনকে সংকীর্ণ করে দিলে। সে বোন তার পরিবারে তোমার পরিবারের অগ্রগণ্যতার কথা তুলে ধরে, যদি তার পরিবারে এমন প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়া কেউ না থাকে। দুর্বলতার এমন অনুভূতিই সে বোনকে মিথ্যা ও বানিয়ে কথা বলার দিকে নিয়ে যায়।

এ রোগটা নারীদের মধ্যে একটি বিশেষ রূপে পাওয়া যায়, বিশেষ করে নারীসংশ্লিষ্ট কাজগুলোর দক্ষতার ক্ষেত্রে, যেমন : রান্না করা, কাপড়ে নকশি করা, ঘরদোর সাজিয়ে রাখা ইত্যাদি।

এ রকম ক্ষেত্রে কথা বলতে সাবধান থাকবে, নিজের অজান্তে কাউকে মিথ্যার দিকে ঠেলে দেবে না। অন্যের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক, তবে যেন সীমাতিরিক্ত না হয়। শরয়িগতভাবে ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যের সাথে সুন্দর আচরণ করাই কাঙ্ক্ষিত।

যদি কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে তাকে সাহায্য করবে। যদি কারও মাঝে সত্যিই কোনো বিশেষত্ব থাকে, তবে তার প্রশংসা করতে কুণ্ঠাবোধ কোরো না। যদি তোমার এ প্রশংসা তার অনুপস্থিতিতে হয়, তবে সবচেয়ে ভালো হয়।

কারও অনুপস্থিতিতে তুমি তার প্রশংসা করলে, আর এ কথাটা অন্য কেউ তার কাছে পৌঁছে দিলে তার কাছে খুবই ভালো লাগবে।

অন্যের সুন্দর গুণের প্রশংসা করার চেষ্টা করবে, তবে কারও মাঝে যে গুণ নেই, সেটা নিয়ে তার প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এমন করা একদিক থেকে মিথ্যা বলার শামিল। অন্যদিক থেকে বানিয়ে কথা বলা ও নিফাকি করার শামিল।

তোমার আমলকে আল্লাহর জন্য করে নাও

এক রাখাল উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'আমিরুল মুমিনিন, বাঘ কেন ছাগলকে পাহারা দেয়?'

উমর ﷺ বলেন, 'কারণ, আমি আমার ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে একনিষ্ঠ করে নিয়েছি; তাই বাঘও নিজেকে একনিষ্ঠ করে নিয়েছে এবং ছাগলকে পাহারা দিয়েছে।'

তুমি যেসব রিয়া (লোক-দেখানো আমল) করেছ, তার অনেক কিছুই এখন তোমার মনে নেই; কিন্তু আল্লাহ সেসব ঠিকই জানেন, সেসব নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আবু বকর ﷺ-এর মতো দুআ করতে পারো। যখন অন্যরা তাঁর সম্পর্কে প্রশংসা করছিল, তখন তিনি দুআ করলেন :

'হে আল্লাহ, আমি যা জানি আর যা জানি না সব গুনাহ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার সম্পর্কে আমার চাইতে আপনিই বেশি জ্ঞাত। আমার সেসব গুনাহও ক্ষমা করুন, যা আমি জানি না। তারা যে রকম ধারণা করে আমাকে তার চাইতে বেশি উত্তম বানিয়ে দিন।'

জনৈক নেককার বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে আমার শিথিলতার প্রমাণ হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ আমাকে আবিদ মনে করে।'

জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'আল্লাহ মানুষের গুনাহ গোপন রাখেন, একদল মানুষ এ গোপনীয়তায় ধোঁকায় পড়ে গেছে, ভালো ভালো প্রশংসা তাদের ফিতনায় ফেলে দিয়েছে। তোমার সম্পর্কে তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো, অন্য মানুষ নয়। তাই অন্যের প্রশংসায় আবেগে বিহ্বল হয়ো না। গুনাহ ত্যাগ করো এবং আমল করে যাও।'

আমাদের মধ্যে একটা বড় ভুল হচ্ছে, আমরা অন্যকে দেখে নিজের কর্ম সংশোধন করে নিই, একজন ভালো মানুষের অনুসরণ করে বাহ্যিক কর্ম ঠিক করে নিই; কিন্তু অন্তরকে সংশোধন করি না!

একজন মুসলিমের উপমা স্মরণ করো, মানসপটে তার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করো, একজন সত্যিকার মুসলিম ফসলভরা সবুজ মাঠের মতো, মানুষ সেখান থেকে ফসল তোলে নিজের প্রয়োজন পূরণ করে। এসব মানুষের কেউ কৃতজ্ঞ হয়, কেউ হয় অকৃতজ্ঞ; কিন্তু সবুজ ফসলের মাঠ আগের মতোই শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকে।

একজন সত্যিকার মুসলিম কামারের নেহাইয়ের মতো, তার ওপর শক্ত হাতুড়ির বাড়ি পড়ে, একটার পর একটা পড়তেই থাকে, একেকটা বাড়ি অনেক কঠিন যন্ত্রণাকর হয়; কিন্তু নেহাই এ কারণে শান্ত থাকে যে, এভাবে নিজে কষ্ট পেলেও মানুষের উপকার হবে, কল্যাণ হবে।

একদিন তুমি নামাজ পড়ার জায়গায় গিয়ে দেখলে তোমার নেককার বোনদের মধ্যে কেউ একজন কুরআন তিলাওয়াত করছে, আরেকজন চাশতের নামাজ পড়ছে, আরেকজন একটা বই পড়ছে।...

এ চিত্রের সাথে আরেকটা চিত্রের তুলনা করো। কয়েক জন তরুণী বসে বসে মানুষের গোশত খাওয়ার উৎসবে মেতে আছে, গিবত করে যাচ্ছে, অথবা তারা অনর্থক কথা বলে যাচ্ছে।

আরেকটা চিত্র তুলনা করো, এক তরুণী কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অথবা পাড়ার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে, খানিক পরপর সব দিক তাকিয়ে দেখছে তার বয়ফ্রেন্ড আসছে কি না, তাকে কেউ চিনে ফেলেছে কি না!

অথবা এ চিত্রটাও তুলনা করতে পারো, এক তরুণী টেলিভিশনের সামনে বসে ফিল্ম দেখছে, নায়ক-নায়িকার একান্ত মুহূর্ত হা করে দেখছে!

অথবা এক তরুণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলের কলে বা ইন্টারনেটে ডুবে আছে এবং সে যুবকের সাথে কথা বলছে, যে তাকে বড় বড় স্বপ্নপূরণের আশ্বাস দিচ্ছে, তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। অথচ আসল ঘটনা হচ্ছে, এ যুবক তাকে কেবল ভোগের জন্য চাইছে, তার সম্মান ও মর্যাদা ধূলিসাৎ করাই যুবকের উদ্দেশ্য।

আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাইছি, প্রথম চিত্রের সাথে বাকি চিত্রগুলোর তুলনা করে কোনটাকে সুখকর ও স্থির জীবন মনে করছ তুমি?!

ওয়াদা রক্ষা করো

ওয়াদা ভঙ্গ করা মারাত্মক গুরুতর অপরাধ। এর পেছনে তিনটি কারণ থাকতে পারে : ইমানের দুর্বলতা, আমিত্ববোধ, গুরুত্ব না দেওয়া।

ইমানের দুর্বলতা : ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত। রাসুল ﷺ বলেন :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'মুনাফিকের আলামত তিনটি : ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ২. যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে; ৩. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।'[২২]

---

২২. সহিহুল বুখারি : ৩৩, সহিহু মুসলিম : ৫৯।

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আরও বর্ধিত এসেছে, (وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) 'যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে (তবুও সে আচরণগত মুনাফিক)।'[২৩]

ওয়াদা রক্ষা না করার অপরাধীকে নিন্দা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না?'[২৪]

কখনো কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করা হয় ওয়াদা ও ওয়াদাকারীর মর্জির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে। এমন অনেকে আছে, যারা মানুষের কল্যাণের চাইতে নিজের মন-মর্জিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে; যদিও তাদের মর্জির কাজটা তুচ্ছই হোক না কেন! যেমন এক বোন তোমাকে ওয়াদা দিয়েছে আটটায় তোমার সাথে দেখা করবে; কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম ছুটে যাওয়ার ভয়ে।

কিছু মানুষ অন্যের সময়কে গুরুত্বহীন মনে করে বিধায় কারও সময়কে দামি মনে করে না, তাদের কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। এমন করা শরয়িভাবে হারাম। কারণ, কোনো মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া বা হেয় করা হারাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»

'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না, তাকে অপমান করবে না এবং হেয় প্রতিপন্ন করবে না।' 'তাকওয়া এখানে।' এ কথা বলে রাসুল ﷺ তিনবার তাঁর বুকের দিকে ইশারা

২৩. সহিহ মুসলিম : ৫৯।
২৪. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ২।

করেন। এরপর বললেন, 'একজন মুসলিমের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অপর মুসলিমকে হেয় জ্ঞান করে। একজন মুসলিমের রক্ত, সম্পদ, সম্মান নষ্ট করা অপর মুসলিমের জন্য হারাম।'[২৫]

তাই সব সময় সাবধান থাকবে। কখনো তোমার ওয়াদার বরখেলাফ করবে না। কাউকে নির্দিষ্ট সময়ের ওয়াদা করলে সঠিক সময়ে উপস্থিত হবে; যদিও সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে তোমার যতই কষ্ট করতে হোক না কেন।

বিনয়-নম্র হও

বিনয়-নম্রতা নবিদের চরিত্রের একাংশ, নেককারদের প্রতীক। বিনয়-নম্রতা তোমাকে মানুষের অন্তরের অনেক নিকটবর্তী করে দেবে। মানুষ যদি দেখে তোমার মধ্যে অহংকার নেই, তখন তারা তোমার নিকটবর্তী হবে। সুপ্ত অহংকার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন : মাসলাহাতের নামে মালিক তার কর্মচারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা। তবে এতটুকু হওয়া জরুরি যে, কর্মচারীর ওপর মনিবের এতটুকু ক্ষমতা থাকবে যে, কর্মচারী মনিবের ওপর দুঃসাহস দেখাবে না। অনেককে দেখা যায় 'অনধিকারচর্চার' দোহাই দিয়ে অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করে।

যখন তোমার কোনো বোন তোমাকে ভালো কাজের নসিহত করে, তখন তুমি তার ওপর অহংকার দেখাতে যেয়ো না।... কল্পনা করো, যদি আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কেন তুমি আমার দ্বীনের কথায় সাড়া দিলে না, যখন অমুক নারী তোমাকে দ্বীনের পথে আহ্বান করছিল?!

তখন কি তুমি আল্লাহকে বলতে পারবে, আমি তার চেয়ে উত্তম। সে পার্থিব বিষয়াদির দিক থেকে ও জ্ঞানের দিক থেকে আমার সমপর্যায়ের ছিল না?!

২৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪।

তুমি কি তখন আল্লাহকে বলতে পারবে, আমাকে যে নসিহত করতে এসেছিল, সে এমন কে? সে কি আমার সমপর্যায়ের? আমার জ্ঞান ও তার জ্ঞানের তুলনা চলে কী করে?

তাই নসিহতের সময় ব্যক্তির দিকে নয়; বরং আমরা কথার দিকে লক্ষ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী আমাদের নসিহত করবে, ততক্ষণ আমরা তার নসিহতকে ফিরিয়ে দেবো না।

নসিহত গ্রহণ করো

হাসান বসরি ﵀ নসিহত গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি নসিহতকে তিনি জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বলেছেন। তিনি বলেন :

'তিন জিনিস ছাড়া জীবন পরিপূর্ণ হয় না :

এক. এমন ভাই, যার সঙ্গ গ্রহণ করে তুমি কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। যদি তুমি কখনো পথচ্যুত হও, তবে সে তোমাকে ঠিক করে দেবে।

দুই. জীবন ধারণের জন্য নির্ভার জীবিকা, যেখানে অন্য কারও হস্তক্ষেপ থাকবে না।

তিন. জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করা, যে নামাজে ভুল শুধরে নেবে এবং তার সাওয়াব আবশ্যক করে নেবে।

ইমাম শাফিয়ি ﵀ বলতেন :

'যখন আমি কাউকে নসিহত করেছি এবং সে আমার নসিহত গ্রহণ করেছে, তার সাথে আমার সম্পর্ক মজবুত হয়েছে। যখন কেউ নসিহত শুনে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে এবং আমি তাকে ত্যাগ করেছি।'

শোনো, একজন ভালো বান্ধবী জোগাড় করে নাও, যে বান্ধবী তোমাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে। উমর বিন আব্দুল আজিজ তার গোলাম মুজাহিমকে বলেন :

'রাজা-বাদশাহ জনসাধারণের ওপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করে। কিন্তু আমি নিজের ওপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছি তোমাকে। যদি কখনো আমাকে মন্দ কিছু বলতে দেখো অথবা অনুচিত কিছু করতে দেখো, তখন আমাকে সাবধান করে দেবে, আমার জন্য সহজ করে দেবে।'

তুমিও তোমার দ্বীনি বোনের নসিহত গ্রহণ করো। যদি কেউ তোমার সামনে তোমার বাস্তবতা তুলে ধরে, তবে তাকে নিন্দা কোরো না, তার মনকে সংকীর্ণ করে দিয়ো না। মাইমুন বিন মিহরান নিজেকে তার সাথিদের সামনে পেশ করে বললেন, 'আমার মধ্যে তোমরা কী অপছন্দ করো, সেটা সরাসরি বলো। কারণ, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইকে ঠিকভাবে নসিহত করে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের ত্রুটি সম্পর্কে তাকে অবগত করে।'

লজ্জা হোক তোমার ভূষণ

একজন তরুণীর কি লজ্জাবতী হওয়া সমীচীন নয়?! তার লজ্জা তাকে কথা, কাজ ও চলাফেরার অশালীনতা থেকে বাঁচাবে। এমন তরুণী কি সে তরুণীর চাইতে অধিক সম্মানীয় নয়, যে তরুণী পর্দা করে না, মুখ বেঁকিয়ে স্টাইল করে কথা বলে, অশালীন পোশাক পরে, এমন পোশাক পরে যা পরা না-পরা সমান!

রাসুল ﷺ কি বলেননি যে,

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ

'অশ্লীলতা কোনো জিনিসের কেবল কদর্যতাই বৃদ্ধি করে, আর লজ্জা কোনো জিনিসের সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।'[২৬]

কিন্তু কেউ লজ্জাবতী হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে দুর্বল, সরল, কোনো কিছু বোঝে না। মুসা ﷺ-এর ঘটনা পড়েছ নিশ্চয়। মুসা ﷺ ও শুআইব ﷺ-এর দুই মেয়ের ঘটনা। মুসা ﷺ তাদের বললেন, (مَا خَطْبُكُمَا) 'এখানে তোমাদের কী কাজ?' তিনি এরচেয়ে বেশি কিছু বলেননি। তাদেরকে তাদের নাম জিজ্ঞেস

২৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৮৫, মুসনাদু আহমাদ : ১২৬৮৯।

করেননি। তাদের বাবার নামও জানতে চাননি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করেননি যে, তারা দুজন বিবাহিতা কি না, যেমনটা আজকাল কিছু মানুষ করে থাকে!

এরপর লক্ষ করো শুআইব-কন্যাদ্বয় কী বলে উত্তর দিলেন, তারা খুব সংক্ষেপে একটা পরিপূর্ণ জবাব দিয়ে দিলেন, যে জবাবের পর কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না, তারা বললেন :

لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

'আমরা আমাদের পশুগুলোকে পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালেরা (তাদের পশুগুলোকে) সরিয়ে নেয়, আর আমাদের পিতা খুবই বয়োবৃদ্ধ।'

এভাবে উত্তর দিয়ে তারা কথা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তারা মুসা ﷺ-এর নাম জানতে চাননি, তাঁর শহর, তাঁর জীবনের কাহিনি, তিনি বিবাহিত কি না—এসব জানতে চাননি।

দুই বোনের একজনের চালচলন তুলে ধরে কুরআন বলে :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

'তখন নারীদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদে তার কাছে আসলো।'[২৭]

যেন লজ্জা পায়ের নিচে বিছিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন।

এমনই হয় লজ্জাশীল নারী... এমনই হয় লজ্জা... এমনই হয় কথাবার্তা।

তাই কোনো ছেলের কাছে তার নাম জানতে চাওয়া, সে কোথায় পড়ে, কোন ইয়ারে পড়ে, কোন বইগুলো তার সিলেবাসে আছে, তাদের কোন শিক্ষক পড়ায়, এভাবে কথা চালিয়ে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে আসা যে, পরের বার আবার সে জায়গা থেকে শুরু করা যায়, এভাবে করা যাবে না।

---

২৭. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৫।

সৎ বান্ধবীদের ভালোবাসো

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

'আল্লাহর জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারী দুই ব্যক্তির মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক প্রিয়, তাদের মধ্যে যে তার সঙ্গীকে অধিক ভালোবাসে।'[২৮]

ইমাম শাফিয়ি ﵀ কত চমৎকার বলেছেন :

أحب الصالحين ولست منهم *** لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي *** ولو كنا سواء في البضاعة

'আমি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলেও তাদের ভালোবাসি। আশা করি তাদের (ভালোবাসার) মাধ্যমে আমি শাফাআত লাভ করব। যে ব্যক্তি গুনাহের ব্যবসা করে, তাকে আমি অপছন্দ করি; যদিও এ দিক থেকে আমরা উভয়ই সমান।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা স্মরণে রাখবে :

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

'একজন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে তা কবুল হয়। এ দুআ করার সময় একজন ফেরেশতাকে দুআকারী মুসলিমের শিয়রে নিযুক্ত করা হয়, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তখন নিযুক্ত ফেরেশতা বলে, "আমিন, তোমার জন্যও তা-ই হোক।"'[২৯]

---

২৮. আল-মুজামুল আওসাত : ২৮৯৯।
২৯. সহিহ মুসলিম : ২৭৩৩।

হ্যাঁ, ভ্রাতৃত্বের এতটাই গুরুত্ব আল্লাহর নিকট... আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসা এতটাই সাওয়াবপূর্ণ। এ কারণেই তো উমর বিন খাত্তাব ﵁ এমন ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে ইসলামের পর সবচেয়ে মূল্যবান নিয়ামত বলে আখ্যা দিলেন। তিনি বলেন :

ما أعطي أحد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح.. فإذا رأى أحدكم وُدّاً من أخيه فليتمسك به

'ইসলামের নিয়ামত পাওয়ার পর কাউকে নেককার ভাইয়ের চেয়ে উত্তম কিছু দেওয়া হয়নি। যদি তোমাদের কেউ কোনো ভাইয়ের মাঝে ভালোবাসা দেখো, তবে তাকে আঁকড়ে ধরো।'

মালিক বিন দিনার ﵀ নেক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বকে দুনিয়ার প্রাণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, 'দুনিয়ার বুকে তিনটি জিনিসে প্রাণ বাকি আছে : এক. নেককার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করা। দুই. তাহাজ্জুদে কুরআন তিলাওয়াত। তিন. এমন বাড়ি, যেখানে আল্লাহর জিকির হয়।'

মুসলিম বোনের পদস্খলন ক্ষমা করো

কেন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তিরস্কার-ভর্ৎসনা থাকবে? কেন ক্রোধ ও উত্তেজনা থাকবে?

এ ঘটনা শুনেছ কি? একবার ইবনুস সাম্মাককে এক বন্ধু বলল, 'কাল অমন সময়ে তোমার সাথে আমি দেখা করব, আমরা ঝগড়া করব।'

ইবনুস সাম্মাক বললেন,' বরং কাল আমরা একে অপরকে ক্ষমা করে দেবো।'

মুসলিম বোনের ভুল ক্ষমা করা, তার ত্রুটি মাফ করা, তাকে তিরস্কার না করে সুন্দর নসিহত করা কি শ্রেয় নয়?! পরস্পরকে ক্ষমা করা কি শ্রেয় নয়, অন্তরের শান্তির জন্য অধিক উপযুক্ত নয়?

এটাই কি জীবনের সৌন্দর্য নয়, যখন তোমার বোনের সাথে সাক্ষাতে করমর্দন করলে আর তার জন্য দুআ করলে, 'আমার রব, আমার এ বোনকে ক্ষমা

করুন?' এরপর নিজের অন্তরকে সাক্ষী করে রাখলে যে, তুমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছ, তার ভুল মাফ করে দিয়েছ।

পরস্পরকে দোষারোপ করা, তিরস্কার করা কি এমন অবস্থায় নিজেদের ফেলে দেওয়া নয়, যেখানে ফিতনা সহজে উভয়কে গ্রাস করতে পারে?!

আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথার অনুসরণ করব এটাই তো শ্রেয়। তিনি বলেন :

لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ

'তাদের মাঝে কোনো মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সবার অন্তর হবে এক অন্তরের ন্যায়।'[৩০]

বিপদ ডেকে এনো না

সব সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস স্মরণ রাখবে :

لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوِ الْمُؤْمِنَةِ، فِي جَسَدِهِ، وَفِي مَالِهِ، وَفِي وَلَدِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ

'মুমিন নর-নারীর দেহে, সম্পদে, সন্তানের মধ্যে সব সময় বিপদ লেগেই থাকবে, এভাবে একসময় সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, তার কোনো গুনাহই বাকি থাকবে না।'[৩১]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ

'আর এভাবে বান্দা বিপদাপদে পড়তেই থাকে, শেষ পর্যন্ত সে জমিনের ওপর এমনভাবে বিচরণ করতে থাকে যে, তার আর কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।'[৩২]

---

৩০. সহিহুল বুখারি : ৩২৪৫, সহিহ মুসলিম : ২৮৩৪।
৩১. মুসনাদু আহমাদ : ৭৮৫৯।
৩২. সুনানুদ দারিমি : ২৮২৫।

তবে এর অর্থ এ নয় যে, তুমি বিপদ কামনা করবে, বিপদ ডেকে আনবে। রাসুল ﷺ আমাদেরকে এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا،

'হে লোকসকল, শক্রর সঙ্গে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা কোরো না; আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা করো। এরপর যখন তোমরা শক্রর সম্মুখীন হবে, তখন (শক্রকে মোকাবিলা করা অবস্থায়) ধৈর্যধারণ করবে।'[৩৩]

ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ-এর এ বাণী স্মরণ রাখবে :

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

'ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও প্রশস্ত দান কাউকে দেওয়া হয়নি।'[৩৪]

দানশীল হও

দানশীল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তোমাকে খুব বেশি দান করতে হবে; বরং অল্প পরিমাণে হলেও সব সময় দান করতে থাকো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

'হে মুসলিম নারীগণ, কোনো প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর প্রদানকৃত উপহারকে হেয় না করে; যদিও সেটা ছাগলের সামান্য গোশতযুক্ত হাড় হয়।'[৩৫]

এখানে বলা হয়েছে, কোনো প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীর ছোট থেকে ছোট হাদিয়াকেও হেয় না করে কবুল করে নেয়।

৩৩. সহিহুল বুখারি : ২৯৬৬, সহিহ মুসলিম : ১৭৪২।
৩৪. সহিহুল বুখারি : ১৪৬৯, সহিহ মুসলিম : ১০৫৩।
৩৫. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৬, সহিহ মুসলিম : ১০৩০।

দান করার অর্থ এ নয় যে, বড় বড় দস্তরখান বিছিয়ে মানুষকে খাওয়ানো, বহু মূল্যের কিছু কাউকে হাদিয়া বা দান করা; বরং নিজের সামর্থ্যের মধ্যে থাকা ছোট ছোট বস্তু দান করলেও হবে।

প্রিয় বোন, সব সময় নিজের আমলের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে সামনে রাখবে, নিয়ত করবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করছ তুমি, তাহলে তোমার কোনো আমলই বৃথা যাবে না।

হাস্যোজ্জ্বল থাকো

তবে শুধু নারীদের সামনে। পুরুষদের সাথে এমন কিছু করা যাবে না, যেটার মাধ্যমে তাদের অন্তরে কোনো রোগের ছোঁয়া লেগে যায়। আল্লাহ তাআলা এমন কিছু করতে নিষেধ করেছেন এবং সাবধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না; যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।'[৩৬]

হাস্যোজ্জ্বল থাকা মুমিন নরনারীর বৈশিষ্ট্য। এটি সবার মাঝেই থাকা উচিত। হাস্যোজ্জ্বল থাকা কারও অন্তরে প্রবেশের দ্রুততর পথ। রাসুল ﷺ এই ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'নেকের কোনো কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না; যদিও সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মতো (সহজ) কাজই হোক না কেন।'[৩৭]

৩৬. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩২।
৩৭. সহিহ মুসলিম : ২৬২৬।

তিনি আরও বলেন :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসিও সদাকা।'[৩৮]

আর মানুষের সাথে সাক্ষাতে মুখের ওপর মুচকি হাসি টেনে আনা মুনাফিকি নয়; বরং অন্তরকে আকৃষ্ট করা ও ভালোবাসাকে অটুট রাখার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ম।

হয়তো তুমি আয়িশা ﵂-এর হাদিসটি মনে করছ এখন। একবার এক লোক রাসুল ﷺ-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইল। রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা তাকে অনুমতি দাও।' এরপর বললেন, 'আশিরার এ লোকটা কত না খারাপ!'

এরপর যখন সে লোকটার সাথে রাসুল ﷺ কথা বলছিলেন, তখন তিনি নরম ভাষায় কথা বললেন। আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহর রাসুল, আপনি তার ব্যাপারে যা বলার বললেন, এরপর তার সাথে এভাবে সুন্দর করে কথা বললেন!"

রাসুল ﷺ বললেন, "আয়িশা, এমন মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ, যার রূঢ়তা থেকে বাঁচতে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে।"'[৩৯]

পরিশেষে,

- নিজেকে আকর্ষণীয় করার জন্য সৌন্দর্যবর্ধনের সরঞ্জামগুলো অতিরিক্ত ব্যবহার করবে না।
- ঠিকমতো শরিয়াহসম্মত পোশাক পরবে।
- নিজের চাইতে বেশি বয়সের মেয়েদের সাথে পাল্লা দিতে যেয়ো না। নিজের জীবনের প্রতিটি স্তর তার উপযোগী করে যাপন করো।

---

৩৮. সহিহ্ ইবনি হিব্বান : ৪৭৪।
৩৯. সহিহুল বুখারি : ৬০৫৪।

- অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শেখো, সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগাও, মা-বাবা ও আলিমদের নসিহত গ্রহণ করো।

- নিশ্চিত থাকো যে, তোমার জীবনসঙ্গী তোমার ঘরের দোরে কড়া নাড়বেই অচিরে ইনশাআল্লাহ। তবে এমন হওয়া যাবে না যেমন অনেকে করে যে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে বিবাহের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়, এমনটা হয়তো পাত্রী অথবা পাত্রীপক্ষের লোকেরা করে থাকে তাদের মধ্যে পাত্র খোঁজার ক্ষেত্রে কঠোরতার কারণে কিংবা আরও ভালো পাত্রের আশায়; কিন্তু পরিশেষে মেয়ে আইবুড়ো থেকে যায়!
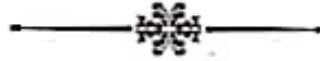
চতুর্থ অধ্যায়

তুমি এবং তোমার শিক্ষা

পড়ালেখার লক্ষ্য ঠিক করে নাও

কোন বিষয়ে পড়বে, সেটা নির্ধারণ করো। তোমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করে নাও। ভবিষ্যতে আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি কী হতে চাও, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো। পাস-ফেলের মধ্যে তোমার জীবনের দিনগুলো শেষ করে দিয়ো না, পড়ালেখার দিক পরিবর্তন করে ফেলো না। বাবা, ভাই, স্বামী কেউ না কেউ তোমার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে সে কারণে পড়ালেখায় অবহেলা কোরো না।

ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে এবং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পণ করেছে; যাতে নারীর নারীত্ব ঠিক থাকে এবং তাকে বিপদের সম্মুখীন হতে না হয়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, নারীকে পড়ালেখা করতে হবে না!

নারী যদি শিক্ষা গ্রহণ না করে, তবে মাদরাসাগুলোতে মেয়েদের কে পড়াবে?

হাসপাতালে রুগ্‌ণ নারীদের সেবা করবে কে?

মেয়েদের কে মানুষ করবে? কে তাদের সঠিক পথ দেখাবে?

তুমি জানো যে, জীবনে যেমন সুখ আসে, তেমনই দুঃখও আসে। কোনো নারী জানে না যে, সামনের দিনগুলোতে তার অবস্থা কেমন হবে। তাই নারীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। তাকে তার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে এবং জীবনে তা প্রয়োগ করতে হবে। অবসর সময়টা সে উপকারী কাজে ব্যয় করবে।

ইলম অন্বেষণ সম্পর্কে তোমাকেও জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ, ইলম অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর ওপর ফরজ।

তোমাকে অবশ্যই ইলম শিখতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে; যেন তুমি নিজেকে, সমাজকে ও নারী জাতিকে উপকৃত করতে পারো। যাতে তোমার এ জ্ঞান সময়ের পরিবর্তনে তোমার জন্য উত্তম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং আল্লাহ না করুন কঠোর পরিস্থিতি সামনে এলে যেন তা কাজে লাগাতে পারো।

কোনো মেয়ে যদি পড়ালেখায় অবহেলা করে আর যদি সে দুআ করতে থাকে 'আল্লাহ, আমাকে পাস করিয়ে দিন', এমন কিছু কি যথার্থ হবে? তুমি তাকে দেখছ, দিনভর পরপুরুষের সাথে মোবাইলে কথা বলছে বা টেলিভিশনে গান-সিরিয়াল দেখে চলছে।

এসব পড়ালেখা তো আল্লাহর ইবাদতের একটি প্রকার, যার ওপর স্বয়ং আল্লাহ উৎসাহিত করেছেন। তাই এসো, পরীক্ষা যখন কাছে আসে, তখন আমরা কঠোর পরিশ্রম করি। ভুলে যেও না, তোমার পরীক্ষার রেজাল্ট অন্যদের মুখে হাসি ও আনন্দ এনে দেবে। আশা করি তোমার চারপাশের সবাই তোমার কারণে আনন্দিত হতে পারবে।

সাধারণ পাঠের পরিধিকে প্রশস্ত করো

তুমি যে বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করছ, সেটা একটা বিশেষায়িত ক্ষেত্র। কিন্তু এটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু যা এ বিষয়ের অধীনে আসেনি। তাই অন্য ক্ষেত্রগুলোর কিছু জিনিস জেনে নেওয়া ভালো।

এ জন্য উপকারী বইগুলো পড়া যেতে পারে। বিভিন্ন লাইব্রেরিতে এ রকম বই পাওয়া যায়, যেটা তোমার জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর কিছু ম্যাগাজিন-সাময়িকীও প্রকাশিত হয়। সেগুলোও পড়া যেতে পারে। তবে নোংরা ম্যাগাজিন থেকে দূরে থাকবে, যেগুলোতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে, গান ও পোশাক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তোমার উপকারে আসে, তোমার পরিবারের ভবিষ্যতে কাজে আসবে এমন প্রোগ্রামগুলো দেখা যেতে পারে।

বিষয়ভিত্তিক অডিও শুনতে পারো। এগুলো তোমার বান্ধবীদের কাছেও পাঠাতে পারো। যা শুনো, তা লিখে রাখতে চেষ্টা করবে, তাহলে এগুলো তোমার মস্তিষ্কে গেঁথে যাবে আর তোমার বান্ধবীদের কাছে এসব তথ্য বলতে সহজও হবে। যা শুনবে এবং লিখবে, সেসব তোমার বান্ধবীদের কাছে বলবে। এভাবে তোমার আত্মবিশ্বাস বাড়বে যে, তুমি এ রকম ছোট বয়সেও কাউকে কিছু দিতে সক্ষম।

কোনো অডিও বা কোনো বই কিংবা কোনো ম্যাগাজিন থেকে ছোট থেকে ছোট তথ্য পেলেও সেটাকে তুচ্ছ করে দেখার জো নেই।

কিছু প্রসিদ্ধ হাদিস মুখস্থ করে নাও। যেমন : চল্লিশ হাদিস। যতটুকু পারো কুরআন মুখস্থ করতে চেষ্টা করো। কোথাও কথা বলার সময় আয়াতে কারিমা বা হাদিস শরিফ দিয়ে দলিল দিতে চেষ্টা করো, এভাবে করলে তোমার বাগ্মিতা উন্নত হবে। এরপর অন্য বোনদের সাথে কথা বলার সময়েও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারো।

রুটিন করে নাও

তুমি কীভাবে তোমার সময়কে পড়ালেখা ও বাড়ির কাজের মধ্যে বণ্টন করবে, তার একটা রুটিন করে নাও।

যখন তুমি ক্লান্ত, তোমার চারপাশে বাড়িভর্তি শিশুরা চেঁচামেচি করছে, তখন কীভাবে তুমি পড়ালেখা করবে? এমন পরিস্থিতি তো পড়ালেখার সঠিক সময় নয়। এ সময়টায় বাড়ির বিভিন্ন কাজ করা যেতে পারে।

এরপর যখন শিশুরা ঘুমিয়ে পড়বে বা খেলাধুলা করার জন্য বাড়ির বাইরে যাবে, তখন হচ্ছে পড়ালেখার উপযুক্ত সময়।

পঞ্চম অধ্যায়

তুমি এবং পর্দা

কেন আমি তোমার পবিত্র মাথায় হিজাব দেখছি না?!

কেন আমি একটা মুক্তোকে অরক্ষিত দেখছি?!

মনে রাখবে, পর্দা কখনো পশ্চাৎপদতা, পিছিয়ে পড়া নয়; বরং পর্দা হচ্ছে নিষ্কলুষতা ও চিরকালের সৌভাগ্য।

পর্দা যে করে আর যে করে না উভয়ের মধ্যে কি তুমি পার্থক্য দেখছ না? আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে বলো কোনটা উত্তম?

যে তরুণী ইমান দিয়ে অন্তরকে সজ্জিত করেছে এবং সম্মানের হিজাব পরেছে, সে উত্তম নাকি শালীন পোশাকহীন, ইমানের পোশাকহীন, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পোশাক পরিধানকারিণী উত্তম?!

উসতাজ আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ বলেন, 'ইসলামি পর্দা মানে বন্দিত্ব নয়; বরং এটি ভ্রষ্টতা প্রতিরোধ করে। তাই ইসলামে বন্দী করার জন্য পর্দার বিধান নয়। পর্দা নারীর স্বাধীনতাকেও বাধা দেয় না; বরং ইসলামই নারীর কল্যাণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। পর্দা নারীকে ভ্রষ্টতা, অশালীনতা থেকে রক্ষা করে, নারীর সম্মান রক্ষা করে, নারীর নিষ্কলুষতা ও লজ্জার আদব ঠিক রাখে।'

যারা পর্দা করো না তাদের বলছি

- তুমি কি চাও যে, যতবার তুমি গাইরে মাহরামের সামনে যাও, ততবার তোমার প্রতিটি চুলের পরিবর্তে তোমার একটি করে গুনাহ হোক?

- মনে রাখবে, যখনই তুমি বাড়ি থেকে বের হবে, তখন মাহরাম ছাড়া যতবার তোমাকে গাইরে মাহরাম পুরুষ দেখবে, ততবার তোমার গুনাহ হতে থাকবে।... তোমার স্বল্প নেকের বিপরীতে এত বিশাল পরিমাণ গুনাহ হোক তা কি তুমি চাইবে?

- যতবারই তুমি গাইরে মাহরামের সামনে হিজাব ছাড়া যাচ্ছ, ততবারই তুমি আল্লাহর আদেশ অমান্য করছ, এভাবে আল্লাহর আদেশকে অনবরত 'না' বলতে চাও কি তুমি? আমি মনে করি, এমন কিছু চাও না তুমি।... কিন্তু তোমার পর্দাহীনতা তা-ই বলতে থাকে।

- তুমি কি হুরের চাইতে সুন্দর ও উত্তম মর্যাদার অধিকারিণী হতে চাও না? মুমিন নারীরা হুরের চাইতে বেশি মর্যাদাপ্রাপ্ত। কারণ হুরদেরকে অনুগত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে, আদেশ বাস্তবায়নে ধৈর্য ধরার জন্য, গুনাহ থেকে বিরত থেকে ধৈর্যধারণ করার জন্য। তাই তোমার মর্যাদা বেশি হবে।

- যখন মালাকুল মাওত আসবে, তখন কি তিনি তোমাকে তোমার হিজাব পরার সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন? তখন কি জান কবজের আগে তুমি তাওবা করে ফেলতে পারবে?

- মনে রাখবে, জান্নাত হচ্ছে দুনিয়াবিমুখ হওয়ার পুরস্কার। জান্নাত কষ্টকর বিষয় দ্বারা বেষ্টিত, জান্নাতে যেতে হলে এসব কষ্টকর অধ্যায় পাড়ি দিতে হবে। পক্ষান্তরে জাহান্নাম কামনা-বিলাস দ্বারা ঘেরা, কামনা চরিতার্থ করতে করতে একসময় জাহান্নামে যেতে হয়।

তাই মনে কোরো না, আল্লাহর দিকে চলার পথ সহজ ও ফুলবিছানো। বরং প্রকৃত বীরত্ব হচ্ছে, তুমি সকল বাধা পেরিয়ে এমন অবস্থায় রবের কাছে পৌঁছাবে, যার বর্ণায়ন হবে : (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ) 'আমি আপনার

কাছে জলদি এলাম, হে আমার প্রতিপালক! যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।'[৪০] তখন যেন তুমি সেসব নেককারের একজন হও, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

'পুণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নিয়ামাতের মাঝে। সুসজ্জিত আসনে বসে তারা অবলোকন করবে।'[৪১]

পর্দা নিয়ে যত সংশয়

সংশয় এক. একজন তরুণীর শরীরে ঝুলিয়ে দেওয়া এক টুকরো কাপড়ে নয়; বরং তার প্রকৃত নিষ্কলুষতা নিহিত থাকে তার অন্তরে ও সত্তায়।... কত হিজাব-পরিহিতা যুবতি পুরুষদের সামনে পর্দা করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অনেক গুনাহে লিপ্ত থাকে। কত যুবতি পর্দা করে ঠিকই; কিন্তু বিভিন্ন ফিতনার সৃষ্টি করে তারা, তাদের কাছ থেকেই এসব ফিতনার শুরুটা হয়। এসব ক্ষেত্রে কী বলবেন?

জবাব : এ কথাটা সত্য যে, এ রকম অনেক যুবতি-তরুণী থাকতে পারে। কিন্তু পোশাক কাউকে তার হারানো নিষ্কলুষতা ফিরিয়ে দিতে পারে না, তাকে হিদায়াতের ওপর ওঠানোর দায়িত্ব নেয় না।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কে এমন দাবি করেছে যে, আল্লাহ তাআলা পর্দা ফরজ করেছেন নারীর সত্তার মাঝে পবিত্রতা সৃষ্টি করার জন্য?

কে এমন দাবি করেছে যে, হিজাব পরা মানে এ কথা ঘোষণা করা যে, যারা হিজাব পরে না, তারা সবাই পাপের সাগরে ডুবন্ত নিকৃষ্ট পাপী?!

আল্লাহ তাআলা নারীদের ওপর হিজাব ফরজ করা কেবল নারীদের নিষ্কলুষ রাখার জন্যই নয়; বরং হিজাব ফরজ করার এটিও একটি কারণ যে, পুরুষদের

---

৪০. সুরা তহা, ২০ : ৮৪।

৪১. সুরা আল-মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২২-২৩।

নিষ্কলুষ রাখা। কারণ, নারীদের ওপর চোখ পড়ার কারণে পুরুষদের মাঝে কুপ্রভাব পড়ে।

সংশয় দুই. হিজাবের মাধ্যমে পরিচয় গোপন করা সহজ হয়। অনেক নারী হিজাবের মাধ্যমে পরিচয় গোপন করে নানান ধরনের খারাপ কাজ করে।

জবাব : বর্তমানে হিজাব-পরিহিতা নারী মিডিয়ার হামলার মুখে পড়ে, বিভিন্ন সংস্থা ও জায়গাতে হেয় করা হয় তাদের। আবার প্রত্যেক জায়গায় কিছু নিকৃষ্ট মুনাফিক পাওয়া যায়, যারা হিজাব-পরিহিতাদের নিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত থাকে। কিন্তু তবুও সে নারী সবকিছু সহ্য করে যায় এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। এ রকমটা কেবল কুরআনের বিধান পালনকারী সত্যিকারের মুমিন নারীই করতে পারে। এখন যদি কোনো ফাসিকা নারী নিষ্কলুষতার প্রতীক ব্যবহার করে তার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, তবে এতে হিজাবের কী দোষ?

যদি কোনো ব্যক্তি বড় একজন সামরিক অফিসারের ছদ্মবেশ ধরে, তার ইউনিফর্ম পরে নিজের কোনো স্বার্থ সিদ্ধি করে, তবে কি আমরা বলব যে, সামরিক অফিসারদের এ ইউনিফর্ম বাতিল করতে হবে, কারণ কেউ একজন তার খারাপ ব্যবহার করেছে?

সংশয় তিন. মানুষের যৌনশক্তি খুবই শক্তিশালী হয়ে থাকে। হিজাব মেয়েদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখে। এ কারণে যুবকরা তাদের যৌনশক্তি দমন করতে করতে একসময় বিরাট বিস্ফোরণ হয় আর ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে। তাই এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে নারীকে পর্দা থেকে স্বাধীন করতে হবে; যেন যুবকরা একটু নিশ্বাস ফেলতে পারে!

জবাব : যদি এ যুক্তি সঠিক হতো, তাহলে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারীদের ওপর অত্যাচারসহ অনেক ধরনের নৈতিক অবক্ষয় থাকত না, যা এখন তাদের মাঝে সব জায়গাতেই বিরাজ করছে। এ দিক থেকে তাদের সমাজ খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। তাই এ যুক্তি মোটেই সঠিক নয়।

নারীদেরকে পর্দাবিমুখ করে অশ্লীলতাকে অবাধ করার ফলাফল কী হয়েছে? ধর্ষণ-ব্যভিচার কি কমে গেছে? নারীরা কি বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে?

সর্বশেষ পরিসংখ্যান বলছে, আমেরিকায় প্রতি ৯০ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণ হচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি বছর ২৫ হাজারেরও বেশি নারী ধর্ষিত হচ্ছে।

এদিকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি রিপোর্টে বলেছে :

'সারা বিশ্বে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন নারী তার জীবনে একবার হলেও ধর্ষিত বা ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়।'

সংশয় চার. পর্দাব্যবস্থা সমাজের অর্ধেককে অকর্মণ্য করে রাখে; ফলে একটি দেশের অর্ধেক নাগরিক কোনো কাজ না করে বসে থাকে।

জবাব : প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, পর্দা কখনো একজন নারীকে তার আবশ্যিক কর্ম করতে বাধা দেয় না। জ্ঞানার্জনে বাধা দেয় না।

অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিকভাবে পর্দাকারিণী তরুণীদের শিক্ষা অর্জন করতে দেখা যায়। তারা সঠিকভাবে পর্দা করে, ছেলেদের সাথে মিশে না। এরা পরীক্ষাগুলোতে খুব ভালো রেজাল্টের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। তারা শিক্ষকদের কাছে, অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেশ সম্মানীয় হয়ে থাকে।

সংশয় পাঁচ. পর্দার শত্রুরা দাবি করছে যে, যেসব নারী পর্দা করে না, তাদের প্রতি পুরুষরা তেমন ভ্রুক্ষেপ করে না, তাদের প্রতি পুরুষদের চোখ পড়ে না। পক্ষান্তরে পুরুষরা পর্দানশিন নারীদের দিকে নজর দেয়, তাদের সম্পর্কে জানতে চায়, তাদের পেছনে লাগে। এ থেকে বোঝা গেল পর্দাই মূলত সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ।

জবাব : যদি পর্দাহীনতা সমাজের জন্য স্বাভাবিক হয়, যদি পর্দাহীন নারীদের দিকে পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়, তাহলে কেন তারা ধর্ষিত হচ্ছে? কেন মানুষ টাকা দিয়ে নর্তকীদের দেখতে যায়, কেন ফ্যাশন-স্টাইলের পেছনে এত টাকা খরচ হয়?

প্রকৃতপক্ষে, অনেক পাপ, অবৈধ কাজ, যৌন অপরাধ হয় এবং জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নারীদের পর্দাহীন হয়ে যাওয়ার কারণে ও উলঙ্গপনা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। এটা তো নিশ্চিত যে, সেসব রাষ্ট্রেই যৌনরোগ অধিক বেড়ে গেছে, যেসব রাষ্ট্রে নারীদের পর্দাহীনতা ও উলঙ্গপনা বেড়ে গেছে।

অন্যদিকে পুরুষদের দৃষ্টি পর্দানশিন নারীদের ওপর পড়ে এবং পর্দাহীন নারীদের ওপর পড়ে না, কারণ পর্দানশিন নারী হলো বন্ধ বইয়ের মতো, যার সূচিও পড়া যায় না, বিস্তারিত কী লেখা আছে, তার কিছু জানাও যায় না। আমরা যতই বন্ধ বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি না কেন, তার ভেতরে কী আছে, তা আমরা জানতে পারব না।

অন্যদিকে পর্দাহীন নারী হচ্ছে খোলা বইয়ের মতো, যে বইয়ে বহুজনের হাত লেগেছে, বহু চোখ তার লাইনের পর লাইন দেখে যাচ্ছে, এভাবে একসময় তার মাঝে কোনো রকম আকর্ষণ বাকি থাকে না আর, আবার কখনো সে বইয়ের কিছু পৃষ্ঠা ছিঁড়ে যায়, এমনকি একসময় বইটা পুরোনো হয়ে যায়, যেটা কোনো বাড়ির ছোট লাইব্রেরির সামনের দিকটায় রাখার উপযুক্ত মনে হয় না; তাই সে বইটা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যায়। আর বইটা যদি হয় কোনো বড় লাইব্রেরির, তাহলে সে বইটা কতটা আড়ালে চলে যায়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পর্দা নিয়ে কিছু কথা

▸ পর্দা চলাফেরায় বাধা দেয়

উম্মুল মুমিনিনসহ নারী সাহাবিদের কথা চিন্তা করে দেখো। তাঁরা পুরোপুরি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন, রাসুল ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত হতেন, আহতদের চিকিৎসা করতেন, দৈনন্দিন বিবিধ কাজ করতেন তাঁরা, তাঁরাও তো পর্দা করতেন, হিজাব পরতেন, পর্দা তো তাঁদের চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, এ রকম কোনো সমস্যাই তাঁদের হয়নি। তাই বলতে হয়, সমস্যা পর্দার কারণে নয়, সমস্যা অন্য কোথাও।

বর্তমান যুগে অনেক ডাক্তার, শিক্ষিকা, ছাত্রী বোনদের দেখবে, তারা পর্দার মধ্যে থেকেও নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করে যাচ্ছে, দৈনন্দিন সকল কাজ উল্লেখযোগ্য অসুবিধে ছাড়াই করে যাচ্ছে তারা।

▸ পর্দা করলে আমার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে

মনে কোরো না যে, ইসলাম চাইছে তুমি এলোমেলো অগোছালো থাকো। রাসুল ﷺ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন, পরিপাটি থাকতেন। এবং পরিষ্কার-পরিপাটি থাকার শিক্ষা দিয়েছেন সবাইকে। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শালীন পোশাক পরার দিকে আহ্বান করে।

আজকালকার ফ্যাশন্যাবল কাপড়চোপড় তো নোংরা ও কদর্যতার প্রতীক। ফ্রান্সের বিখ্যাত ফ্যাশন-মডেল ফাবিয়ানের কথা এখানে না বললেই নয়। ইসলামে আসার পর তিনি বলেন, 'আমার ওপর যদি আল্লাহর দয়া ও করুণা না থাকত, তাহলে আমার জীবন এমন একটি নোংরা জগতে আবদ্ধ থেকে যেত, যেখানে মানুষ স্রেফ জন্তুতে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ও কামনাবাসনা নির্বাপণ করা। সেখানে না আছে কোনো মূল্যবোধ, আর না আছে কোনো আদর্শ।'

ফাবিয়ান এ কথাগুলো অন্য মডেলদের প্রতি হিংসা থেকে বলেননি; বরং তিনি এমন পোশাকও পরিধান করেছেন, যেটা পরিধান করার জন্য সে জগতের অনেক যুবতি স্বপ্ন দেখে; এমন ফ্যাশন্যাবল পোশাক পরেছেন, যেটা পরার জন্য সে জগতের অনেক নারীই সক্ষম নয়। কিন্তু তিনি দেখলেন এসব তো ধোঁকা, মরীচিকা। সবশেষে মানুষকে তো প্রভুর সামনে হিসাব দিতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে।

▸ আমার এখনো পর্দা করার বয়স হয়নি

হয়তো তুমি মনে করছ, বয়সে বড় তরুণীরা পর্দা করবে! আমি মনে করি না যে, তুমি সেসব পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাস রাখো, যে বিশ্বাস তরুণীদেরকে তাদের মন-মর্জি মোতাবেক পোশাক পরতে দেয় এ দলিলের ভিত্তিতে যে, যুবতিরা তাদের যৌবনকাল উপভোগ করুক! আর পর্দা করবে বয়সে বড় নারীরা!

এমন যদি হয় ব্যাপারটা, তবে মৃত্যুর তালিকা দেখতে পারো তুমি। দেখবে অনেক যুবক-যুবতি হঠাৎ করেই মরে গেছে। তারা মনে করত মালাকুল মাওত তাদের পর্যন্ত আসতে এখনো অনেক দেরি! কিন্তু দেখো এখন তারা কবরে।

দিন যতই যাচ্ছে, আখিরাত তোমার দিকে এগিয়ে আসছে। তুমি দুনিয়াকে বিদায় জানানোর তত বেশি নিকটবর্তী হচ্ছ। তাই মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুত করে নাও। তাওবার রেলগাড়ি তোমার স্টেশন ছাড়ার আগেই সেটায় চড়ে বসো। বিচার দিবসের কথা মনে রাখো।...

▶ আমাদের অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম

ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক পোশাকেই প্রচণ্ড গরম লাগে, তাহলে কীভাবে বোরকা-হিজাব পরে পর্দা করব!

যদি তোমার দেশে এমন হয়, তবে এবার মক্কা ও আরবের আবহাওয়া সম্পর্কে তোমাকে বলছি। বলছি সে সময়ের কথা, যখন এ অঞ্চলের মানুষের কাছে গরম শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রাদি ছিল না।

তখন কি নারীরা এ ওজর তুলে পর্দা করার বিপক্ষে ছিল?

তারা যেসব তাঁবুতে ছিল, সেসব তাঁবু কি তাদেরকে গরম থেকে বাঁচাত, এখন যেমন আরামে এসির নিচে থাকে নারীরা?

না, কিন্তু তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও ইমানের বলে আল্লাহর আদেশের কাছে নিজেদের সোপর্দ করেছিলেন।...

যে বোন নিজের দেশের গরমের ওজর দিচ্ছ, তোমাকে বলি, জাহান্নামের আগুনের চেয়েও কি তোমার দেশের আবহাওয়া উষ্ণ?

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

'বলুন, "জাহান্নামের আগুনই উত্তাপে প্রচণ্ডতম।" তারা যদি বুঝত!'[৪২]

---

৪২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৮১।

- যখন কোনো উপযুক্ত যুবক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন আমি পর্দা করব

তোমার দৃষ্টিতে এ যুবক কীভাবে উপযুক্ত হতে পারে?

এ যুবক কি চায় যে, সব মানুষ তার স্ত্রীকে দেখুক?

তুমি পর্দাহীন থাকার সময় যে যুবক তোমার বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে, সে এ অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট হয়েই তো প্রস্তাব দেবে। এরপর বিয়ে করার পর কেন সে তোমাকে পর্দা করতে দেবে? সে তো বরং পর্দা না করার জন্য তোমার সাথে জবরদস্তি করবে।

তুমি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর তার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিচ্ছ?

তুমি কি আল্লাহর অবাধ্যতাকারী তোমার এ স্বামীর জন্য নিজের জান্নাতকে বিকিয়ে দিচ্ছ?!

পক্ষান্তরে যদি তোমার পর্দা করার সময় কোনো যুবক তোমাকে বেছে নেয়, তার অর্থ হচ্ছে, সে পর্দাকে পছন্দ করে।

মনে রাখবে, যদি তুমি তোমার দাম্পত্য জীবন আল্লাহর অবাধ্যতার ওপর ভিত্তি করে শুরু করো, তাহলে এ বিয়ে কি টিকবে? যদি বিয়ে টিকে থাকেও, তুমি কি চাইবে যে, আল্লাহ তোমার ওপর ক্রোধান্বিত হোক?!

বিয়ে আল্লাহর দান। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে এটি দান করেন। কত পর্দানশিন নারীর বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কত পর্দাহীন যুবতির বিয়ে না হয়ে আইবুড়ো হয়ে আছে!

▸ আমার স্বামী চাইছে আমি যেন পর্দা না করি

তোমার স্বামী কি তোমার জান্নাতের জিম্মাদার হবে? সে কি তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেবে?

অন্যদিকে রাসুল ﷺ-এর বাণী শোনো :

السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

'পাপ কাজ ব্যতীত নিজের পছন্দ-অপছন্দ যেকোনো কাজে মুসলিম ব্যক্তির ওপর (আমিরের কথা) শ্রবণ ও (তার) আনুগত্য করা আবশ্যক। অতএব পাপ কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।'[৪৩]

যদি তোমার স্বামী বা বিয়ের প্রস্তাবদাতা পর্দা করার বিরোধী হয়, তাহলে তাকে সুন্দর করে বুঝাও, পর্দার গুরুত্ব বোঝাতে পারবে এ রকম কাউকে দিয়ে বুঝাও।

কিন্তু যদি সে তার মতের ওপর অটল থাকে, তাহলে তোমার দুনিয়ার ভবিষ্যৎ ও আখিরাতে গমনের এ জীবনতরিকে তার সাথে বাঁধবে না। যদি কেউ আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাহলে তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। আর আল্লাহ এমন পাত্রের চেয়ে উত্তম পাত্রের ব্যবস্থা করতে সক্ষম।

▸ পর্দা করলে আমার চাকরি চলে যাবে

হ্যাঁ, এ রকম ঘটে থাকে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি চলে যাওয়ার চাইতে তোমার চাকরি চলে যাওয়া উত্তম ও সহজ। ভুলে যাবে না যে, চাকরি চলে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, তোমার রিজিক চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা অচিরেই তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করে দেবেন।

---

৪৩. মুসনাদু আহমাদ : ৪৬৬৮।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি আকাঙ্ক্ষা করে তা মানুষের অসন্তুষ্টি হলেও, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি আশা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।'[৪৪]

▶ **আমার আশঙ্কা হয় আমি পর্দার ওপর অটল থাকতে পারব না**

এমন ভ্রান্ত চিন্তার কাছে নিজেকে সঁপে দেবে না। যদি নিজের স্বভাব নিয়ে তুমি দ্বিধায় থাকো অথবা যদি দেখো দুনিয়া ক্রমেই তোমার মনের ভেতর অনিষ্টতা ঢুকিয়ে দিয়ে তোমাকে পর্দা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তুমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যের গুরুত্ব মনে করিয়ে দাও, সময় থাকতে আমল গুছিয়ে নেওয়ার তাগাদা দাও নিজেকে।

যখন তুমি পর্দা করতে শুরু করলে, তখন থেকে নেককার বান্ধবীদের সঙ্গ গ্রহণ করতে থাকো, তাদের সুহবতে থাকো, দ্বীনি ইলম শেখার কোনো ক্লাসে যোগ দাও, কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হও, আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করতে থাকো, তিনি যেন তোমাকে দ্বীনের পথে অটল রাখেন, আনুগত্যের ওপর ধৈর্য ধরার তাওফিক দেন।

মনে রাখবে, পর্দা শুরু করা হচ্ছে তাওবার মতো। আর আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।

সব সময় এ দুআ করতে থাকবে যে,

اللهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

---

৪৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৪।

'হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।'[৪৫]

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পর্দা করার প্রতি হিদায়াত দিয়েছেন, আপনিই এর ওপর আমাকে অটল রাখুন।

▸ **আমি অনেক ইবাদত করি, আমার অন্তর ইমানের দ্বারা প্রশান্ত, তাহলে কেন আমাকে পোশাক-পর্দা করতে হবে?!**

যদি তুমি সত্যিকারের মুসলিমা হয়ে থাকো, তবে তোমার করণীয় হচ্ছে, তুমি আল্লাহর প্রতিটি আদেশ, রাসুল ﷺ-এর প্রতিটি আদেশ গ্রহণ করবে এবং মানবে, প্রতিটি নিষেধকৃত কাজ বর্জন করবে। তুমি তাদের মতো হবে না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস করো এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফিল নন।'[৪৬]

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

'তোমরা যখন তার স্ত্রীগণের নিকট কোনো কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল হতে তাদের কাছে চাও। এটাই তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর।'[৪৭]

---

৪৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৮৩, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯২৬।

৪৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৮৫।

৪৭. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৫৩।

পর্দা পালন করা আয়িশা, ফাতিমা, খাদিজা -এর মতো সর্বোত্তম নারীদের অন্তরের জন্য পবিত্রতর। তুমি যে বলছ, তোমার সব ইবাদত ঠিক আছে, তোমার অন্তর ইমানে পরিপূর্ণ, তাই তোমাকে পর্দা করতে হবে না, তোমার অন্তর কি তাঁদের চেয়েও বেশি পবিত্র হয়ে গেছে?!

▶ **আমার পর্দা করতে মন চায় না, এটা কি সুন্নাত না ফরজ?**

হিজাবের প্রতি তোমার অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ তোমার মধ্যে ইমান ভঙ্গের একটি কারণ পাওয়া গেছে, এমন মনোভাব তোমাকে ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারে, নাউজুবিল্লাহ। কারণ, ইসলামে এসে তুমি আল্লাহর সকল আদেশের প্রতি নিজেকে সোপর্দ করার ঘোষণা দিয়েছ। এখন আল্লাহর আদেশ হিজাবের প্রতি বিরাগ মনোভাব তোমাকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মাথার তাজ নবি ইবরাহিম -কে তাঁর ছেলের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। জীবনের অনেক বছর সন্তানহীন কেটেছে তাঁর জীবন। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে একটি ছেলের জন্ম হলো তাঁর। আল্লাহ আদেশ দিলেন প্রিয় সেই সন্তান ইসমাইল -কে জবাই করে দিতে। এ আদেশের পর ইবরাহিম কি ইতস্তত করেছেন? অথবা কেউ তাঁকে আল্লাহর আদেশের প্রতি তুষ্ট করবে এমন কাউকে খুঁজেছেন কি?

বালক ইসমাইল কি ইতস্তত করেছেন? পালানোর চেষ্টা করেছেন?

সবরের প্রতীক হাজার কি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন?

তাঁরা কি এ আদেশের কারণ জানতেন?

ইবরাহিম -কে একটা কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তিনি আল্লাহর আদেশের প্রতি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্য করেছেন। এরপরও কি তুমি হিজাবের আদেশ মেনে নেবে না?!

তোমার জন্য শ্রেয় হচ্ছে, তুমি স্বীকার করে নেবে যে, হিজাব পরার ক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা দুর্বল বা তুমি এ আদেশ পালনের সক্ষমতা রাখো না, এ জন্য তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। এটা তোমার আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে

'আমি সন্তুষ্ট নই' বলার চাইতে অধিক সহজ ও বিপদমুক্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আদেশগুলোর প্রতি এমন তুষ্ট থাকার জন্য আমরা আদিষ্ট, যেমন তুষ্ট হলে কোনো আদেশ পালনই কঠিন ও শক্ত মনে হয় না; বরং আমরা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না।'[৪৮]

যারা বলে (سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا) 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম', তুমি তাদের মতো হোয়ো না। এমন কিছু থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। নাউজুবিল্লাহ।

অন্যদিকে পর্দা করা ফরজ নাকি সুন্নাত, এ বিষয়ে জানতে কুরআনে বর্ণিত পর্দার আয়াতগুলো পড়ে নাও :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

> 'তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে।'[৪৯]

▸ আল্লাহ আমাকে সে হিদায়াত দেননি

হিদায়াত তোমার কাছে এখনো আসেনি, সামনে আসবে, এমন আশায় বসে থেকো না। বরং আল্লাহ চান, তুমি তোমার সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামনে এগিয়ে আসো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

৪৮. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩৬।
৪৯. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[৫০]

শোনো, নশ্বর এ দুনিয়ার সামান্য সময়ের ভোগ-উপভোগের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতের সৌভাগ্যকে যেতে দিয়ো না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। অমুক শহরে যাওয়ার জন্য দীর্ঘ সফর কতটা সময় নেবে, তা নিশ্চিত না হয়ে কি আমরা ভ্রমণ শুরু করি না?

অসুস্থতা থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ, তবুও সুস্থ হওয়ার জন্য তো আমরা আসবাব গ্রহণ করি, ওষুধ সেবন করি, ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলি।

তেমনই হিজাব পরা শুরু করো, আসবাব গ্রহণ করো, বাকি আল্লাহ তাওফিক দিয়ে দেবেন।

- **আমার কাছে হিজাব ভালো লাগে না, কেননা কিছু হিজাব-পরিহিতা নারীর আচরণ খারাপ**

দুঃখের কথা হচ্ছে, এটা অবাস্তব নয়, একটা বাস্তব কথা। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কিছু নারী এমন আছে।

কিছু মানুষ আছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে আবার অশ্লীল কাজও করে!

কিছু মানুষ আছে হজ করে এ নিয়তে যে, হাজি নামের আড়ালে তারা অন্য কিছু করে বেড়াবে!

এসব বদ চরিত্রের লোকদের জন্য কি আমরা নামাজ পড়া, হজ করা ছেড়ে দেবো?!

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

৫০. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।

'কেউ অপরের (অপরাধের) বোঝা বহন করবে না।'[৫১]

আমাদের প্রত্যেককেই নিজের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, অন্যের কর্মের জন্য নয়।

এবার যদি তুমি পর্দা করে থাকো

- আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন। তুমি ইসলামের প্রতীক হয়েছ। এখন সুন্দর করে ইসলাম পালন করতে থাকো।

- তোমার পর্দা করার অর্থ এ নয় যে, তোমার দ্বারা গুনাহ হবে না; বরং মানুষ মাত্রই গুনাহ হয়ে যায়। কিন্তু সাবধান প্রকাশ্যে গুনাহ হওয়া আর গোপনে হওয়া এক নয়। তবে গুনাহ থেকে সব সময় বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

- পর্দা কারও ওপর তোমার করুণা নয়; বরং তোমার ওপর আল্লাহর করুণাস্বরূপ। তাই যে সময়ে অন্যরা পরীক্ষায় নিপতিত আছে, সে সময়ে তোমার ওপর আল্লাহর এ করুণার জন্য তাঁর প্রশংসা করো, শোকর আদায় করো, তাঁর কাছে দুআ করো; তিনি যেন সকল মুসলিম বোনকে এ নিয়ামত দান করেন।

- হিজাব হচ্ছে দ্বীনের বিধান। হিজাবকে দুনিয়ার জাঁকজমক হয় এমনভাবে পরবে না।

- যখন পর্দা করবে, হিজাব পরবে, তখন মনে মনে এ ইবাদতের জন্য আল্লাহর কাছে সাওয়াবের প্রত্যাশা করো। আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য লাভ করল।'[৫২]

---

৫১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ১৮।
৫২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭১।

- পর্দা করার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর নিকটবর্তী হচ্ছ :

وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

'যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই।'[৫৩]

- আল্লাহ তাআলা পর্দা করা পছন্দ করেন, তাই আশা করা যায় তুমি আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে, কারণ তুমি সে কাজ করো যে কাজকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ،

'আমার বান্দা যেসব কিছুর মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়, তন্মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে বান্দা সেসব কাজ করবে, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত করার মাধ্যমে আমার এতটা নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে; সে যদি আমার কাছে কোনো কিছু চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে তা দান করি; আর সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।'[৫৪]

- পর্দা করতে গিয়ে তুমি যে ধৈর্যধারণ করবে, মানুষের নানান কথা শুনবে, আবহাওয়ার ঘর্মাক্ততা সহ্য করবে, এসবের বদলে আল্লাহ তোমাকে অনেক পুরস্কার দেবেন।

---

৫৩. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৫।
৫৪. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

- তুমি আল্লাহর ইচ্ছায় নেককার নারীদের অনুসরণের সাওয়াব পাবে। 'এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, সে লোকের ব্যাপারে কী বলবেন, যে এক গোষ্ঠীকে ভালোবাসে; কিন্তু কখনো তাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়নি?"

রাসুল ﷺ বললেন, (الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) "মানুষ তার সাথে থাকবে, যাকে সে ভালোবাসে।"'[৫৫]

- তুমি অচিরেই তোমার নিষ্কলুষ থাকার পুরস্কার পাবে। নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য তুমি আদিষ্ট। এ ইবাদতের বদলে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

- সমাজকে ফিতনা-ফাসাদ ও অনিষ্ট মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে তোমার অবদানের জন্য তুমি অঢেল পুরস্কার পাবে।

- পর্দা করার মাধ্যমে তুমি মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে সাহায্য করছ, মুসলিম যুবকরা নিজেদের রক্ষা করার দিক থেকে সহায়তা পাচ্ছে তোমার কাছে।

পর্দানশিন নারী ও বিধর্মীরা

শাইখ আলি তানতাবি ﷺ-কে বিধর্মীদের সাথে পর্দানশিন নারীর সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বললেন :

১. আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ প্রশ্নের পূর্ণ জবাব আমার কাছে নেই।

২. আমরা এমন একসময়ে বসবাস করছি, যে সময়টার অনুরূপ সময় আরব দেশগুলোর ওপর দিয়ে গিয়েছিল। বরং মুসলিম জাতির অনেকের ওপর দিয়ে গিয়েছিল এমন অবস্থা। আব্বাসি খিলাফাহর শুরুর দিকে আব্বাসীয়রা যখন পারস্যদের সাথে মেলামেশা করছিল, তখন তাদের

৫৫. সহিহুল বুখারি : ৬১৬৯।

অভ্যাস-চালচলনের সাথে তাদের পূর্বপুরুষ আরবদের উত্তরাধিকারে পাওয়া অভ্যাস-চালচলনের সাথে সংঘর্ষ দেখা দেয়।

রোমানরা যখন গ্রিস বিজয় করে, তখন তাদের সাথে বসবাস শুরু করলে তারা গ্রিসের লোকদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে শুরু করে এবং তারাও গ্রিসের চিন্তাধারা ও জ্ঞান-অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এ সময়ে জীবনযাপনের পদ্ধতিতে দুটো ভিন্ন ধরন একই সাথে চলতে দেখা যায়। এমনকি তুমি তখন লক্ষ করবে, 'বাবা ও ছেলের মধ্যে, মা ও মেয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দৃশ্যমান থাকে, তাদের চিন্তাচেতনা ও অভ্যাস-চালচলনে। এমনকি উভয় শ্রেণির বিছানাপত্রে, তাদের কথা বলার ধরনেও স্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পাবে।

এমন অবস্থায় মেয়ে তার আসল সংস্কৃতি শিখবে কীভাবে?

কিছু পদ্ধতি আছে, যা সাময়িক সময়ের জন্য কাজে আসতে পারে; কিন্তু চিরস্থায়ী চিকিৎসা চিন্তাবিদ, কলমবিদ, মিডিয়ার বাগডোর ধারণকারীদের হাতে থাকে। মিডিয়ার একটা অংশ হিসেবে রয়েছে মসজিদের মিম্বারের খতিবগণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, রয়েছে তারাও যারা পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে লেখালেখি করে। এ বিষয়টাতে সকলের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। এ পরিবর্তন কেবল এ সকল লোকের মাধ্যমেই হতে পারে।

৩. একজন মেয়ে হিসেবে তোমারও কিছু কর্তব্য আছে। একজন মেয়ে আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে, পর্দা করবে। রাস্তায় বেরোনোর সময় খিমার-বোরকা পরে বের হওয়া আবার বাড়িতে এসে একই পোশাক পরে থাকার কথা বলছি না। এমন কিছু তো না। পরিবারের মাঝে এভাবে চলাফেরা করা তো কঠিন হয়ে যাবে। বাড়িতে বাড়ির পোশাকই পরবে। বাড়িতেও যদি খিমার-বোরকা আবশ্যক করে দেওয়া হয়, তবে সেটা অসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে।

বাড়িতে একজন মেয়ে স্বাভাবিক প্রচলিত পোশাক পরবে। এ পোশাকে তার বুক ঢাকা থাকবে, তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা থাকবে, তার চুল ঢাকা থাকবে।

গরমের মাঝেও সে এভাবে পরিবারের সামনে থাকবে। এটা করার কারণ হচ্ছে, সে নিজেকে ইসলামের শিষ্টাচারে চালিত দৃঢ় সংকল্পকারিণী হিসেবে দেখাবে। সে বোঝাবে যে, সে একজন মুসলিম, একজন মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘন না করা। পরিবার যখন তার এ দৃঢ় সংকল্পতে অভ্যস্ত হবে, তার ব্যাপারে এ অবস্থা সকলের জানা হবে, তখন আর কেউ তাকে কটাক্ষ করবে না; বরং পর্দা করাকে একটা স্বাভাবিক বিষয় ধরে নেবে। যদিও কখনো গরমের প্রতাপ বেড়েও যায়, তখন তারা জাহান্নামের আগুন আরও বেশি গরম হওয়ার কথা স্মরণ করবে।

৪. যতটুকু পারো যেসব পারিবারিক সমাগমে গাইরে মাহরামে পূর্ণ থাকে, সেসব থেকে দূরে থাকবে। এ জন্য একজন মেয়ে তার বাবা-মার কাছে বোধগম্য আপত্তি পেশ করতে পারে, চাইলে এ বিষয়ে ইসলামের বিধান স্পষ্ট শুনিয়ে দিতে পারে।

৫. এ বিষয়ে সর্বনিম্ন এতটুকু করতে হবে যে, তাকে প্রকাশ্য শরয়ি লঙ্ঘন থেকে দূরে থাকতে হবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে, সে তার বাবা-মাকে সঠিক পদ্ধতিতে বোঝাবে যে, তার এমন চলাফেরার কারণ কী, কেন সে প্রচলিত কুসংস্কৃতিকে এড়িয়ে চলছে। এ জন্য প্রথমত তাকে তাদের স্বভাব সম্পর্কে জানতে হবে, তারা কতটুকু নিতে পারবে সে পরিমাপ জানতে হবে; যেন তারা তার কথার গুরুত্ব অনুভব করতে পারে এবং তার কথার প্রতি অনীহ না হয়ে পড়ে।

৬. একজন তরুণীর এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তার পরিবারের সদস্যদের মনের ভেতর ইমান সুপ্ত হয়ে আছে, বিশেষ করে নারীদের অন্তরে। তাদের অন্তরে ইমান রয়েছে; কিন্তু তা কখনো কখনো কিছু শাহওয়াতের মাধ্যমে ঢাকা থাকে, কিছু শরয়ি বিধান লঙ্ঘনের ওপাশে থাকে, কিছু

ভোগ-উপভোগের আড়ালে থাকে।... কিন্তু ইমান বিদ্যমান থাকে, একটা স্তরের মাধ্যমে ঢাকা থাকে।

আরবি ভাষার আশ্চর্যময় দিক হচ্ছে, কাফির শব্দের অর্থও এটাই। কাফির শব্দের শাব্দিক অর্থ যে ঢেকে রাখে।

ইমান অন্তরে সুপ্ত থাকে, গুপ্ত থাকে। যখন প্রজ্ঞাময় কথা ও উত্তম উপদেশ দেওয়া হয় অথবা একটি শক্তিশালী কম্পন দেওয়া হয়, তখন ইমান ফুটে ওঠে, তখন সে ব্যক্তিকে মুমিন হিসেবে দেখা যায়।

উদাহরণত যখন একটা বিমানে অনেক যাত্রী সফর করছে। হঠাৎ করে আকাশের আবহাওয়া প্রতিকূল হয়ে উঠল। বিমানের পাইলট ঘোষণা দিল বিমান চালানো সম্ভব হচ্ছে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান নিচের দিকে পড়ে যাবে। তাই সবাইকে লাইফ সাপোর্ট নিতে হবে, প্যারাসুট পরে নেমে যেতে হবে।

এ সময়টাতে সকলেই মুমিন হয়ে যায়। কারণ, এমন দুর্যোগমুহূর্ত তার ইমানের ওপরে পড়া আবরণকে তুলে দেয়; ফলে সে মুমিন হয়ে আবির্ভূত হয়।

৭. আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই দেখেছি। একবারের কথা। তখন আমি জর্দানে নারীদের প্রতি একটি লেকচার দেওয়ার সময় এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। যে নারী হিজাব না পরে খালি মাথায়, এমনকি যে নারী মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে ফিরে (তখন মিনি স্কার্ট পরা ফ্যাশন ছিল), এমন নারীর মনেও ইমান আছে, শুধু দরকার সে ইমানকে প্রজ্বলিত করার মতো সঠিক পদ্ধতির জাগরণী আহ্বান।

তার ইমান মনের ভেতর সুপ্ত হয়ে আছে। সেখানে ছোট অঙ্গার হয়ে আছে। যদি আমরা তাকে প্রজ্বলিত করতে চাই, তাহলে কী করতে হবে?... যখন আমরা ছোট অঙ্গারের পাশে বড় কাঠ এনে রাখলাম, তখন সেটা জ্বলবে না। যদি আমরা অনেক জোরে ফুঁ দিই মুহূর্তের জন্য আগুন জ্বলবে ঠিক; কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিভে যাবে। যদি আমরা আস্তে ফুঁ দিই, তাহলে

তাতে কোনো প্রভাব পড়বে না। তাই আমাদেরকে প্রথমে সে অঙ্গারের পাশে ছোট ছোট পাতা রাখতে হবে, খড়কুটো রাখতে হবে, এমন কিছু রাখতে হবে যার ফলে দ্রুত আগুন ধরে উঠবে, এ প্রস্তুতি শেষে আমরা প্রজ্ঞার সাথে ফুঁ দেবো, তখন আগুন জ্বলে উঠবে।

অর্থাৎ আমাদেরকে সঠিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে, আর সঠিক পদ্ধতিতে আহ্বান করতে হবে।

৮. উপরিউক্ত মাধ্যমে পর্দানশিন তরুণী তার পরিবারকেও ইসলামের পথে আনতে পারবে।

৯. যদি তার মা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে সে তার মাকে একা একা বোঝাবে, তার হৃদয়কে প্রস্তুত করে তুলবে। সে কিন্তু তার মায়ের শিক্ষিকা বনতে যাবে না, নিজেকে বড় বানিয়ে মায়ের সাথে কথা বলতে যাবে না। ক্লাসের শিক্ষিকা ও তার ছাত্রীর মতো হবে না তার আচরণ। কারণ, মায়ের মেয়ে জ্ঞানের দিক থেকে যতই বড় হয়ে যাক, মা তার কাছ থেকে জ্ঞান নিতে পারবে না, কারণ মায়ের এখন মনে আছে সে-ই তাকে জন্ম দিয়েছে। মেয়ে যখন ছোট ছিল, তখন মেয়েকে খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো এসব কাজ সে-ই করেছে; তাই মেয়েকে শিক্ষিকার স্থান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাই মায়ের স্বভাবের সাথে মানানসই হয় এমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। মায়ের মমতা ও আবেগকে নাড়া দেয় এমন মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক মায়ের অন্তরেই তার মেয়ের জন্য সফট কর্নার থাকে, যা তাকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যথার্থ মাধ্যম হতে পারে।

১০. যদি তার বাবা সৎ মানুষ হয়; কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা থাকে—যেমনটা আজকের সমাজের অধিকাংশ বাবার অবস্থা—তবে মেয়ে কোমর বেঁধে তার বাবার পেছনে মেহনত করে যাবে, তাকে বোঝাবে, 'বাবা, দ্বীনের পথে আপনি একা নন, আপনার সাথে সমর্থন দেওয়ার জন্য আমিও আছি।'

১১. অন্যদিকে ছোট ভাই-বোনদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, তাদের মন উপহার ও গিফটের মাধ্যমে জয় করতে হবে। যতটুকু পারা যায় ততটুকু পরিমাণে উপহার দিতে হবে, তাদেরকে তাদের মতো করে বোঝাতে হবে দ্বীনের কথা, কোনো লেকচার বা ক্লাসের মতো করে নয়, অথবা এক মুহূর্তে ওষুধের পুরো কোর্স গেলানোর মতো করে নয়। ওষুধের কোর্স হচ্ছে দিনে তিন বারে। যদি কেউ এক সপ্তাহের ওষুধের পুরো কৌটো এক মুহূর্তে খাইয়ে দেয়, তাহলে তো সে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আবার খেয়াল রাখতে হবে, বড়দের ওষুধের পরিমাণ যতটুকু হয়, ছোটদের ওষুধ পরিমাণে আরও কম হয়।

এভাবে যখন সে ছোটদের তার দলে ভিড়াতে সক্ষম হবে, তার ভালোবাসা যখন ছোটদের মনে গেঁথে যাবে, তারা যখন তার কথা মানতে শুরু করবে, কয়েক বছর পর তারাও তার মতো হয়ে উঠবে।

১২. এসবই হচ্ছে সাধারণ কিছু উপদেশ। এগুলো এমন কোনো গঠনপ্রণালি নয়, যেখানেই তা প্রয়োগ করা হবে, সেখানেই সাফল্য আসবে। আমার এ কথাগুলো কোনো প্রস্তুত কাপড় নয়, যা কেনার পরেই পরা যাবে। আমি যদি বলি আমার কথাগুলো সে কাপড়ের মতো, যা সবার জন্য ফিট হবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আসলে কারও জন্য ফিট হচ্ছে, কারও গায়ে ছোট হচ্ছে, কারও গায়ে বড় হচ্ছে।

তাই বলছি, আমার এ কথাগুলো হচ্ছে এমন যে, আমি তোমাকে কাটা কাপড় দিলাম, সেলাই করার পদ্ধতি জানিয়ে দিলাম, এবার তোমাকে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সেলাই করতে হবে তোমার কাঙ্ক্ষিত খরিদদারের মাপ অনুযায়ী।

মোদ্দাকথা :

ক. শরিয়তবিরোধী অকাট্য হারাম কাজ করা যাবে না। এমন কোনো কিছুতে যুক্ত হওয়া যাবে না; চাই পরিস্থিতি যা-ই হোক, চাই ফলাফল যেমনই হোক।

খ. কাউকে বোঝাতে হলে তার অবস্থা দেখতে হবে, তদনুযায়ী প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে বোঝাতে হবে। একজন তরুণীকে তার অবস্থা বোঝাতে হবে প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে—সে আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হবে না, মা-বাবার প্রতি বিরূপ আচরণ করবে না, পরিবারের সাথে শত্রুতা ও ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবে না।

গ. একজন তরুণীকে তার আত্মীয়দের মধ্য থেকে, নিকটবর্তীদের মধ্য থেকে তার মতো কাউকে খুঁজে বের করতে হবে; যাতে তারা একে অপরের সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারে, তার পরিবারকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মা-বাবার সাথে কীভাবে কথা বলবে?

সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে বিভেদ কেন হয়?

যেসব কারণে সন্তান ও মা-বাবার মধ্যে বিভেদ তৈরি হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব কারণ নিম্ন বর্ণিত কোনোটা না কোনোটার মধ্যে পড়ে :

১. পড়ালেখায় অমনোযোগী

মা-বাবা চায়, তুমি যেন পড়ালেখার প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব দাও। এটা তারা সে সময় করে, যখন্ তারা তোমার রেজাল্ট দেখে, অথবা পড়ালেখায় তোমার গড় হ্রাস দেখে। এ কারণে কেন তুমি রাগ বা গোস্বা হবে?!

অন্যদিকে অনেক মেয়ে চায় যে, তার পরিবার যেন তার প্রতি এমন গুরুত্বারোপ করে; কিন্তু পরিবারের কাছে তারা সে সময় পায় না। যদি তুমি তোমার সময় ভাগ করে নাও, পড়ালেখার প্রতি যদি একটু গুরুত্ব দাও, তাহলে তুমি তোমার পড়ালেখার মান ভালো করতে পারবে, তুমি রেজাল্ট ভালো করতে পারবে, মা-বাবাও সন্তুষ্ট থাকবে।

২. বেশি রাত জাগা

মা-বাবা তোমাকে দেখে যে, তুমি অতিরিক্ত রাত জাগছ, ঠিকমতো ঘুমাচ্ছ না, এটা এ ভয়ের জন্য যে, বেশি রাত জাগলে তোমার কোনো অসুখ বা বিপদ আসে কি না, তুমি দুর্বল হয়ে যাও কি না।

তোমার প্রতি মা-বাবার এমন শাসন দেখানো, তাদের চোখে এটা অবশ্যকর্তব্য। তাহলে কেন তুমি মনে করছ, তারা তোমাকে অযথা শাসাচ্ছেন?!

তোমার প্রতি মা-বাবার আগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হও, তাদের সহযোগিতা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাও, যেমন : পড়ার সময় বাড়ির ছোটদের কোলাহল কমানো, টেলিভিশনের আওয়াজ কম করা ইত্যাদি।

৩. বাড়ির কাজে অংশ না নেওয়া

অনেক ছেলে-মেয়ে বাড়ির কাজে হাত দিতে চায় না। যেমন : খাট-বিছানা গুছিয়ে রাখা, বইপত্র গুছিয়ে রাখা, জরুরি কাগজপত্র যথাস্থানে রাখা, কাপড়চোপড় ঠিকমতো আলমারিতে রাখা।

যদিও এ কাজগুলো ছোটখাটো মনে হয়; কিন্তু এগুলো করলে মায়েরা তুষ্ট থাকেন, আনন্দিত হন, কিছুটা স্বস্তি পান।

যখন তোমাকে পরিবারের লোকদের জন্য চা-পানীয় আনতে বলা হয় সেটা করা, অথবা মায়ের ব্যস্ততার সময়ে ছোট ভাই-বোনের দেখাশুনা করতে বললে তা করা, পরিবারের বড়দের মনে স্বস্তি ও শান্তির আভাস এনে দেয়।

এমন কোনো সুযোগ হাতছাড়া হতে দেবে না; বরং তুমি সব সময় তোমাকে বলার আগেই নিজ থেকেই এগিয়ে আসবে। এমন কাজে 'না' তো বলবেই না, কখনো অস্পষ্ট শব্দে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করবে না। যখন তুমি এমন কাজ করবে, তখন তুমি আসলে সে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করলে, পারদর্শী হলে, ভবিষ্যতে তোমার পরিবার সামলানোর মতো গভীর জ্ঞানপ্রাপ্ত হলে। আর সবশেষে এমন কাজে সহযোগিতা করে তুমি তোমার পরিবারের গভীর ভালোবাসা অর্জন করতে পারলে, যে পরিবার তোমার জন্ম থেকে তোমাকে লালনপালন করে আসছে।

যদি তুমি মেহমানের মতো পরিবারের পাশে কখনো থাকো, কখনো থাকো না, কখনো সহযোগিতা করো, কখনো করো না, কখনো এগিয়ে আসো, আবার কখনো নির্লজ্জের মতো দূর থেকে তাকিয়ে থাকো, তাহলে তুমি কীভাবে তাদের আদরের মেয়ে হবে?!

তুমি কি মনে করো যে, মা-বাবাই সন্তানদের ভালোবেসে যাবে, বিনিময়ে সন্তানরা তাদের ভালোবাসা দেবে না?!

তোমার মা-বাবার ভালোবাসা ও মমতার বদলে খারাপ কিছু দিয়ো না, তোমার ভেতরে আমিত্ববোধ আসতে দিয়ো না।...

তুমি বয়সে ছোট হলেও পরিপক্ক হতে চেষ্টা করো, অভিজ্ঞতার কমতি সত্ত্বেও বুদ্ধিমান হওয়ার চেষ্টা করো।

মা-বাবা তোমাকে যেসব কথা বলেন, যা করতে বলেন, যা সহযোগিতা চান, তাদের সেসব আদেশ ও কথাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করো।

৪. বান্ধবীদের সাথে

তোমার মা কখনো তোমার বান্ধবীদের বাসায় যেতে বাধা দিতে পারেন, আবার কখনো তাদেরকে তোমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে বাধা নাও দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তোমার মাকে বান্ধবীদের মায়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো। এভাবে দেখবে, তোমার মা-ই তোমার বান্ধবী ও তাদের মায়েদের দাওয়াত করছেন তোমাদের বাড়িতে।

একজন মায়ের জন্য এটা বুঝে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য যে, তার মেয়ের বান্ধবী যেন দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রা হয়। এটা তোমার কল্যাণের প্রতি তার আগ্রহ, তোমার প্রতি তার ভালোবাসা। এটা তোমার স্বাধীনতাকে হরণ করা বা তোমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া নয়।

মা-বাবার সাথে তোমার একসাথে থাকা তোমার জন্য অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ, এটা জীবনের বহু ক্ষেত্রে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তোমার কাজে আসবে। অচিরেই তোমারও একটি আলাদা পরিবার হবে। তুমি তোমার সে পরিবারে তোমার জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের বিবিধ দিক সঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে হবে। তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে, জীবনের হাল ধরতে হবে।

৫. অধিকমাত্রায় মোবাইল ব্যবহার

মোবাইল শুধু জরুরি কাজে ব্যবহার করো, অনর্থক বা অবিবেচকের মতো ব্যবহার কোরো না। মোবাইল তোমাকে অনর্থক ব্যস্ত করে ফেলতে পারে, তোমার সময় ও সম্পদ নষ্ট করে দিতে পারে।

৬. বিরক্তিকর আচরণ

অন্যের বিরক্তি ঘটে এমন কিছু করবে না। যেমন : জোরে জোরে দরজা থাপড়ানো বা জোরে শোরে ভিডিও-অডিও চালিয়ে দেওয়া।

মা-বাবার সাথে কীভাবে কথা বলবে?

- মনে রাখবে, তোমার সাথে তাদের মতপার্থক্য হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা তোমাকে কিছুই মনে করে না, তোমাকে কোনো দাম দেয় না। বরং তোমার ভালোর জন্যই তারা তোমার সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য করতে পারে। তুমি তাদের উভয়ের কাছে আমানত, তারা উভয়ে তোমার ব্যাপারে মানুষের সামনে এখন এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

  তুমি যখন এ বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবে, এ বাস্তবতা যখন তোমার মস্তিষ্ক খুলে দেবে, তখন তুমি দেখবে তুমি এতদিন মা-বাবার প্রতি এমন ভুল আচরণ করার কাছাকাছি ছিলে, যেটা করা কিছুতেই ঠিক হতো না।

- তোমার বোঝার আগ্রহ ঠিক রাখো, মা-বাবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করার আগ্রহ রাখো, ভালোবাসার রশিকে মজবুত রাখো।

- কোনো বিষয়ে তারা 'না' বললে, তাদের প্রত্যাখ্যানের কারণ জিজ্ঞেস করো, তবে এ ক্ষেত্রে আদব বজায় রাখবে। যেকোনো কারণে কিছু বলার প্রয়োজন হলে শান্তভাবে আদবের সাথে বলো।

- কখনো এ কথা ভুলে যাবে না যে, তুমি তোমার মা-বাবার সাথে কথা বলছ। ভাই-বোনদের সাথে কথা বলা আর বাবা-মায়ের সাথে কথা বলা এক নয়। দুটোর ক্ষেত্রে ভিন্নতা রাখা আবশ্যক।

- তোমার কথাগুলো হবে শান্ত ও ওজনদার, ভুল ও পক্ষপাত মুক্ত; আলোচনা হতে হবে নরম কথায়, একগুঁয়েমি-অবাধ্যতা মুক্ত। সবশেষে কাজ হবে শরিয়ত অনুযায়ী, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

- কৈশোরের সময়টাকে গঠনমূলক কথাবার্তার মাধ্যমে অন্যদের সাথে বোঝাপড়া করার সক্ষমতা অর্জন করার কাজে লাগাও, গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে তোলো। এভাবে তোমার প্রতি তোমার বাবা-মায়ের আস্থা বাড়াবে। আর তোমার জন্য তাদের মনের ভয় ও দুশ্চিন্তার পরিমাণ কমিয়ে আনবে।

  একই বিষয় তোমার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ফলে তোমার শিক্ষিকা ও সহপাঠীদের সাথে তোমার সম্পর্ক সহজ ও সুন্দর হবে।

- সব সময় মনে রাখবে তোমার মা-বাবা তোমাকে ভালোবাসেন। তারা সব সময় তোমার ভালোর জন্য তোমাকে আগলে রাখতে চান এবং তোমার জন্য দুআ করেন, যা কবুল হয়ে যায়।

- তাদের প্রতি তুমি ন্যায় ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকাবে। তোমার জন্য এ পর্যন্ত তারা যা করেছেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত যা করবেন, তাদের সেসব অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন করবে।

- বোঝার চেষ্টা করো যে, কেন তোমার মা অমুক বিষয়ে তোমার মতের বিপরীতে স্থান নিলেন? কোন কোন কারণে এমন করলেন, তা বোঝার চেষ্টা করো।

- মায়ের কথা ভালো করে শুনবে। তার কথা থেকে তার অবস্থান বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। মা যেন বুঝতে পারেন যে, তুমি তাকে মনোযোগ দিয়ে শুনছ।

- যদিও কোনো বিষয়ে তুমি তার বিপরীত মত পোষণকারী হও, তবুও তার প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রকাশ করবে। এ ক্ষেত্রে বলতে পারো, 'আপনার কথা সঠিক হতে পারে, আপনার জন্য এটা বোঝার চেষ্টা করছি।' 'মা হিসেবে আপনার অবস্থান সঠিক।'

- এরপর তার কাছে তোমার মত তুলে ধরবে। তাকে বিস্তারিত জানাবে যে, এ বিষয়ে তুমি কী চিন্তা করো, তোমার ধারণা কী। তবে তোমার কথা উপস্থাপনের আগে তাকে এমন কিছু বলবে, যা থেকে তিনি বুঝতে পারবেন যে, তার প্রতি তোমার বিশেষ টান আছে, তাকে 'মা' শব্দে সম্বোধন করে কথা বলবে। তুমি বলতে পারো, 'মা, আপনার কথা আমি বুঝেছি, ধরতে পেরেছি; কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটা মতামত আছে, আপনি সুযোগ দিলে আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারি আমি।'

- কঠিন কথার পরিবর্তে নরম সুরে কথা বলবে। যদি তোমাদের উভয়ের মাঝে বয়সের অনেক বেশি পার্থক্য থাকে, তাহলে এমন কিছু বলবে না যে, 'আমাদের মতামতের অমিলের কারণ হচ্ছে, জেনারেশন গ্যাপ। আপনি এক প্রজন্মের, আমি অন্য প্রজন্মের।'

- তার কাছে তোমার অভিমত তুলে ধরার জন্য সঠিক সময় বেছে নাও।

- তার কাছে এটা স্পষ্ট করে দাও যে, যদিও তার সাথে তোমার মতামতে ভিন্নতা আছে, তবুও তিনি তো তোমার মা, প্রিয় মা।

- মায়ের প্রতি বিনয়াবনত হও, গুছিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলো, উত্তেজনাকর কথা বলবে না, কেননা তিনি তো তোমার মা—যার প্রতি 'উফ' শব্দ উচ্চারণ করাও নিষেধ করেছেন আল্লাহ তাআলা।

- যদি তোমার মা তোমার প্রতি খুবই কঠোর হন, তাহলে মনে করবে যে, তোমার কল্যাণের প্রতি তার অধিক আগ্রহের কারণে এমন করছেন তিনি। তাই তাদের প্রতি তোমার ধারণাকে ঠিক করে নাও, কারণ মা-বাবা ছেলে-মেয়ের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা শত্রুতাবশত তাদের ওপর কঠোর হন না; বরং সন্তানের ভালোর কথা চিন্তা করেই তাদের কঠোরতা আসে।

এটা ঠিক যে, আমরা তাদের দেখি তারা ছেলে-মেয়ের ওপর চিৎকার করেন, তাদের ওপর ভীষণ রেগে ওঠেন, কখনো কখনো মারধরও করেন; কিন্তু এসব তারা করেন সন্তানকে ভুল কিছু করতে দেখে, সন্তানকে বিপথে যেতে দেখে।

এমন কোনো মা-বাবাকে দেখেছ কি ছেলে ভালো করে লেখাপড়া করলে তাকে মারধর করে, অথবা মেয়ে ঠিকমতো নামাজ আদায় করলে তার ওপর চিৎকার করে ওঠে?!

বরং মা-বাবা তখন রেগে যান, যখন দেখেন, তার ছেলে সিগারেট ধরেছে অথবা তার মেয়ে অসভ্যের মতো কথা বলেছে।

কীভাবে মা-বাবার আস্থা অর্জন করবে?

সব সময় চেষ্টা করো মা-বাবা যেমন চান তেমন কিছু করতে, আর যেমন চান না তেমন কাজ থেকে দূরে থাকতে।

মা-বাবা যখন দেখবেন, তুমি তোমার ছোট ভাই-বোনদের খেয়াল রাখছ, আদর করছ, তাদের মারধর করছ না...

যখন দেখবেন, তুমি ঠিকমতো নামাজ পড়ছ, নামাজে কমতি করছ না...

যখন দেখবেন, তুমি কথা বলার সময় সত্য বলছ...

যখন দেখবেন, তুমি মাদরাসাতে দেওয়া বাড়ির কাজ ঠিকমতো করছ...

যখন দেখবেন, তুমি উত্তম চরিত্রবান হয়েছ...

তখন তুমি মা-বাবার আস্থা অর্জন করতে পারবে... এমনকি সব মানুষেরই আস্থা অর্জন করতে পারবে তুমি।

মায়ের বান্ধবী হয়ে যাও

- মাকে তোমার বান্ধবী বানিয়ে নাও। একইভাবে মায়েরও উচিত তার মেয়েকে বান্ধবীর মতো বানিয়ে নেওয়া।
- কোনো কাজ করার আগে মায়ের সাথে পরামর্শ করে নাও। তাকে বলো, 'মা, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?'
- মায়ের মতামত শুনে ঠাট্টাচ্ছলে হেসো না; এমনকি যদি তার মতামত একেবারে কাঁচা ভুলও হয় অথবা একেবারে অযথার্থই হোক না কেন। যদি এমন কিছু হয়, তাহলে তার ভুলটা আদব ও মমতার সাথে ঠিক করে নাও।
- যখন মায়ের সাথে কোনো কিছু নিয়ে পরামর্শ করতে যাবে, তখন তার সাথে কথা বলার ধরন হবে, 'মা, এ বিষয়ে আমার অভিমত বলার অনুমতি হবে কি?'
- বাড়ির কাজে সব সময় তাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করো।
- যখন কোনো মজলিশে আত্মীয়রা ও তোমার মা কথা বলবেন, তখন তার কথা কেটে কথা বলবে না বা তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে কিছু বলতে যাবে না।
- তার কাছে দেওয়া ওয়াদার ব্যাপারে যত্নশীল হও। যখন তুমি তার কাছে ওয়াদা করলে তুমি বিকেল পাঁচটায় ফিরে আসবে, তখন ঠিক পাঁচটায় ঘরে ফিরে আসবে।

হে মেয়ে, মায়ের সাথে তোমার সম্পর্ক হবে বিনয়াবনত হওয়ার, যেমনটি কুরআন বলেছে :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বলো, "হে আমার রব, তাঁদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালনপালন করেছিলেন।"'[৫৬]

---

৫৬. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৪।

কখনো বোলো না যে, তোমার মা তোমার মনোভাব বোঝেন না। বরং তোমার কর্তব্য হচ্ছে, তার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে, তার কথার আনুগত্য করে, তার প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাকে তোমার বিষয়টা বুঝতে দেওয়া।

তবে এটাও ঠিক যে, মায়ের কর্তব্য হচ্ছে এ কথাটা বোঝা যে, এ সময়ের প্রজন্ম তার প্রজন্ম থেকে আলাদা। তবে মেয়েরও কর্তব্য হচ্ছে, তার মা তার বিষয়টা বোঝার আগ পর্যন্ত মায়ের প্রতি ভালোবাসা ঠিক রাখা, তার নিকটবর্তী হওয়া, তাকে তিরস্কার না করা।

ছেলে ও মেয়ের প্রতি আলাদা আচরণ

হয়তো কিছু মা-বাবা এমন আছেন, যারা ছেলে ও মেয়ের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে এমন প্রভেদ করেছেন যে, মেয়ের মনে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নেয়।

এসব মা-বাবা ভুলে যান যে, সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে হয়। রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ

'তোমার ওপর তাদের হক রয়েছে, তুমি তাদের সাথে ইনসাফ ও সমান ব্যবহার করবে—যেমনই তাদের ওপর তোমার অধিকার রয়েছে, তারা সবাই তোমার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[৫৭]

তবে সন্তানদের প্রতি ইনসাফ ও সমান ব্যবহার করার অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সাথে একই আচরণ হবে। একজন যুবককে বাড়ির বাইরে পরিবারের আওতার বাইরে মেলামেশা করতে হয় এবং বিরোধে পড়তে হয়। তাই বাবা বা বড় ভাইকে পরিবারের বাইরের বিষয়াদি সামাল দেওয়ার বিষয়টা তাকে শেখাতে হয়।

৫৭. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ১১৯৯৬।

তাই এমন সংকীর্ণ মনের হোয়ো না যে, তোমার ভাইয়ের প্রতি ভিন্ন আচরণের অর্থ হচ্ছে, তাকে তোমার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া, তোমাকে অবহেলা করা। এমনটা ভাবার কারণ নেই। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের মাঝে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা, তাদের উভয়ের সৃষ্টি দুটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য। আর নারী-পুরুষ তো একে অন্যের জন্য পরিপূরক।

যদি তোমার অগভীর চিন্তার বশবর্তী হয়ে বলো, 'সেও শিক্ষিত আমিও শিক্ষিত, সেও কাজ করে আমিও কাজ করি, সে আয় করতে পারে আমিও আয় করতে পারি; বরং কিছু ক্ষেত্রে আমি তার চেয়ে এগিয়ে, তাহলে কেন আমার পরিবার আমার ওপর আমার ভাইকে প্রাধান্য দেয়, কেন তার প্রতি ও আমার প্রতি আচরণের এ বৈষম্য?'

যদি তোমার কাছে মনে হয় এ বৈষম্য হচ্ছে যে, তোমার ভাই যেকোনো সময় বিনা বাধায় বাড়ির বাইরে যেতে পারে, তোমার মা-বাবা কোনো রকম বাধা দিচ্ছে না বা তাকে নিষেধ করছে না, তাহলে এটা তোমার ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়া নয়; বরং তার ক্ষেত্রে কমতি হচ্ছে। তোমার উচিত হচ্ছে এ কমতির দিকটা পূরণ করার জন্য তোমার মা-বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

উসতাজ নাজাহ জামিল হাশিম তার বই 'আদওয়াউন আলাত তরিক' এ বলেন :

'যদি তুমি গভীরভাবে চিন্তা করো, তবে দেখতে পাবে, তোমার ও তোমার ভাইয়ের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আর এ বিষয়ে তোমার মা-বাবার কিছুই করার নেই।

তুমি যেকোনো কারণে যেকোনো সময় মনে ব্যথা পেলে কেঁদে ফেলতে পারো, তোমার চোখ থেকে অশ্রু পড়লে সেটা তেমন কোনো বড় কিছু নয়।...

অন্যদিকে এ দিকটা সামলে নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের ধৈর্যশক্তি অনেক। কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতিতেও একটা ফোঁটা চোখের অশ্রু ফেলাও তার জন্য ভীষণ লজ্জার।...

মেঝেতে একটা কীটপতঙ্গ দেখামাত্র তুমি তোমার ভাইকে ডাক দাও সেটা তাড়ানোর জন্য...

অন্যদিকে তোমার ভাই সে কীটপতঙ্গকে হাতে ধরে, সেটা নিয়ে মজা করে, দুষ্টুমি করে তোমার পেছনে ছোটে তোমাকে আরও বেশি ভয় দেখানোর জন্য।...

তুমি হলে মমতাময়ী ও নারীত্বের অধিকারিণী... তোমার ভেতরে মমতা আছে, স্নেহ আছে, মাতৃত্বের কোমলতা আছে...

আর সে হচ্ছে বুদ্ধিমান ও পুরুষত্বের অধিকারী... তার ভেতরে শক্তি আছে, সাহস আছে, পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে।

মেয়ে হয়ে তুমি সন্তানকে পেটে ধরো, জন্ম দাও, দুধ পান করাও, সন্তানকে চোখের সামনে যত্নে যত্নে বড় করো তোলো।

আর সে হয় একজন বাবা, সে তার স্ত্রী ও সন্তানকে রক্ষা করে বিভিন্ন কষ্ট থেকে, রিজিক অন্বেষণ করে, আল্লাহর কথা মোতাবেক পরিবার পরিচালনা করে। তার বাড়ি, তার সীমান্ত, ইসলামের ভূমি থেকে যেকোনো শকুনকে প্রতিহত করে।'

এমন বহু অগণিত উদাহরণ রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারীকে আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। এসবই তুমি বুঝতে পারবে গভীর চিন্তা করে দেখলে। এভাবে তোমার মনের দ্বিধা ও হিংসা কেটে যাবে, মা-বাবার প্রতি তোমার বিরূপ ধারণা কেটে যাবে।

সপ্তম অধ্যায়

তুমি ও তোমার বান্ধবীরা

হয়তো তুমি তোমার কোনো বান্ধবীকে খুব বেশি ভালোবাসো। কিন্তু কখনো কি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছ, এ ভালোবাসা কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, না অন্য কোনো কিছুর ওপর আধারিত, যেমন : আবেগ বা অনুভূতি থেকে? কখনো কি জিজ্ঞেস করেছ :

আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কি তোমরা পরস্পরের সহযোগী?

তোমরা কি দ্বীনি কাজে একে অপরকে নসিহত করো?

তুমি কি তাকে দেখে নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নাও? যেমনটা উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেছেন, 'আল্লাহ সে লোকের ওপর রহম করুন, যে আমাকে আমার দোষ ধরিয়ে দেয়।'

আল্লাহর জন্য ভালোবাসো, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করো, আল্লাহর জন্য নাও, আল্লাহর জন্য ছাড়ো, দুনিয়ার জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দাও।

যদি তুমি সবার মধ্যে বিশেষ কোনো বান্ধবীর সাথে থাকলে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করো, তাহলে তাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তুমি যেন অন্যদের প্রতি ঘাটতি না করো। যেন তোমার সব ভালোবাসা, সব আবেগ, সব টান এক বান্ধবীর জন্য না হয়ে যায়। সে বেশি পাবে ঠিক আছে; কিন্তু অন্যরাও যেন পায়। জনৈক ব্যক্তির কথা মনে রাখবে :

'যখন কাউকে ভালোবাসো, তখন শত্রুতার কথাও মনে রেখো, হয়তো ভবিষ্যতে এমন কিছু হতেও পারে। যদি তুমি কাউকে অপছন্দ করো, তবে ভালোবাসার কথা মনে রেখো, কারণ হয়তো এমন কিছু হতেও পারে।'

রাসুল ﷺ কত সুন্দর বলেছেন :

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

> 'তোমার বন্ধুকে যতটুকু দরকার ততটুকু ভালোবাসো, হয়তো একদিন সে তোমার বিরোধীও হতে পারে। তোমার শত্রুর সাথে পরিমিত শত্রুতা করো, হয়তো একদিন সে তোমার বন্ধুও হয়ে যেতে পারে।'[৫৮]

ভালোবাসা কখনো এক পক্ষীয়ও হতে পারে। তুমি এমন কাউকে পছন্দ করতে পারো, যে হয়তো তোমার সব আবেগ-অনুভূতি বুঝতে পারবে না। তাই আমরা জনৈক ব্যক্তির মতো দুআ করতে পারি, 'আল্লাহ, যারা আমাদের ভালোবাসে না, তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা তৈরি করবেন না। এমনকি কাউকে দুবার ভালোবাসার কষ্টে ফেলবেন না।'

কীভাবে অন্য বোনের প্রতি তোমার ভালোবাসা ব্যক্ত করবে?

- তাদের প্রতি তোমার ভালোবাসা স্পষ্ট প্রকাশ করো। রাসুল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, যদি কেউ তার কোনো ভাইকে ভালোবাসে, তাহলে সে যেন তাকে জানিয়ে দেয়। তাই তুমিও কোনো বোনকে ভালোবেসে থাকলে ইতস্তত না করে দ্বীনি বোনকে জানিয়ে দাও যে, 'আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি।'

- তার উত্তম চরিত্র বা পছন্দনীয় গুণের জন্য প্রশংসা করো। তাকে বলো, 'তোমার হাতের লেখার ধরন আমার ভালো লাগে। তোমার কথা বলার ধরন আমার খুব পছন্দ।'

---

৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯৭।

- যদি তুমি খুবই লাজুক হও, তবে একটা ছোট চিরকুটে লিখে দাও অথবা একটা ছোট উপহারের সাথে লিখে পাঠাও তোমার মনের ভেতর তার জন্য কেমন টান আছে।

- নিজেকে তুমি জিজ্ঞেস করো, কেন তুমি এ বোনকে ভালোবাসো?

- তোমার মস্তিষ্ককে তোমার মনের ওপর প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও; যেন এমন কোনো কিছুর প্রতি ভালোবাসা না জন্মায়, যেটা তোমাকে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তোমার চারপাশে যত নিয়ামত আছে, সব কি আল্লাহর দেওয়া নয়? তাহলে কেন তুমি একজন বান্ধবী পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে?!

- আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করার চেষ্টায় থাকবে সব সময়। আল্লাহর কাছে দুআ করবে, তিনি যেন তোমার অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরে দেন। আর আল্লাহ কখনো তাঁর মুমিন বান্দাকে একা ছেড়ে দেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

'আর আল্লাহ তোমাদের ইমান বিনষ্ট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়।'[৫৯]

---

৫৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৩।

দ্বীনদার বোনদের ভালোবাসা

শাইখ আলি তানতাবি বলেন, 'দ্বীনদার বোনদের মাঝে ভালোবাসা হবে আল্লাহর জন্য।'

মানুষের ভাষা অনেক সংকীর্ণ। অনেক সময় আবেগ-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এমনকি কখনো কখনো একটা সাধারণ চিত্রের ধারণ করাও সম্ভব হয় না ভাষার মাধ্যমে। গোধূলি বেলায় সাগরপাড়ের সূর্যাস্তের সময়ে আকাশের রং কেমন হয়—কলমের আঁচড়ে সে চিত্র তুলে ধরা আদৌ কি সম্ভব! সকালবেলায় বৃষ্টিস্নাত ধরণিতে বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুলের সৌন্দর্য তুলে ধরা কি কোনো কলমের পক্ষে সম্ভব!

তেমনই আমরা দেখছি (حُبٌّ) দুই অক্ষরের শব্দ। প্রথম অক্ষর ح যেন মমতা-স্নেহের প্রতিচ্ছবি। এরপরে আছে ب—যা পড়তে গেলে মুখের আকৃতি চুমু খাওয়ার আদলে হয়ে যাচ্ছে।

একটি শব্দ কত রং যে ধারণ করে! একেক জিনিসের ক্ষেত্রে একেক অর্থ বোঝায়। আমরা বলি, মুমিন আল্লাহকে ভালোবাসে, মা তার ছেলেকে ভালোবাসে, আমি দিগন্তের মুগ্ধময় ছবি ভালোবাসি, তুমি বুহতারির কবিতার ছন্দ ভালোবাসো, সে গানবাদ্য ভালোবাসে, সে তার বোনের সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, তার বোন লাল জামা ভালোবাসে। সব জায়গাতেই ভালোবাসা। কিন্তু এক ভালোবাসার সাথে অন্য ভালোবাসার কতই না তফাত!

কখনো কখনো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও অন্য কারণে ভালোবাসার মধ্যে প্যাঁচ লেগে যায়। যে কারণে কেউ মনে করতে পারে অমুকের প্রতি আমার ভালোবাসা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা; কিন্তু আদৌ এ রকম নাও হতে পারে। তাই বুঝতে হবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মানে কী?

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হচ্ছে, তুমি একজন ব্যক্তিকে তার সম্পদের আশায় নয়, তার সৌন্দর্যের জন্য নয়, তার খ্যাতির ফায়দার জন্য নয়, তার সাথে কথা বলতে ভালো লাগে বলে নয়, তার কাছ থেকে উপকার পাবে বলে নয়, তার মাধ্যমে কোনো ক্ষতি দূর হবে বলে নয়; বরং সে একজন সৎ মানুষ,

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমল করে, আল্লাহর দেওয়া শরিয়ত অনুসরণ করে বলে তাকে তুমি ভালোবাসো, এ ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।

কোনো বৈধ উপকারে আসে হিসেবে যদি তার প্রতি তোমার এ ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাতে কোনো দোষ দেখি না। কেননা, মানুষ তার উপকারকারীকে ভালোবাসে, মানুষের স্বভাব এভাবেই গঠিত।

আমাদের ঘরে একটা কাঠের ফলকে কিছু লেখা ছিল। ছোটবেলায় প্রতিদিন আমি সে কাঠের ফলকের সামনে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াতাম। লেখার স্টাইল আমার কাছে ভালো লাগত। বড় হওয়ার পর তাতে লেখা কথাগুলো পড়ে তার সঠিকতায় অবাক হলাম। সেখানে লেখা ছিল :

'যার কাছে তোমার প্রয়োজন রয়েছে, তুমি তার বন্দী। যার কাছে তুমি হাত পাতো না, তুমি তার সমকক্ষ। যার ওপর তুমি কোনো অনুগ্রহ করো, তুমি তার মনিব।'

কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যখন তার সহপাঠী বোনকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তখন সাথে সাথে অন্য ছাত্রীদেরকে ভালোবাসাও তাকে আনন্দিত করবে। কারণ, এ ভালোবাসা নেক ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করবে। যখন সাহায্যকারী বেশি হবে, তখন কল্যাণও ব্যাপক হবে, উপকার অনেক হবে।

কিন্তু যদি সে একজনকে ভালোবাসে আর বাকি বোনদের ঘৃণা করে, সে যদি একা এ একজনের ভালোবাসা ও সঙ্গ চায়, আর চায় যে, তার সবটুকু সম্পর্ক কেবল তার সাথেই থাকুক, অন্যদের সাথে ভাগ-বাটোয়ারা না হোক, তাহলে এ ভালোবাসা আল্লাহর জন্য হয়নি।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আলামত হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ক্ষেত্রে সে বোন ও তোমার সম্পর্ককে তুমি অগ্রাধিকার দেবে না; বরং সবাইকে তুমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, তোমার দৃষ্টিতে কুৎসিত মনে হওয়া মেয়েটি ও সুন্দরী মেয়েটির মধ্যে কোনো তফাত থাকবে না। তোমাকে কে গ্রহণ করে, কে বর্জন করে সেদিকে তুমি ভ্রুক্ষেপ করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর

আনুগত্যে থাকবে, শরিয়তের অনুসরণে অটল থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা অটুট থাকবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্য শত্রুতা হচ্ছে, সে কাফিরকে ঘৃণা করবে, যে কি না আল্লাহকে ভালোবাসে না। আল্লাহর জন্য শত্রুতা দৃশ্যমান হবে এভাবে যে, তুমি আল্লাহর শত্রুর সাথে কোমল আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে; যদি মুসলিমদের ও কাফিরদের মাঝে যুদ্ধ বাধে, তখন তুমি মুসলিমদের কাতারে থাকবে; নিজেকে কাফিরদের দলে ভিড়াবে না, যে ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ

> 'তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।'[৬০]

অন্যদিকে কাফিরদের প্রতি সদাচরণ ও স্বাভাবিক আচরণ—যাকে এক কথায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বলে—এটা হবে যুদ্ধরত নয় এমন কাফিরদের সঙ্গে, তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতার সাথে আচরণ করতে কোনো বাধা নেই।

সদাচরণ ও ন্যায়পরায়ণতার আচরণ আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বন্ধুত্বের পরিধিতে পড়ে না, আর এটা তাদের প্রতি কোনো রকম ভালোবাসাও নয়।

যদি তারা আমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে বা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করে, যদি তারা আমাদের সন্তানদের দ্বীন থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বা ফিতনায় ফেলার জন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ করে, তবে তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করা যাবে না।

অন্যদিকে যারা জিম্মি—জিম্মি অর্থ মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিক—দেশে আমরা যেমন সুবিধা পাব, তারাও তেমন সুবিধা পাবে। আমাদের ওপর যা অবধারিত হবে, তাদের ওপরও নাগরিক হিসেবে সেসব অবধারিত হবে, যতক্ষণ তারা পরস্পরের মাঝে কৃত চুক্তির ওপর থাকে। আর চুক্তির একটি শর্ত হচ্ছে, মুসলিমদের শত্রুর সাথে সুসম্পর্ক রাখা চলবে না, প্রকাশ্যে তারা তাদের

---

৬০. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫১।

ধর্মের দিকে আহ্বান করতে পারবে না, আমাদের সামনে তাদের শিয়ারগুলো উচ্চকিত করতে পারবে না, আমাদের নামে নিজেদের নাম রাখতে পারবে না ইত্যাদি যেসব শর্ত ফিকাহর কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে। যদি তারা শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভেঙে যাবে।

ইসলাম আমাদের ওপর ফরজ করেছে যে, আমরা দেশের সম্পর্কের ওপর দ্বীনি সম্পর্ককে প্রাধান্য দেবো। আবু লাহাব মক্কার নাগরিক ছিল। মক্কার বিশিষ্টজন ছিল। কুরাইশি ছিল, হাশিমি ছিল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর চাচা ছিল। কিন্তু আমরা আমাদের নামাজে (সুরা লাহাব তিলাওয়াতে) আবু লাহাবের ধ্বংসের অভিসম্পাত করি। কারণ, এখানে দেশের সম্পর্কের ওপর দ্বীনি সম্পর্ক প্রাধান্য পায়।

ইবরাহিম ﷺ আল্লাহর জন্য তার পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। কুরআনে এসেছে :

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ

'কিন্তু যখন এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল।'[৬১]

যে জিম্মি আমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াবে না, আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেবে না, আমাদের সাথে কৃত চুক্তি মেনে চলবে, আমরা তার সাথে ভালো আচরণ করব, আমরা তার সাথে ইনসাফ বজায় রাখব, সঠিকভাবে তার সাথে সহাবস্থান করব; কিন্তু আমরা তাকে দ্বীনি ভাইয়ের স্থান দেবো না, আমরা তাকে মন থেকে ভালোবাসব না, কেননা সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

৬১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৪।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার পরিমাণ

মনে রেখো, আল্লাহর জন্য ভালোবাসার পরিমাণ হচ্ছে, তুমি তাদেরকে ততটুকু ভালোবাসবে, যতটুকু তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, যতটুকু তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, যতটুকু তারা আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাদের প্রতি ততটুকু ঘৃণা পোষণ করবে, যতটুকু তারা আল্লাহর থেকে দূরে থাকে, যতটুকু পরিমাণে আল্লাহর আদেশের অবাধ্য হয়।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করে, আল্লাহর জন্য দান করে, আল্লাহর জন্য দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে, সে ইমান পূর্ণ করল।'[৬২]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى

'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন মানুষ আছে, যারা নবিও নন, শহিদও নন; কিন্তু কিয়ামতের দিন নবিগণ ও শহিদগণ আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন।'

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাদের বলবেন যে, তারা কারা?

রাসুল ﷺ বললেন :

هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا

---

৬২. সুনানু আবি দাউদ : ৪৬৮১।

يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ» وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: ٦٢]

'তারা হলো সেসব মানুষ, যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এবং লেনদেন না থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। আল্লাহর কসম, তাদের চেহারা নুরের আলোয় আলোকিত হবে, তারা নুরের ওপর থাকবে। অন্যরা যখন ভয়ার্ত থাকবে, তারা তখন ভয় পাবে না, অন্যরা যখন চিন্তিত হবে তারা তখন চিন্তিত হবে না।' এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) 'জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা চিন্তিতও হবে না।'[৬৩_৬৪]

তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের মনে মুমিনদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ না রাখেন।

অন্যদিকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সেসব জিনিস থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, যেসব জিনিস আমাদের মধ্যে দূরত্ব ও বিদ্বেষের কারণ হয়।

আমার বান্ধবী কি আমাকে ত্যাগ করেছে?

মেয়েদের মাঝে এমন কিছু বিরল নয়। অনেক তরুণী বছরের পর বছর বন্ধুত্বের বন্ধনে থাকে। এরপর হঠাৎ এ প্রশ্ন আসে যে, আমার বান্ধবী কি আমাকে ত্যাগ করেছে?

কখনো দেখা যায়, প্রথমে সে বান্ধবী তোমার সাথে থাকে, তোমার কষ্ট লাঘব করে, তোমার কথা শোনে। এরপর একদিন সে বান্ধবী বদলে যায়, তোমার সাথে কঠোর আচরণ করে, তোমার অভিযোগ-অনুযোগ ও আবেগ-অনুভূতির কেয়ার করে না, তুমি তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো—কিন্তু সে উত্তর দেয় না, তুমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করো—কিন্তু সে কথা বলতে চায় না।

---

৬৩. সুরা ইউনুস, ১০ : ৬২।
৬৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫২৭।

বান্ধবীর কাছ থেকে এমন আচরণ পেয়ে কারও কারও তো রাতের ঘুম চলে যায়, ডিপ্রেশন শুরু হয়। বলতে থাকে, যে বান্ধবীর কাছে মনের সব কথা খুলে বলতাম, সে বান্ধবী আজ কোথায়! যে বান্ধবী সবচেয়ে আপনজন ছিল, আজ কোথায় সে!

এত হৃদ্যতা ও ভালোবাসার পরে এ অবহেলার কারণ কী?

হয়তো তাদের বন্ধুত্ব ছিল পার্থিব কোনো উপকার লাভের আশায় অথবা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে।

হয়তো বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য ছিল না।

কখনো হতে পারে বান্ধবীর প্রতি তুমি বেশি ভালোবাসা দেখিয়ে ফেলেছ, এখানে তুমি ঠিকমতো সবকিছু করতে পারোনি, অতিরিক্ত করে ফেলেছ।

আবার কখনো তোমার নিজের মনোভাবই এমন কিছুর জন্য দায়ি হতে পারে, তুমি হয়তো মনে করতে পারো, তোমার বান্ধবী তোমার একার মালিকানা, তুমি ছাড়া অন্য কারও সাথে সে বন্ধুত্ব করতে পারবে না!

সমস্যার সমাধান

উসতাজ মুহাম্মাদ রশিদ আবিদ 'লাহজাতুন ইয়া বানাত' বইতে এ সমস্ত পরিস্থিতিতে কিছু করণীয় উল্লেখ করেন :

এক. বোনদের মধ্যে ভালোবাসা হতে হবে আল্লাহর জন্য। তরুণীদের এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, 'ভালোবাসা একটা নিয়ামত, আল্লাহ-প্রদত্ত রিজিক।' যখন কেউ ভালোবাসার হক ঠিকমতো আদায় করবে, সে পুরস্কার পাবে; পুরস্কার হচ্ছে আল্লাহর জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারী আল্লাহর কাছে নুরের মিম্বারে থাকবে, যা দেখে নবিগণ ও শহিদগণ ঈর্ষা করবেন।

দুই. এটা ঠিক যে, ইসলাম আমাদেরকে পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দিকে আহ্বান করেছে। আর এ ক্ষেত্রে দুই মহব্বতকারীর মধ্যে সে উত্তম, যে বেশি ভালোবাসে। যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ، إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

'আল্লাহর জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারী দুই ব্যক্তির মাঝে সে উত্তম, যে তার সঙ্গীকে অধিক ভালোবাসে।'[৬৫]

তবে এটাও জেনে রাখতে হবে যে, ইসলাম সব সময় মধ্যমপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে আহ্বান করে। তাই ভালোবাসার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত করা যাবে না, স্বেচ্ছাচারিতা করা চলবে না। আর কখনো মনে করবে না যে, তুমি ভালোবাসার মাধ্যমে তোমার বান্ধবীর মালিকানা পেয়ে গেছ যে, তোমার সে বান্ধবী অন্য কোনো বোনের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারবে না, কেবল তোমাকেই সঙ্গ দিতে হবে!

যদি তুমি তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে তার সব মহব্বত কেবল তোমার নিজের জন্যই চাও, তবে তোমার বান্ধবী হয়তো তোমার দ্বারা কষ্ট পেতে পারে, সমস্যায় পড়তে পারে।

রাসুল ﷺ আমাদেরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হওয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন :

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

'তোমার বন্ধুকে যতটুকু দরকার ততটুকু ভালোবাসো, হয়তো একদিন সে তোমার বিরোধীও হতে পারে। তোমার শত্রুর সাথে পরিমিত শত্রুতা করো, হয়তো একদিন সে তোমার বন্ধুও হয়ে যেতে পারে।'[৬৬]

তিন. বান্ধবীর সাথে তোমার আচরণের ধরন বিবেচনা করে দেখো। কারণ, হয়তো সে-ই তোমার কারণে সমস্যায় আছে বা তোমার কারণে বিরক্ত হয়ে আছে তোমার অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে শুনতে।

---

৬৫. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫৬৬।
৬৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯৭।

তুমি যেমন চাও, সে তোমার অভিযোগ-অনুযোগ ও আবেগ-অনুভূতির কথাগুলো শুনুক, তুমিও তার অভিযোগ-অনুযোগ ও আবেগ-অনুভূতির কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তুমি তার কাছে যেমন আচরণ চাও, সেও তোমার কাছে যেন সে রকম ভালো আচরণ পায়।

তাকে তার একান্ত গোপন বিষয় তোমাকে জানাতে নিষেধ করো, তুমি তাকে একেবারে গোপন বিষয়গুলো জানাবে না।

তার সব অবস্থা ও পরিস্থিতিকে তুমি গুরুত্ব দিচ্ছ এমনটা প্রকাশ করবে, তার সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হও, অতিরিক্ত পরিমাণে কথা বলা থেকে বিরত থাকো।

চার. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করো। আল্লাহকে ভালোবাসো। আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসবেন এবং তোমাকে ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টির নিকট প্রিয় বানিয়ে দেবেন।

বন্ধুতে বন্ধুতে, বান্ধবীতে বান্ধবীতে অনেক সমস্যা থেকে যায় ইমানিয়াতের দিকটা ঠিক না থাকার কারণে। যদি প্রত্যেক বোন পরিস্থিতির পরিবর্তন ও বন্ধুত্ব ছুটে যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে এসে সিজদায় পড়ে যেত, আল্লাহ তাআলার সাথে ও মানুষের সাথে নিজের আচার-আচরণের বিষয়ে আত্মসমালোচনা করত, তাহলে তার অবস্থা ঠিক হয়ে যেত সহজেই।

একটা ঘটনা আছে। জনৈক সালাফ বাড়ি থেকে বের হলে একজন সাধারণ মানুষ তাকে বেশ কষে গালি দিল। তিনি সাথে সাথে বাড়িতে গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমার যে গুনাহের কারণে আপনি এ লোককে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন যে, সে আমাকে গালি দিয়েছে, আপনি আমার সে গুনাহ ক্ষমা করে দিন।'

জনৈক সালাফ বলেন, 'আমি আল্লাহর কোনো অবাধ্যতা করে ফেলেছি কি না, সেটা আমার স্ত্রীর আচরণ থেকেই বুঝে ফেলতে পারি।'

তাই যখন দেখবে, তোমার কোনো বোনের সাথে তোমার সম্পর্কের টানাপোড়েন হচ্ছে, এত দিনের ভালোবাসা বদলে যেতে শুরু করেছে, তখন তুমি আল্লাহর কাছে এসো, এরপর বারবার আত্মসমালোচনা করো।

পাঁচ. যদি কোনো বোন তোমাকে ত্যাগ করে, তবুও তুমি তাকে ত্যাগ কোরো না। যদি কোনো বোন তোমাকে উপেক্ষা করে, তবুও তুমি তাকে উপেক্ষা কোরো না। সে পুরস্কার ও মর্যাদার কথা স্মরণে রাখো, যে মর্যাদার প্রতি নবিগণ-শহিদগণও ঈর্ষা করবেন। সে মর্যাদা তো দুই দ্বীনি বোনের পরস্পরকে ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হবে অথবা দুই দ্বীনি ভাইয়ের পরস্পরকে ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জিত হবে, যারা নিজেদেরকে কেবল আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে।

সে যদি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে বা তোমাকে উপেক্ষা করে চলে, তবে ধৈর্য ধরো। ধৈর্যের ওপর নিজেকে অভ্যস্ত করে নাও, নিজেকে বলো, 'আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন; যেন আমি আল্লাহর কাছে ফিরে আসি এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নিই।'

যদি তোমাকে কেউ বলে, 'কত আর ধৈর্য ধরবে? ধৈর্য ধরারও তো একটা সীমা আছে?' তখন তুমি এ হাদিসের কথা স্মরণে রেখো। একবার এক লোক আসলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে, অভিযোগ জানালেন যে, তিনি আত্মীয়দের দেখতে যান, তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে না। রাসুল ﷺ বললেন :

لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

'যদি বিষয়টা এমনই হয়—যেমন তুমি বলছ, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখের ওপর জলন্ত অঙ্গার ছুড়ে মারছ, আর সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকবে, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় বহাল থাকবে।'[৬৭]

৬৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৫৮।

তাই তোমার বান্ধবী তোমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছেদ করলেও তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রেখো। তোমার একজন দ্বীনি বোনের কারণে দ্বীনি ভ্রাতৃত্বকে দোষারোপ কোরো না। কেননা, ভ্রাতৃত্ব খুবই মধুর সম্পর্ক। যদিও কিছু মানুষের কারণে এটাকে বিরূপ মনে করা হয়।

মনে রেখো, যদি তোমার এ ভালোবাসা সত্যিই আল্লাহর জন্য হয়, তবে এ সম্পর্কের ওপর বিরূপ আচরণ, কম দেখা করা, কম যোগাযোগ করা, কম উপহার দেওয়ার কোনো প্রভাব পড়বে না। ইয়াহইয়া বিন মুআজ বলেন, 'ভালোবাসার প্রকৃত রূপ হচ্ছে, এটা না সদাচরণে বাড়ে আর না বিরূপ আচরণে কমে।'

কখনো এমনও ঘটতে পারে যে, যখন দুজন বোন পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তখন ইমানের সে মিষ্টতা নাও পেতে পারে, যা পাওয়ার সুসংবাদ রাসুল ﷺ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

> 'যার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে : এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছু থেকে তার কাছে প্রিয় হওয়া। দুই. কাউকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। তিন. কুফরিতে ফিরে যাওয়া সে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমনটা ঘৃণা করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।'[৬৮]

ইমানের এ মিষ্টতা না পাওয়ার কারণ এটা হতে পারে যে, তাদের মস্তিষ্কে দ্বিতীয়টি বসে আছে, আর প্রথম ও অগ্রবর্তী শর্ত 'অন্য সবার ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার শর্তটা তারা ভুলে বসে আছে।

---

৬৮. সহিহুল বুখারি : ১৬।

যার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা প্রবেশ করেছে, তার কাছে দুনিয়ার অন্যসব ভালোবাসা ফিকে হয়ে গেছে। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসার পর আল্লাহ তাআলা তাকে একজন নেককার ভাইকে ভালোবাসার তাওফিক দেন, তবে অবশ্যই সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। কারণ, তখন তার অন্তর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসায় সিক্ত হবে, তখন তার অন্তর দুনিয়ার কারও প্রতি নয়; বরং তার সব ভালোবাসা হবে এক আল্লাহর জন্য, কোনো মানুষের খ্যাতি বা পদমর্যাদার জন্য নয়।

ছয়. মনে কোরো না যে, বন্ধুত্বের ভিত্তি হচ্ছে, প্রতিদিন যোগাযোগ করা, কুশলাদি জিজ্ঞেস করা—যেন এ বোনটি তার বান্ধবীর সাথে কথা বলার জন্য সব সময় তটস্থ থাকতে হবে, যেন তার আর কোনো কাজই নেই!

আহ, আজ আমরা সালাফের আমল থেকে কত দূরে রয়েছি! এক লোক ইমাম মাইমুন বিন মিহরানকে বললেন, 'অমুক আপনার কাছে কম আসে যে!' মাইমুন বললেন, 'যখন ভালোবাসা অন্তরে ঠাঁই করে নেয়, তখন দূরত্বে কিছু আসে যায় না।'

জনৈক সালাফ তার ভাইকে বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি চাই প্রতিদিন তোমাকে দেখতে আসি, তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসি; কিন্তু আমি ভয় করি, এতে তোমার কষ্ট হবে কি না!'

তখন তার সে ভাই বললেন, 'আমার এমন কিছু ভাই আছেন, যারা আমার হৃদয়ের নিকটবর্তী সেসব ভাইয়ের থেকে, যাদের সাথে আমার প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয়।'

এমনই ছিল তাদের স্বভাব। আর আমরা প্রতি মুহূর্তে তিরস্কার ও অভিযোগ করি, কেন সাক্ষাৎ কম হয়, যেন সাক্ষাৎ কম হলে ভালোবাসাও কমে যায়!'

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন :

'যে সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব ধারণ করে, সে অপর ভাইয়ের ওজর কবুল করে, তার ভুল শুধরে দেয়, তাকে আল্লাহর জন্য ক্ষমা করে দেয়।'

যে শিক্ষিকাকে তার ছাত্রীরা ভালোবাসে

অনেক তরুণী আছে, যারা শিক্ষিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়, শিক্ষিকাকে মন থেকে পছন্দ করে। এমন অবস্থা আরব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হয়। অনেক তরুণী তার শিক্ষিকার মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ দেখতে পায় বলে সে শিক্ষিকাকে পছন্দ করে মন থেকে।

একজন শিক্ষিকার কর্তব্য হচ্ছে, শরিয়তের মূলনীতির আলোকে এ রকম সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টা করা, এমন ছাত্রীদের উন্নত শিষ্টাচার ও গৌরবময়তার শিক্ষা দেওয়া। আর সে শিক্ষা হবে এ রকম যে, আবেগ-অনুভূতির গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, ইবাদতে নিমগ্ন হওয়া ও পড়ালেখায় মনোযোগ দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া, একে অপরকে উপহার দেওয়াসহ ইত্যাদি মাধ্যমে ভালোবাসাকে দৃঢ় করা।

ইন্টারনেটে বন্ধুত্ব

নিঃসন্দেহে ইন্টারনেটে বন্ধুত্ব স্থাপনে মানুষের কল্পনা বড় একটা ভূমিকা পালন করে। যখন তুমি মোবাইলে কোনো পুরুষের কণ্ঠ শুনো, তখন তুমি না তার চেহারার অভিব্যক্তি দেখো আর না তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখো, তুমি তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাও না, কেবল তার কণ্ঠটাই তোমার সমগ্র সত্তার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়, তোমার অনুভূতির ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। কারণ, তখন মূলত সে তোমার অনুভূতির ওপরে তোমার একটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কবজা করছে। অন্যদিকে তোমার বাকি ইন্দ্রিয়গুলো তো এখানে অকেজো।

প্রিয় নবিজি ﷺ বলেছেন :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

'আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা আমার কাছে বিচার মীমাংসার জন্য এসে থাকো। তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষ অপেক্ষা দলিল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে বেশি পারদর্শী হতে পারে; ফলে আমি আমার শোনার কারণে যদি কাউকে তার অপর ভাইয়ের হক দিয়ে দিই, তাহলে যেন সে তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য জাহান্নামের একটি অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।'[৬৯]

তাই বলি, কেবল একজন মানুষের কথা শুনেই কী করে আমরা তার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার ফয়সালা দিয়ে দিতে পারি; অথচ কত সহজেই তো মানুষ ভুলের বশবর্তী হয়ে যেতে পারে?!

কীভাবে এমন কাউকে বিশ্বাস করতে পারি, কথা বলার সময় যার চেহারা দেখছি না? কীভাবে কেবল ইন্টারনেটে দুয়েকটা কথা শুনেই এ রকম মজবুত সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে পারি? যদিও এখন ক্যামেরা রয়েছে, তবুও কী করে শরয়ি সীমার বাইরে একজন যুবকের সাথে একজন যুবতির সম্পর্ক হতে পারে?

তবে অবশ্য কেউ তোমাকে তরুণীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছে না। তবে সে বন্ধুত্ব তুমি তোমার সহপাঠী ও আত্মীয়দের মধ্য থেকে কারও সাথে করাটাই উত্তম। কীভাবে তুমি অজানা-অচেনা যুবতিকে বিশ্বাস করবে? তাকে নিজের ও নিজের পরিবারের তথ্যাদি দিয়ে দেবে? আবার দেখা গেল তুমি সীমার বাইরে গিয়ে তাকে নিজের ছবিও পাঠিয়ে দিলে! এরপর হয়তো সে তোমার ছবি ও তোমার তথ্যগুলো অপরিচিত লোকদের দেবে! তখন তারা তোমাকে নিয়ে অপবাদ দেবে, নিজেদের সুবিধামতো ছবিগুলো ব্যবহার করবে। সাবধান হে বোন, ইন্টারনেটে এমন সম্পর্কে জড়াবে না, এসব এমন ফাঁদ, যা অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

---

৬৯. সহিহুল বুখারি : ৬৯৬৭।

অষ্টম অধ্যায়

তুমি এবং সেই যুবক

তরুণী মার্কেটে যুবকের সাথে দেখা করে অথবা কলেজের সামনে দেখা করে। সে হয়তো মোবাইলে যুবকের কণ্ঠ শুনেছে। তার মধুর কথায় ভুলেছে। যুবক বলেছে যে, 'সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি', 'তোমার জন্য আমার ভালোবাসা সত্যি'। যুবক হয়তো নিজ হাতে লেখা চিঠিতে প্রচণ্ড ভালোবাসার কথা লিখে পাঠিয়েছে তাকে। যেখানে ওয়াদা ছিল, ভালোবাসার প্রচণ্ড তৃষ্ণা ছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, 'আমিই তোমার হবু স্বামী', 'আমিই তোমার স্বপ্নের রাজকুমার'!

যুবক চায় কী?

এ তরুণী যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করে, 'এ যুবক চায় কী? এটা কি হারাম বাসনা নয়?'

আবার যেন জিজ্ঞেস করে, 'এ যুবককে কী করে বিশ্বাস করা যায়, সে তো আল্লাহকে ধোঁকা দিচ্ছে এবং দ্বীনের সাথে প্রতারণা করছে আর আমার সাথে হারাম সম্পর্ক করছে?!'

এভাবে নিজেকে সতর্ক করবে। তুমি কি সেসব যুবতির ঘটনা জানো না, যারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছে এবং আফসোস করেছে যদি অমুকের সাথে সম্পর্কে না জড়াত, অমুককে যদি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করত?!

দুই চিত্রের মাঝে তুলনা করে দেখো

প্রথম চিত্র : একজন দ্বীনদার যুবক। আল্লাহর আনুগত্যশীল। তার সময় কাটে ইবাদতে। তার যৌবন ব্যয় হয় আল্লাহর আনুগত্যে। ফিতনা যখন সামনে আসে, তখন সে চোখ ফিরিয়ে নেয় এবং তা থেকে দূরে সরে যায়। অন্যদের মতো তার মাঝেও কামনাবাসনা আছে; কিন্তু সে বিশ্বাস করে কামনাবাসনাকে শরয়ি পদ্ধতিতে নির্বাপণ করতে হয়।

দ্বিতীয় চিত্র : একজন অবাধ্য চোখের খারাপ যুবক। কামনাবাসনার কাছে পরাজিত। দিনভর হাটবাজারে, নারীদের সমাগমের সামনে অহেতুক ঘুরে বেড়ানো, গাড়ি নিয়ে বদমাইশি করা, যুবতিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা তার কাজ। এরপর তার রাত কাটে মোবাইলে কোনো যুবতির সাথে কথা বলে অথবা নোংরা-অশ্লীল ফিল্ম দেখে।

এবার তোমাকে বলছি, আল্লাহর কসম করে বলছি, কোন যুবক তোমার পছন্দ হওয়া উচিত, কোন যুবক প্রশংসা পাওয়া উচিত। যে যুবক নিজের কামনার ওপর লাগাম পরিয়ে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সঁপে দিয়েছে সে, নাকি সে যুবক—যে কামনাবাসনার সামনে পরাজিত হয়েছে এবং চরিত্র-সম্মান-নিষ্কলুষতা ধ্বংসের পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে?!

মোবাইল ও বিয়ে

কখনো মনে কোরো না মোবাইলে মোবাইলে অনর্থক কথা বলার মাধ্যমে বিয়ে হয়ে যাবে। যদি বিয়ে হয়েও যায়, তবুও দেখা যায় এমন অধিকাংশ বিয়ে ভেঙে যায়, ডিভোর্স হয়ে যায়, একে অপরের প্রতি সন্দেহ হয়, সবশেষে আফসোস ছাড়া কিছুই মেলে না। একজন যুবক যতই সত্যবাদী ও ভালো মনের হোক না কেন, তার সাথে বন্ধুত্ব করতে যাবে না। মোবাইলে এমনটা করা প্রথমত রবের সাথে খিয়ানত, তারপরে পরিবারের সাথে খিয়ানত। কোনো যুবক নিজেকে যদি এমন ভালো দেখাতে চায়, তাহলে সেটা সে তার নিজের কুস্বার্থের জন্যই করছে—এটা বোঝা এমন কঠিন কিছু নয়।

এমন কত যুবতি মোবাইলে সে যুবকের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছে যে, সে যুবকের সাথে অনেক যুবতির সম্পর্ক আছে, এখন সে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জনকে বেছে নেবে, আর যুবকটাও কত না ভালো!

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

তুমি ভেবে দেখছ না যে, একটা যুবক যতই প্রতিশ্রুতি দিক সব শেষে সে তার জন্য সব উৎসর্গ করা যুবতিকে ছেড়ে যাবেই, কারণ সে চিন্তা করবে, যে যুবতি বিয়ে ছাড়াই তাকে সব দিয়ে দিল, সে তো অন্য কারও সাথে একই রকম কিছু করতে পারে?!

হ্যাঁ, ইসলাম না মানা যুবকরা এমনই হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা থেকে তো পালানো যাবে না। তাই সতর্ক থাকতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। যুবতিদের উদ্দেশে বলব, সব সময় সতর্ক থেকো, কোনো রকম মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে পোড়ো না যেন।

মানব-নেকড়ে থেকে সাবধান থেকো, যে সব সময় সুযোগ খোঁজে হামলা করার জন্য।

এক সমীক্ষায় যুবক-যুবতির কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'লাভ-ম্যারেজ না এরেঞ্জ-ম্যারেজ?' ৮০% যুবতির উত্তর ছিল যে, তারা এরেঞ্জ-ম্যারেজকে প্রাধান্য দেবে। আর বাকি ২০% যুবতি নিজেদের মন্দ অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেয়নি, অন্যদের মন্দ অভিজ্ঞতা থেকেও শিক্ষা নেয়নি! কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে, ১০% যুবক উত্তর দিয়েছিল যে, এরেঞ্জ-ম্যারেজকে তারা ভালো মনে করে। অন্যদিকে ৯০% যুবক বলেছিল, লাভ-ম্যারেজ, ভালোবেসে বিয়ে করাই উত্তম!

তা ছাড়া এ রিপোর্টে সাইকোলজিস্ট ও সোশ্যাল ওয়ার্কারদের মন্তব্য ছিল এমন, যুবকরা লাভ-ম্যারেজকে প্রাধান্য দিয়েছে; যাতে তারা ইচ্ছেমতো বিনোদন করতে পারে। এরপর যখন তারা ইচ্ছে করবে, তখন বিয়ে করে নেবে। সিদ্ধান্ত তাদের হাতেই। (!)

অথচ এসব যুবক এমন কত মেয়েকে যে পরিত্যাগ করে যাবে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! একটা মেয়েকে জীর্ণ করে দিয়ে সরে পড়বে। চলে যাবে সে মেয়ের খোঁজে, যে তার হৃদয় ও সম্মানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে, কাউকে সোপর্দ করেনি, কারণ এ হচ্ছে নিষ্পাপ গোলাপ, যেটাতে কোনোরকম আঁচড় লাগেনি। বোন আমার, নিজের নিষ্পাপতার কথা ভাবো, নিজের সম্মানের কথা চিন্তা করো, নিজেকে লাঞ্ছনার আগুনে ছুড়ে দিয়ো না!

মানুষরূপী নেকড়ে

এটা ঠিক যে, পুরুষই পাপের পথে প্রথমে আগায়। সব সময় নারীই আগে পাপ করে এমনটা নয়। কিন্তু যদি যুবতির স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ না থাকে, তাহলে পুরুষের এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। নারী ছাড় দিলেই সর্বনাশ ঘটে যায়। নারীই দরজা খুলে চোরকে বলে, এসো, এসো। আর যখন চোর চুরি করে যায়, তখন নারী চিৎকার করে বলে, আমাকে সাহায্য করো, আমার তো সব গেল!

নেকড়ের ক্ষুধা কেবল মাংসতেই। যে ব্যক্তি তোমার দেহ চাইবে, সে তোমার ওপর জোর করে নিজের স্বার্থ ফলাবে। আর সেটা তোমার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যিকার পুরুষ হবে, সে তোমাকে সম্মানিত করবে, তোমাকে নিষ্পাপ পেতে চাইবে, যে নিষ্পাপতা নিয়ে তুমি গর্ব করতে পারো, যা নিয়ে তুমি সম্মান বোধ করো।

যে মেয়ে পুরুষের ধোঁকার শিকার হয়েছে, সেটা তার জন্য বাঘের খাবার হয়ে শতবার মৃত্যুবরণ করার চেয়েও ভয়াবহ। মানবরূপী নেকড়ে তোমাকে বলবে, সে কেবলই তোমার চরিত্র ও আচরণ দেখে তোমার প্রতি মুগ্ধ হয়েছে, সে তোমার কাছে আর কিছুই চায় না। চরিত্র হরণকারী এমন নেকড়েগুলো বলবে, 'আমরা কেবল দুই সহপাঠীর মতো কথা বলব।' তারা বলবে, 'আমি তোমাকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসি।' কিন্তু আল্লাহর কসম, এরা চরম মিথ্যাবাদী।

যদি একাকী তুমি সেসব যুবকের কথা শুনো—তবে শাইখ তানতাবি যেমন বলেছেন—তাহলে তুমি ভয়ংকর ঘোরে আছ। কোনো যুবক যখন তোমার দিকে তাকিয়ে হাসে, বা তোমার সাথে নরম সুরে কথা বলে, তোমার কোনো

কাজে আসে—এসবই সে করে মনের কামনাবাসনা চরিতার্থ করার পথের ভূমিকা হিসেবে, তোমাকে ভ্রষ্ট করার জন্য।

এরপর যুবক কিছু সময় তোমার সাথে উপভোগ্য সময় কাটিয়ে তোমাকে ভুলে যাবে। আর তুমি রয়ে যাবে অতল দুঃখের সাগরে। তখন সে অন্য কোনো মেয়েকে শিকার করার জন্য খুঁজতে থাকবে। এদিকে তোমার পেটে সন্তান বড় হবে। সব চিন্তা তোমাকে নিতে হবে। সব অপবাদ সইতে হবে তোমাকেই।

জালিম সমাজ সে যুবককে ক্ষমা করে দেবে। বলবে, একজন যুবক পথভ্রষ্ট হয়েছিল, এরপর তাওবা করে ভালো হয়ে যায়। কিন্তু তোমাকে তো অপমান ও লজ্জা বয়ে বেড়াতে হবে সারাটা জীবন, সমাজ কখনো তোমাকে ক্ষমা করবে না।

যখন কেউ তোমার দিকে অগ্রগামী হয় আর তুমি তোমার চোখ সরিয়ে নিলে; কিন্তু দেখলে সে তার মন্দ বাসনা পূরণে দৃঢ়সংকল্প করেছে, তুমি উপেক্ষা করলেও সব বাধা এড়িয়ে সে লেগেই আছে, যদি সে মুখে কিছু বলে বা হাতে কিছু করে নির্লজ্জতা দেখায়, তবে পা থেকে জুতো খুলে তার মাথায় মারবে। যদি তুমি এটা করতে পারো, তাহলে দেখবে, রাস্তার সবাই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। এরপর কখনো কোনো বদমাশ কোনো নিষ্পাপ মেয়ের দিকে এগিয়ে আসার সাহস করবে না। কিন্তু যদি সে সত্যিই ভালো ছেলে হয়, তাহলে তাওবা-ইসতিগফার করে বৈধভাবে তোমাকে পাওয়ার জন্য সম্বন্ধ নিয়ে আসবে, বিয়ে করতে চাইবে তোমাকে।

খেলোয়াড়প্রীতি

কিছু যুবতি লেকচারের ভেতরে অনুমতি চায় টুর্নামেন্টের খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য। অথবা লেকচারের ভেতরে একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, কোন দল জিতেছে? এদের মধ্যে কেউ এক দক্ষ খেলোয়াড়কে অনেক পছন্দ করে বা কোনো বিশেষ দলের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়। কেন সে একটা খেলোয়াড়দলের বিজয়কে এত গুরুত্ব দিচ্ছে বা কোন দল কত স্কোর করল, তার ওপর এত গুরুত্ব দিচ্ছে?!

এমন মা কী ধরনের সন্তান গড়ে তুলবে? উম্মাহকে সে কী দেবে?! এ যুবতি যখন তার সময়কে এভাবে অবহেলায় নষ্ট করবে, অনর্থক খেলাধুলা তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করবে, সে যখন নারীত্ব ও মাতৃত্বের বিপরীতে এভাবে চলতে থাকবে, তার থেকে কীই বা আশা করা যায়!

লেনদেন

যুবক যুবতিদের সাথে লেনদেন করে কথায়, কখনো চোখে চোখে চোখাচোখি করে, কখনো কাউকে ফোন নম্বর দেয়। এভাবে প্রকাশ পায় যে, পানি অনেক দূর গড়াতে পারে।

রাস্তায় দেখবে, যুবতিদের গাড়ি থেমে আছে। একটু পর এক যুবকের গাড়ি এসে পাশে থামে ক্ষণিকের জন্য। গাড়ির জানালা খুলে যায়। যুবক হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ এগিয়ে দেয়। বিপরীত দিকের কোনো এক যুবতি সেটা নিয়ে নেয়। এরপর দুই গাড়ি চলে যায়। এমন চিত্র দেখা যায়, শোনাও যায়। এমনই চলছে নির্লজ্জের মতো আমাদের সমাজে।

মনে রাখবে, এমন লেনদেন ফিতনা-ফাসাদের অনেক বড় মারাত্মক মাধ্যম। পরিবার ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার। যুবতিদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম।

এমন লেনদেন রাখার কারণে কত যুবতির যে বিয়ের সম্বন্ধ এসেও ভেঙে গেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এমনকি কখনো কখনো এক বোনের কারণে অন্য বোনদেরও বিয়ে আটকে যায়। এমনও তো কত ঘটেছে যে, কারও স্ত্রী এমন কিছুর শিকার হয়েছে, তার স্বামী এ ঘটনা জানার পর তাকে তালাক দিয়ে দিল, তার নিজের জীবন তো নষ্ট হলোই, সন্তানদের জীবনও নষ্ট হলো!

এমন লেনদেনের বলি হতে হয়েছে কত মুসলিম মেয়েকে, কত যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই! এসবই তাদেরকে শিকার করার ফাঁদ, তাদের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করার মাধ্যম, তাদের চেহারায় কালিমা লেপনের মাধ্যম, তাদেরকে কোণঠাসা করার মাধ্যম, তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে ও বারবনিতা বানানোর ষড়যন্ত্র। এসব আদান-প্রদান উম্মাহর দেহে ক্ষতকারী পোকার মতো।

অনেক যুবক-যুবতি তো এ বিষয়কে শিল্পে পরিণত করেছে। চোখ মারা, নোংরা হাসি দেওয়া, হালকা কৌতুক করা, ছিনালি করে অঙ্গভঙ্গি করে হাঁটা, এ কাজে চলে এমন পারফিউম মাখা। কেবল মোবাইলে কথা বলে এখন ক্ষান্ত নয় তারা, এখন সন্ধ্যাকালীন আলাপে শিকার খোঁজা হয়, যেন পাপের সিলসিলা শুরু করা যায়।

বিগত কয়েক বছর ধরে ব্লুটুথ নামের এক মহামারি শুরু হয়েছে। এটার মাধ্যমে প্রেমের কবিতা পাঠানো হয়, আবার অশ্লীল ছবিও আদান-প্রদান হয়।

আশ্চর্য হচ্ছে, এখন কেবল যুবকরা নয়; বরং যুবতিরাও এসব লেনদেনের যজ্ঞ শুরু করেছে। এ রকম যুবতিরা যুবকদেরকে মধুর কথায় ভুলিয়ে রাখে মোবাইলের কলে, কবিতা বলে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে; যেন সময়টা কেটে যায়, বিনোদন পাওয়া যায়, যুবকের কাছ থেকে কিছুটা প্রশংসা শোনা যায়!

কিন্তু এসব আদান-প্রদানের ফলাফল কী? এসব কি হারাম উপভোগ নয়? এসব কি মারাত্মক পাপ নয়? এসব কি এমন অপরাধ নয়, যার জন্য জাহান্নামে জ্বলতে হবে?

এমন আদান-প্রদান করতে যাওয়া এক যুবতির কথা শোনো :

সম্পর্কটার শুরু মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে। এরপর বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক তৈরি হলো। প্রেম-ভালোবাসা হলো। সে আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে, সে আমাকে ভালোবাসে আর শীঘ্রই আমাকে বিয়ে করবে। সে আমাকে দেখতে চাইল।

আমি না করলাম। সে আমাকে বেশ শাসাল। সম্পর্ক ছিন্ন করল। আমি ভীষণ ধাক্কা খেলাম। বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা মেসেজ লিখে তার সাথে আমার ছবি পাঠালাম। মেসেজ চালাচালি চলল। কলেও কথা বলছিলাম। কিন্তু গোপনে সে সবকিছুই রেকর্ড করছিল। সে আমাকে হুমকি দিল সবকিছু আমার পরিবারের কাছে প্রকাশ করে দেবে!

আমাকে বাড়ি থেকে বের হতে বলল। আমি এ ওয়াদা নিয়ে বের হলাম যে, আমাকে অতি দ্রুত আবার ফিরতে হবে। সে আমাকে ওয়াদা দিল। হ্যাঁ, আমি বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু হায়, যদি আমি না বের হতাম! যদি তার

ওয়াদা বিশ্বাস না করতাম! আমি বাড়িতে এসেছি লজ্জা ও অপমানের সাথে। তার কাছে কাকুতি-মিনতি করলাম, সে যেন আমাকে বিয়ে করে, আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু সে তুচ্ছ করে বলল, 'আমি কোনো নষ্ট মেয়েকে বিয়ে করব না।'

এভাবেই সে ভালোবাসার বিশ্বস্ত যুবক এ যুবতিকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দিল, তার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করল আর নতুন শিকারের খোঁজে চলে গেল।

কেন এসব বাড়ছে?

কারণ, অনেক যুবকের আল্লাহর সাথে সে সম্পর্ক নেই যে, যা তাকে পাপ থেকে বাঁচাবে। যুবকেরা ইবাদতে নেই। কুরআন তিলাওয়াতে নেই। নির্জনে আল্লাহর জিকিরে নেই। যুবক যখন আল্লাহ থেকে বিমুখ হলো, তখন শয়তান তার দোসর হয়ে দাঁড়াল। এভাবে যুবক এগিয়ে গেল সে পথে, যে পথে সে একাকিত্ব লাঘব করতে পারে।

মোবাইলের ক্যামেরা থেকে সাবধান

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভদ্র-সভ্য মেয়ের ভয়ানক গল্প। প্রফেসরের লেকচার শেষ হলে সে খানিক সময়ের তন্দ্রায় চোখ বন্ধ করল নিজের সিটে। পুরো শরীর ঢাকেনি সে। ঢাকার প্রয়োজনও ছিল না, কারণ ক্লাসের সবাই মেয়ে। কিন্তু ষড়যন্ত্র বড্ড মারাত্মক! এক বদ তরুণী মোবাইল হাতে এল। তার অজান্তে ছবি তুলে নিল। এরপর সে ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিল।

একজন নিষ্পাপ নারীর অগোছালো কাপড় পরিহিত অবস্থার ছবি যখন ইন্টারনেটে ছড়িয়ে যায়, তখন সে নিজের বাবা বা স্বামীর সামনে মুখ দেখাবে কী করে?! এ ঘটনার পর তাদের পরিবারে ধস নেমে আসে।

তাই আল্লাহকে ভয় করো! তোমার বান্ধবীর ছবি তুলবে না, ছবি মেমোরিতেও রাখবে না, কাউকে পাঠানোর সাহস তো করবেই না। বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনো রকম ফটোসেশন রাখবে না।

ড. ইবরাহিম মুহাম্মাদ আল-ফায়িজ ফৌজদারি আইন-অনুশাসন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও শরিয়া অনুষদের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি বলেন :

'মুসলিম আলিমদের মধ্যে এ বিষয়ে কেউই মতানৈক্য করেননি এবং সকলেই বলেছেন যে, আরেকজনের শরীরের গোপনীয় স্থান দেখা হারাম; চাই সেটা সরাসরি দেখা হোক বা দরজার ফাঁক দিয়ে বা জানালা দিয়ে বা ডিভাইসের স্ক্রিনে অথবা পানির প্রতিচ্ছবিতে, সবটাই কবিরা গুনাহ।'

এমনকি ফকিহগণ নিষেধ করেছেন যে, অন্যের গোপনীয় কিছু দেখা যায় এমন আশঙ্কা থাকলে জানালা খোলাও নিষিদ্ধ। কারণ, এটা হারামের মাধ্যম হবে। আর যা কিছু হারামের মাধ্যম হয়, সেটাও হারাম। কতক ফকিহ তো এমনও ফতোয়া দিয়েছেন যে, ঘরের পাশে ঘেরা দেওয়ালের যে ফাঁক দিয়ে প্রতিবেশীর গোপনীয় কিছু দেখা যায়, সেসব ফাঁক বন্ধ করে দিতে হবে অথবা প্রতিবেশী বাড়ি করার সময় তার দেওয়ালকে উঁচু করে নেবে; যাতে বাড়ির ভেতরের দৃশ্য বাইরের কেউ দেখতে না পায়।

ফকিহগণ মুয়াজ্জিনদের জন্য সে মিনারের ওপর ওঠা নিষেধ করে দিয়েছেন, যে মিনারে উঠলে আশপাশের বাড়ির নারীদের দেখা যাওয়ার আশঙ্কা আছে, কারণ এটা ضَرَر। আর রাসুল ﷺ ضَرَر থেকে নিষেধ করেছেন।

এবার আসা যাক মোবাইলের ক্যামেরা বা যেকোনো ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ব্যাপারে; চাই নারী রাস্তায় হোক বা বাজারে অথবা বিয়ের হলরুমে কিংবা গাড়িতে বা নদী-সাগরের তীরে বা বেড়ানোর কোনো জায়গায় থাকুক ইত্যাদি কোনো অবস্থাতেই ছবি তোলা যাবে না। এসব জায়গায় যারা ছবি তোলে, তারা তো এ নারীদের মাহরাম নয়। এ রকম ছবি তোলা আর দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে কারও গোপনীয়তায় উঁকি দেওয়া একই রকম হারাম।

বরং মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা আরও বেশি ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। কারণ, এমন ছবি যুবকদের কম্পিউটারে যায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে যায়।

একটি ভিডিও তার জীবনের ধ্বংস ডেকে আনল

ঘটনাটি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর। সবার মাঝে উত্তম চরিত্র ও উত্তম আচরণকারিণী হিসেবে পরিচিত ছিল সে। ঘটনাটি তার মুখেই শোনা যাক :

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসি প্রতিদিনের মতো। হঠাৎ খেয়াল করলাম এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। সে যেন আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমাকে যেন সে চিনে। কিন্তু আমি গুরুত্ব দিলাম না। নিজের গন্তব্য অভিমুখে হাঁটতে থাকলাম। কিন্তু সেও আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। নিচু গলায় বলছিল, 'সুন্দরী, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। অনেক দিন থেকে তোমাকে ফলো করছি। তোমার সচ্চরিতের ব্যাপারে আমার জানা আছে।'

তখন আমি আরও দ্রুত পা চালাতে থাকলাম। আমার পা যেন একটার সাথে আরেকটা জড়িয়ে যাচ্ছিল। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছিল। ইতিপূর্বে কখনো আমি এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। উদ্বিগ্নতা ও হত-বিহ্বলতার মাঝে বাড়িতে এসে পৌছলাম। চিন্তা-ভয়ে সে রাত ঘুম হলো না একটুও।

পর দিনের কথা। আমি দেখলাম, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। আগের মতো প্রতিদিনই সে আমার পিছু নিতে থাকে এবং তার মনের আবেগ মিশিয়ে মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। অবশেষে এ অবস্থা শেষ হয় একটি চিঠির মাধ্যমে। একটা ছোট্ট কাগজ সে আমাদের ঘরের দরজায় ছুড়ে দিয়ে যায়। চিঠিটা নেবো কি নেবো না, তা নিয়ে ইতস্তত করতে করতে একসময় কাঁপা কাঁপা হাতে তা উঠিয়ে নিই।

চিঠিটা পড়লাম। প্রেম-ভালোবাসার কথায় ভরা। তার হৃদয়ের আকুতি মিশিয়ে চিঠিটা লেখা। পড়েই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। অল্প কিছুক্ষণ পরই টেলিফোনের রিং বেজে ওঠে। টেলিফোন তুলে দেখলাম, এ তো সে-ই যুবকই! প্রশ্ন করে বসল, 'চিঠিটা পড়েছ?'

আমি বললাম, 'যদি না শুধরাও, তবে আমার পরিবারকে বলে তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

ঘণ্টাখানিক পর আবার কল দিল সে। আমাকে জানাল, তার উদ্দেশ্য ভালো, সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে বিয়ে করবে, আমার সব চাওয়া পূরণ করবে, তার পরিবারের কেউ বেঁচে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার মন নরম হয়ে গেল। আমি তার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। সব সময় তার কলের অপেক্ষায় থাকতাম। তার সাথে গাড়িতে করে শহরের বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে লাগলাম।

কেন? কেন এমনটা করতে লাগলাম? কারণ আমার মনে হচ্ছিল যে, কেউ যেন আমার ইচ্ছাশক্তি কেড়ে নিয়েছে, আমার চিন্তার ক্ষমতা লুপে নিয়েছে। সে যা-ই বলত, তার সবটা বিশ্বাস করতে লাগলাম। বিশেষ করে এ কথাটা যে, 'অচিরেই তুমি আমার স্ত্রী হবে, আমার একমাত্র স্ত্রী, আমরা একই ছাদের নিচে বসবাস করব, সুখে দিন কাটাব।'

এভাবে সেদিনটি এল। জীবনের সবচেয়ে কালো অন্ধকার দিন। আমার জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ বরবাদ হয়ে গেল। এ দিনও তার সাথে বের হলাম অন্য সব দিনের মতো। আমাকে নিয়ে সে তার ফ্ল্যাটে এল। আমি ফ্ল্যাটে ঢুকে তার সামনে বসলাম। রাসুল ﷺ-এর সে হাদিস ভুলে গেলাম, যেখানে তিনি বলেছেন :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

> 'মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করবে না।'[৭০]

কিন্তু শয়তান আমার অন্তরে জেঁকে বসেছিল। এ যুবকের কথায় আমার অন্তর পূর্ণ করে দিয়েছিল। এরপর জাহান্নামের আজাবের উপযুক্ত গুনাহর কাজটি হলো। আমি তখনও জানি না যে, আমি আসলে এ যুবকের শিকার! আর আমি আমার সবচেয়ে মূল্যবান মর্যাদাটা হারিয়ে বসেছি!

---

৭০. সহিহুল বুখারি : ৫২৩৩, সহিহু মুসলিম : ১৩৪১।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম পাগলের মতো। বললাম, 'তুমি কী করলে এটা?'

- ভয় পেও না, তুমি তো আমার স্ত্রী।

- কীভাবে আমি তোমার স্ত্রী হই, আমাদের তো এখনো বিয়ের আকদই হয়নি।

- খুব শীঘ্রই আকদ করে নেবো।

পাগল অবস্থায় আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। তখন আমার শরীরে আগুন ধরে আছে। আল্লাহ! আমি কী করলাম!? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি!

আমার সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। প্রচণ্ড কেঁদে যাচ্ছিলাম। পড়ালেখা ছেড়ে দিলাম। আমার অবস্থা একেবারে বিপন্ন হয়ে গেল। আমার পরিবারের কেউই আমার এ অবস্থার কথা জানতে পারল না। কিন্তু তখনও আমি তার বিয়ের ওয়াদায় বিশ্বাস করে যাচ্ছিলাম।

দিন কতক গড়াল। সব কটা দিন আমার কাছে পাহাড়ের চেয়েও ভারী হয়ে চাপ সৃষ্টি করে চলল। এরপর কী ঘটল?

যে হঠাৎ ঘণ্টি আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সে টেলিফোনের ঘণ্টি বেজে উঠল। ওপাশে সে লোকটি। বলল, 'একটা জরুরি বিষয়ে দেখা করতে চাই।' আমি হন্তদন্ত করে বের হলাম। ধারণা করলাম যে, সে আমাকে বিয়ের ব্যাপারে বলবে। তার সাথে দেখা হলো। প্রথম দেখলাম, কিছুটা গোমড়ামুখো হয়ে আছে সে। কিন্তু হঠাৎ করে যেন তার একটা কথায় আমার কানে বাজ পড়ল, সে বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাও করো না কখনো। আমরা একে অপরের সাথে এভাবেই জীবন কাটাব। কোনো রকম বাধাহীন, স্বাধীন জীবন।'

আমার অজান্তেই হাত উঠে গেল। কষে একটা চড় মারলাম তার গালে। দেখলাম, তার চোখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন ঠিকরে পড়ছে। বললাম তাকে, 'আমি মনে করছিলাম, তুমি তোমার ভুল শুধরে নেবে; কিন্তু এখন দেখছি, তোমার ভেতরে মূল্যবোধ বলতে কিছু নেই।'

কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত গাড়ি থেকে বের হলাম। সে তখন বলে উঠল, 'এক মিনিট।' দেখলাম, তার হাতে ভিডিওর ক্যাসেট। দুই আঙুলের মাঝখানে একটা ক্যাসেট উঁচিয়ে ধরেছে আর অবজ্ঞার সুরে সে বলছে, 'আমি এ ক্যাসেটের মাধ্যমে তোমাকে ধ্বংস করে দেবো।'

বললাম, 'এটাতে কী আছে?'

সে বলল, 'এসো, ভেতরে এসো, আমরা একসাথে দেখি কী আছে।'

ক্যাসেটের ভেতর কী আছে, তা দেখার জন্য গাড়িতে গেলাম আবার। দেখলাম, সেদিনের হারাম সম্পর্কের পুরোটাই ধারণ করে রেখেছে সে।

আমি প্রচণ্ড রাগে বললাম, 'লম্পট, দুশ্চরিত্র, এ কী করলি তুই!'

সে বলল, 'সেদিন সে রুমে গোপন ক্যামরা ফিট করা ছিল। আমাদের সব চিত্রই ধারণ করেছে এ ক্যামরা। এটা তোমাকে ধ্বংস করার অস্ত্র। তবে যদি তুমি আমার কথা মেনে চলো, আমার ইশারামতো কাজ করো, তাহলে তুমি নিরাপদ!'

আমি চিৎকার করে কাঁদতে থাকলাম। কারণ, বিষয়টা কেবল আমার একার না। এখানে আমার পুরো পরিবারের সম্মানও জড়িয়ে আছে। অবশেষে আমি তার হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। সে আমাকে একের পর এক পুরুষের কাছে পাঠাতে লাগল। আর বিনিময়ে পয়সা কামাতে থাকল। আমি পাপের সাগরে ডুবে গেলাম। আমার জীবন অশ্লীলতায় ডুবে গেল। সবটাই ঘটছিল আমার পরিবারের অগোচরে। তারা এসব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না। কেননা, আমার পরিবার আমার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছিল।

এ ভিডিও মানুষের কাছে ঘুরে ফিরছিল। একদিন তা আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে এসে পৌঁছে। সে আমার বাবাকে বলে দেয়। আমার পুরো পরিবার এটার ব্যাপারে জেনে যায়। পুরো শহর ছি ছি করতে থাকে। আমার বাড়ির লোকেরা যেন লজ্জায় মরে যায়। এদিকে আমি নিজেকে বাঁচিয়ে সকলের চোখের আড়ালে পালিয়ে আসি। পরে জানতে পারি, আমার বাবা ও ভাইয়েরা অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে।

আমি প্রতিশোধ নেবো বলে স্থির করি। একদিন সে লোকটি মারাত্মক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমার রুমে এল। এ সুযোগ হাতছাড়া করা বোকামি। আমি বড় একটা ছুরি দিয়ে তার শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলাম, 'মর, মানুষরূপী শয়তান।' মানবতাকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করলাম। সবশেষে আমার ঠাঁই হলো কারাগারের প্রকোষ্ঠে। এখন আমি লাঞ্ছনায় কাতর হয়ে আছি। লজ্জায় নিজের কর্মের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি।

আমার এ ঘটনা সেসব যুবতির জন্য উপদেশ হিসেবে লিখছি, যাদের মন কারও কথায় গলে গিয়েছে, কারও ভালোবাসাভরা চিঠিতে মন উথলে উঠেছে।

এক তরুণীর চিঠি

এক তরুণীর ঘটনা। জনৈক যুবকের দ্বারা প্রতারিত সে। প্রথমে তার হৃদয় কেড়ে নিল, এরপর তার সম্মানও, আর তার পেটে সন্তান রেখে গেল। তাকে ছেড়ে সে শহর ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। সময় গড়িয়ে গেল। কয়েক বছর পর এ তরুণী তাকে চিঠি লিখে পাঠাল :

তুমি যখন আমাকে ফেলে গেলে, তখন তুমি জানতে যে, আমার মাঝে একটি প্রাণ বেড়ে উঠছে। কিন্তু তুমি পরোয়া করলে না। একবার এদিকে ভ্রুক্ষেপ করারও প্রয়োজন বোধ করলে না। এরপরেও কি আমি তোমাকে ভালো পুরুষ মনে করতে পারি? না, বরং তুমি তো মানুষের কাতারেই পড়ো না। তুমি আমাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিলে যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। কিন্তু তুমি কেবল নিজেকেই ভালোবাসো। তুমি আমার সাথে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে ধোঁকা দিলে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বলেছিলে, 'আমি কোনো দুশ্চরিত্রা নারীকে বিয়ে করব না।' কিন্তু দুশ্চরিতের কাজটা তোমার হাতেই হয়েছে। যদি তুমি না থাকতে, তাহলে আমি দুশ্চরিত্রা হতাম না।

তুমি আমার সম্মান কেড়ে নিলে। আমি তখন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ি, হতবিহ্বল হয়ে পড়ি। যে নারী কোনো পুরুষের স্ত্রী হতে পারে না, কোনো সন্তানের মা হতে পারে না, তার জন্য জীবনের আর কী মানে থাকে! সে তো সমাজে জীবিত থাকতে পারে না।

তুমি আমার জীবনও কেড়ে নিয়েছ। আমি বাবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তুমিই আমার মা-বাবার হত্যাকারী। কারণ, তারা দুজন আমাকে খুঁজে না পেয়ে আমার চিন্তাতেই মরে গেছে। তোমার সাথে আবার জীবন শুরু করব বলে এ চিঠি লিখছি না। তুমি তার যোগ্য নও। আমার এক পা এখন কবরে। জীবনকে বিদায় দেওয়ার মুহূর্তে।

আমি তোমার কাছে এ চিঠি লিখছি, কারণ, আমার কাছে তোমার আমানত তোমার মেয়ে আছে। যদিও তোমার মন থেকে সব দয়া চলে গেছে, তবুও আশা রাখি, তোমার মনে পিতৃত্বের দয়া অবশিষ্ট আছে। তাকে নিয়ে যাও। ঠিকভাবে তাকে মানুষ কোরো; যাতে তাকে সে পরিস্থিতিতে না পড়তে হয়, যে পরিস্থিতিতে তার মা পড়েছে।

নিজেকে জিজ্ঞেস করো

কোনো যুবকের সাথে সম্পর্ক রেখে সে অবস্থায় ঠিকভাবে তুমি নামাজে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে? কুরআন খুলতে পারবে? কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে? এ অবস্থায় রমাদানের রোজা রাখতে পারবে?

এ কথাটা স্মরণে রাখো :

مَن عصى الله وهو يضحك.. دخل النارَ وهو يبكي

'যে হাসতে হাসতে আল্লাহর অবাধ্য হয়,

সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে যাবে।'

সৌন্দর্য ফিকে হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাওয়া বৃদ্ধার দিকে তাকাও, সে তোমারই ভবিষ্যৎ, সেও একদিন তোমার মতোই তরুণী ছিল; কিন্তু বয়স বড় দ্রুত পেরিয়ে গেল, যৌবনের ফুল শুকিয়ে গেল, এখন দুর্বলতাই তার সঙ্গী!

কীভাবে তুমি তোমার জীবন ও যৌবনকে অবহেলায় কাটাতে পারো? তুমি কি রাসুল ﷺ-এর এ বাণী স্মরণ করতে পারছ না :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : .... وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ

'যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, (তন্মধ্যে এক শ্রেণির ব্যক্তি হলো), ওই যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে।'[৭১]

যদিও হাদিসে যুবকের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এ হাদিস যুবতিদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। কোথায় এ ওয়াদার ভাগিদার হওয়া? কেন তুমি তার থেকে দূরে থাকবে?

কখন এমন হবে? কখন কোনো ছায়া থাকবে না? এটা হচ্ছে সেদিনের কথা, যখন সূর্য মানুষের মাথার ওপরে মাত্র মাইলখানেক দূরে থাকবে, মানুষের ঘামে ৭০ হাত দৈর্ঘ্যের দেহ ডুবে যাবে, কারও টাখনু পর্যন্ত, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কেউ নাক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে!

তুমি কী ভাবছ? কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আরশের ছায়ায় জায়গা করতে আগ্রহী তুমি?

---

৭১. সহিহ মুসলিম : ১০৩১।

নবম অধ্যায়

ফ্রি-মিক্সিং

এ কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো যে, স্বাধীনতা, সকল বাধার দেয়াল ভেঙে দেওয়া, সব রকম বলয় ভেঙে দেওয়া, ফ্রি-মিক্সিংয়ের প্রসার ঘটানো—এ সবই দ্বীনবিরোধী, অনিষ্টতার পথ উন্মুক্ত করা, খাল কেটে কুমির আনা। এ সবই হচ্ছে তাদের পাতানো জাল। তারা চায় মেয়েরা পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসুক আর তারা ঘণ্টা কি ঘণ্টাদুয়েকের জন্য উপভোগ করুক। এরপর তারা রাস্তার পাশে সেভাবে তোমাকে ফেলে দেবে, যেভাবে আধখাওয়া এঁটো খাবার ফেলে দেয়।

এরপরও যদি কোনো পুরুষ তোমাকে বিয়ে করে নেয়, সে চাইবে তুমি যেন কেবল সচ্চরিত্রের, পর্দানশীন মেয়েদের সাথে চলাফেরা করো। কারণ, সে তোমাকে যেখান থেকে, যেসব মেয়েদের থেকে বেছে নিয়েছে, তাদের দুশ্চরিতের সম্পর্কে সে ভালো করেই জানে।

যারা দাবি করে যে, ফ্রি-মিক্সিং হয়ে গেলে কামনাবাসনা থাকে না, মানুষের মন ঠিক হয়ে যায়, যৌন কামনার পাগলামি কমে যায়। তাদের দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য ইউরোপ-আমেরিকার যেকোনো দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই যথেষ্ট।

যারা তাদের দাবির অসারতা বিশ্বাস করতে দ্বিধায় আছ, তারা তাদের দেশের যৌন লিপ্সার বেহাল দশা, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি দেখলেই যথেষ্ট হবে। ফ্রি-মিক্সিং মানে হচ্ছে কোনো তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি সাগরের নোনা পানি খেল, তখন তার পিপাসা বাড়ে বৈ কমে না, সে আরও বেশি তৃষ্ণার্ত হতে হতে পাগলপ্রায় হয়ে যায়।

পৃথিবীর বুকে কি আত্মমর্যাদাবোধ আছে?

মোরগ যখন দেখে তার মুরগীর ওপর অন্য মোরগ আসছে, তখন সে আত্মমর্যাদাবোধের চেতনায় তাকে আঘাত করে আর তার মুরগীকে রক্ষা করে। অথচ আরব দেশের সাগরতীরে অনেক মুসলিম পুরুষকে দেখি, তাদের মধ্যে কোনো রকম গাইরতই নেই, তাদের স্ত্রীদেরকে ভিনদেশিরা দেখছে, তাদের চেহারা দেখছে, তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখছে, এমনকি শরীরের পুরোটাও!

ক্লাবে ও নাইট আউটে মুসলিম পুরুষেরা ভিনদেশিদের দিকে তাদের স্ত্রীদের এগিয়ে দেয় তাদের সাথে নাচানাচি করার জন্য, তারা এটাকে তেমন খারাপ কিছু মনে করে না!

মুসলিম দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় মুসলিম যুবকরা যুবতিদের সাথে বসে আছে, যুবতিরা তাদের চেহারা খুলে আছে, শরীরের বিভিন্ন জায়গা খুলে রেখেছে। এমন অবস্থা দেখেও তাদের মুসলিম বাবা-মা বিব্রত হন না!

মুখ খোলা স্ত্রী তার স্বামীর বন্ধুকে বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছে, রাস্তায় দেখা হলে অভিবাদন জানাচ্ছে। যুবতি তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া যুবকের সাথে করমর্দন করছে, অথবা একসাথে পথ চলছে। তারা জাস্ট ফ্রেন্ডস। পরীক্ষার জন্য একে অপরের নোট নিচ্ছে। গ্রুপ-স্টাডি চলছে।

এসব যুবতি ভুলে গেছে যে, আল্লাহ তাকে নারী বানিয়েছেন আর ওকে বানিয়েছেন পুরুষ, নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি আকর্ষণ দিয়েছেন। তাদের কেউই, এমনকি পৃথিবীর কেউই আল্লাহর সৃষ্টির এ নিয়ম পাল্টাতে পারবে না, নিজেদের মধ্য থেকে এ আকর্ষণকে মুছে দিতে পারবে না।

সমতার কথা যারা বলে, যারা সভ্যতার নামে ফ্রি-মিক্সিংয়ের কথা চাউর করে, তারা তো কেবল নিজেদের শারীরিক চাহিদাকে নির্বাপণ করাতে চায়, নিজেদের আকর্ষণের মনোবৃত্তি পূরণ করতে চায়। কিন্তু তারা নিজেদের মনের কথা জোরে বলতে পারে না; তাই তারা এমন কিছু পরিভাষার পোশাক পরিয়ে পসরা সাজিয়েছে, যার পেছনে তাদের সে লিপ্সাই কাজ করছে। তাদের সেসব

পরিভাষা হচ্ছে, 'প্রগতি, সংস্কৃতি, ফ্যাশন, সভ্য জীবন, অভিনয়, ইউনিভার্সিটি লাইফ, শহুরে জীবন, স্পোর্ট স্পিরিট, স্টারস প্রভৃতি।'

তারা বলে ফ্রি-মিক্সিং কামনাবাসনাকে কমিয়ে দেয়, চরিত্র ঠিক করে দেয়, মন থেকে যৌনলিপ্সা দূর করে দেয়। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো।

ওয়েস্টার্ন ট্র্যাডিশনের আড়ালে

পশ্চিমাপন্থীরা নারীদের ওপরে পশ্চিমাদের অনুসরণকে আবশ্যক করে দিতে চায়। আর এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে, মূল্যবোধ বিলুপ্ত হবে, বিশেষ করে দ্বীন থেকে বিমুখ হবে মানুষ, তা ছাড়া ফিতরাতও বিকৃত হয়ে যাবে, সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাবে মানুষ, যে সঠিক পথ দিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, আসমানি কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে সঠিক পথের বর্ণনা দিয়েছেন, যেদিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন।

তারা চায়, মুসলিম নারী যেন পশ্চিমা নারীর অনুসরণ করে বিঘতে বিঘতে, প্রতি পদে পদে। যেমনই হাদিসে এসেছে, (حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ) 'এমনকি যদি তারা গুইসাপের গর্তেও ঢুকে পড়ে, তবে তোমরাও (তাদের পিছু পিছু) তাতে ঢুকে পড়বে।'[৭২] যদিও গুইসাপের গর্ত আঁকাবাঁকা, গন্ধে ও অস্বস্তিতে ভরা, সংকীর্ণ হোক; তবুও যদি পশ্চিমা নারীরা এ গর্তে ঢুকে পড়ে, তবে তাদের পিছু পিছু মুসলিম নারীরাও ঢুকে পড়বে। এ গুইসাপের আরেক নাম হচ্ছে 'ফ্যাশন'। বলা যায় গুইসাপের প্রায়োগিক নাম 'ফ্যাশন'। যখনই ফ্যাশন নামে কিছু আসে, তখনই যেন নারীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

এসব পশ্চিমাপন্থীরা পশ্চিমের নারীদের অনুসরণের বহু কিচ্ছা গায়, তবে একটা বিষয় জেনেও না জানার ভান করে থাকে যে, আজকে পশ্চিমা নারীরা কোন বিষয়ে অভিযোগ করছে! ফ্রি-মিক্সিং ও ফ্যাশন আজ নারীদের কোন পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছাল, পুরুষদের কী পরিণতি করল, পরিবারের কী হাল করল, সমাজের কী অবস্থা কী করল, সেটা নিয়ে কখনো মুখে টুঁ শব্দটিও করবে না এরা। পশ্চিমা সমাজের বিশৃঙ্খলার স্তূপে একটা অংশ আরেকটা

৭২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৯৪।

অংশকে জবাব চাওয়ার সে চিৎকারে নিজেদের কানে তালা লাগিয়ে রেখেছে, ফ্রি-মিক্সিংয়ের ভয়াবহতায় বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের লেখায়, চিন্তাবিদের সতর্কীকরণে তাদের কিছু যায় আসে না।

এ মানুষগুলো ভুলে যায় যে, সব জাতির নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। রয়েছে মূল্যবোধ ও আনুগত্যের স্তর। আর একটা ধসে যাওয়া সমাজ থেকে শিক্ষা না নিয়ে আরেকটা সমাজকে সে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করা কোনোভাবেই সঠিক নয়।

বাড়িতে পুরুষ ও নারী

ড. মুহাম্মাদ বিন লুতফি আস-সাব্বাগ বলেন :

'আজকাল ধনীদের মধ্যে একটা প্রচলন রয়েছে, বাড়িতে পুরুষদের মাধ্যমে খিদমত নেওয়া হয়, পুরুষ সেবকরা বাড়ির ভেতরের কাজগুলো দেখে। ফলে বাড়ির নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা হয়ে যায়।

বাড়ির কর্তা কর্মস্থলে কিংবা কোনো কাজে বাইরে গেলে তার স্ত্রী কর্মোদ্যম ও জৈবিকতায় ভরা যুবক সেবকের সাথে বাড়িতে একা থাকে। কখনো কখনো বাড়িতে দুজনের মাঝে আর কেউই থাকে না। আর এ নারী সেবকের সাথে পর্দাও করে না। তাদের দুজনের মধ্যে কোনো বাধা থাকে না। এ নারী সেবককে আদেশ দেয়, নিষেধ করে, বিভিন্ন কাজ করায়; আর সেও তার আদেশে কাজ করতে থাকে। কিন্তু শয়তান তো আদম-সন্তানের রগে রগে চলাচল করে। যখন দুজন নারী-পুরুষ একাকী থাকে, তখন সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে, সে হচ্ছে শয়তান। শয়তান পুরুষকে নারীর প্রতি, নারীকে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দিতে থাকে, এভাবে একসময় তারা দুজন অপরাধে লিপ্ত হয়।

দেখা যায় সেবক সুদর্শন হয়, পক্ষান্তরে স্বামী বয়স্ক বা খারাপ বা দুর্বল বা বদমেজাজি ঝগড়াটে হয়। যদি উভয়পক্ষের মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকে, তাহলে পরিণতি কেমন হতে পারে?

কুরআনুল কারিম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছে যখন নবি ইউসুফ ﷺ বাদশাহর বাড়িতে ছিলেন, তখন কেমন ধোঁকাময় ফিতনার শিকার হতে হয়েছে তাঁকে। যদি আল্লাহ তাঁকে রক্ষা না করতেন, তাহলে অবস্থা বড়ই ভয়ংকর হতো।

তেমনিভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসারীরা আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ কর্তৃক হারামের সীমানা লঙ্ঘন করে, এমন অনুসারীর স্ত্রী তার স্বামীর বন্ধুকে স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বাগত জানায়, তাকে বাড়িতে এসে বসতে দেয়, তার সাথে বসে, খোশ আলাপ করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শরিয়তে এমন নির্জন আলাপ নিষিদ্ধ। বন্ধু ও স্ত্রীকে বিশ্বাস করার দলিলে এমন শিথিলতা দেখানো জায়িজ নয়। এরচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে, নারীর একাকী ভ্রমণে যাওয়া, অথবা ড্রাইভার বা বাড়ির সেবকের সাথে বাইরে বের হওয়া। তেমনই নারীর একা ডাক্তারের কাছে যাওয়া এবং একাকী নির্জনে ডাক্তারের সাথে বসাও মারাত্মক ও নিষিদ্ধ।

এমনই আরেকটি ভুল হচ্ছে, একজন স্বামী তার স্ত্রী অথবা একজন বাবা তার মেয়েকে গাড়ির চালকের সাথে একাকী ছেড়ে দেয়। এরপর সে চালককে নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যায়। গাড়ির ভেতরে তাদের মধ্যে কেমন কথা হয়, সেটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

এমনিভাবে ফ্যামিলি গেট-টুগেদার, যে নামে তারা এটাকে ডাকে, এখানে নারী-পুরুষ সকলে একত্রিত হয় সবচেয়ে সুন্দর করে সেজে-গুজে আসে, এখানে পর্দার কোনো বালাই থাকে না, সবাই একে অপরের বন্ধু এ দলিলের ভিত্তিতে ফিতনার দরজা খুলে যায়। এসব গেট-টুগেদারে নিকৃষ্ট কথোপকথন চলে, চলে নিকৃষ্ট কৌতুক ও হাসি-তামাশা। কখনো একজন আরেকজনকে আঘাত করেও কথা বলে—যার কোনোটারই আল্লাহ তাআলা অবকাশ দেননি। অবশেষে এমন গেট-টুগেদার সে পরিবারে ভাঙন ধরায়, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বদলে ঘৃণা তৈরি হয়।'

কীভাবে একজন মুত্তাকি মুসলিম ব্যক্তি তার স্ত্রী বা মেয়েকে একজন অপরিচিত গাইরে মাহরাম লোকের সাথে একাকী ছেড়ে দিতে পারে?!

ড. মুহাম্মাদ বিন লুতফি আস-সাব্বাগ বলেন :

'হ্যাঁ, এটা সত্য যে, নারী কর্মক্ষেত্রে যেতে পারে। কিন্তু এখানে কাজের ক্ষেত্রে শরিয়তের সব বিধি-নিষেধ মানতে হবে। যেমন : নারী-পুরুষের একই কর্মক্ষেত্র হতে পারবে না, হারাম মেলামেশা হতে পারবে না, নারী পুরুষের সাথে একাকী নির্জনে বসতে পারবে না, কর্মক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফিতনার আশঙ্কা থাকতে পারবে না, এমন কাজ হতে পারবে না—যেখানে নারীকে পুরুষদের সাথে কথা বলতে হয়, কাজের জন্য নারীকে পুরুষের মন ভোলানোর জন্য নরম সুরে কথা বলতে হয়। আর নারীকে অবশ্যই হিজাব ও পর্দা করতে হবে।'
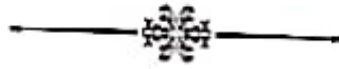
দশম অধ্যায়

প্রকৃত ভালোবাসা

যারা আমাদের ভালোবাসে, তাদের সাথে কেমন আচরণ করব আমরা?

নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে বেড়ানোদের কথায় বিশ্বাস কোরো না। তাদের একটা প্রচলিত স্লোগান হচ্ছে, 'বিয়ের আগে প্রেম করা প্রয়োজন, না হলে বুঝবে কী করে যে, তোমার সঙ্গী ভালো না মন্দ?' এসব কথা অন্তঃসারশূন্য। প্রকৃত ভালোবাসা কেবল বিয়ের পরে হতে পারে। ভালোবাসা কী? যারা আমাদের ভালোবাসে, তাদের সাথে কেমন আচরণ করব আমরা?

'ভালোবাসা আকর্ষণ ও অনুভূতির ব্যাপার। এটা কারও নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তাই শরিয়ত এটার ব্যাপারে হারাম বা ওয়াজিব বা মাকরুহের হুকুম দেয় না। শরিয়তদাতা মহান আল্লাহ তাআলা তোমাকে বলেন না যে, তুমি ভালোবাসতে পারবে না। বরং তোমার প্রতি আদেশ হলো, তুমি ভালোবাসতে গিয়ে বিচ্যুতির পথে যাবে না। আল্লাহ তোমাকে বলেন না যে, তুমি অপছন্দ কোরো না। বরং তোমার প্রতি নির্দেশ হলো, অপছন্দ করলেও জুলুম করবে না। আল্লাহ বলেন না যে, তুমি মনের চাহিদামতো খাবার খেও না। বরং তোমার প্রতি আদেশ হলো, যখন খাবার খাবে, তখন অপচয় করবে না।'

কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময় কী দেখি? কিছু লম্পট যুবক যুবতিদের নরম স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তার ওপর তার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে তাকে ছেড়ে আরেকটা যুবতির খোঁজে চলে যায়।

যুবক-যুবতিদের এমন অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে, তাদের মন-মগজে ভালোবাসার সে অর্থটা প্রোথিত হয়ে গেছে, যে অর্থটা তারা রোমান্টিক গল্পে পড়েছে অথবা রোমান্টিক সিনেমাতে দেখেছে; অথচ এসব গল্প ও সিনেমা কেবলই ভোগাস। এগুলোতে যেটা দেখানো হয়, সেটা হচ্ছে যৌনতা। ভালোবাসার বাস্তব অর্থ থেকে এসব শত ক্রোশ দূরে।

এসব গল্প ও ফিল্ম সেসব যুবক-যুবতিকে পথভ্রষ্ট করে, যারা ভালোবাসার মূল্য জানে না। তাই এদেরকে ভালোবাসার নামে ধোঁকা দেওয়াও সহজ হয়ে যায়।

যখন কেউ তার আত্মার আবেগ ও আকর্ষণ আর শরীরের প্রবৃত্তি ও কামনাবাসনার মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, তখন শেষে সে জানোয়ারে পরিণত হয়।

আমরা কি দেখেও দেখছি না যে, প্রতিদিন কত যুবক সহজ সরল যুবতিদের নরম নরম কথার মাধ্যমে ঘায়েল করছে। এরপর যখন যুবতি বুঝতে পারে যে, সে তো আসলে ওই যুবকের কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়েছে, তখন সেসব কথা ধোঁয়া হয়ে যায় আর যুবতি নিজেকে যুবকের জালের শিকার হিসেবে আবিষ্কার করে। যে জালটার নাম যুবক দিয়েছিল 'ভালোবাসা'। কিন্তু আদৌ কি তুমি জানো ভালোবাসা কী?

বর্তমানে যে জিনিসকে ভালোবাসার নাম দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি আদৌ ভালোবাসা না যৌনতা?

এটা ভালোবাসা নয়

তারা যেটাকে ভালোবাসা বলে, সেটা ভালোবাসা নয়; বরং সেটা হলো যৌনতা। যৌনলিপ্সাকে ভালোবাসার নামের আবরণ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে যুবতি শিকার। শিকার করে যুবক নামের হিংস্র নেকড়ে। এ নেকড়ে প্রথমে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার পোশাক পরে আসে। এরপর সুযোগ পেলে তার আসল চেহারা দেখা যায়। সে দাঁত বের করে হিংস্রতা দেখাতে শুরু করে শিকারকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়, নিজের বাসনা চরিতার্থ করে তাকে ফেলে যায়। আর তখন যুবতি নিকৃষ্টতর হয়ে যায়!

যে যুবক মধুর কথা বলছে, স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতির মালা গাঁথছে, ডাবল মিনিং সাক্ষাতের আশায় রয়েছে, সে হচ্ছে আসলে একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে, যে তোমাকে একবারে শেষ করে দিতে চায়, নিজের কামনাবাসনা চরিতার্থ করে এরপর তোমাকে স্রেফ হাড়সর্বস্ব করে রেখে যেতে চায়। তখন তুমি বসে বসে নিজের ভাগ্যকে দুষতে থাকবে, কেঁদে কেঁদে অসাড় হবে!

আল্লাহ তাআলা কুরআনের যত আয়াত নাজিল করেছেন, সব আয়াতের পেছনেই হিকমত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'আর ইমানদার নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার কাপড় দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে রাখে। এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না

করে। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[৭৩]

তুমি কি তোমার দৃষ্টি অবনত রাখো? তুমি কি তোমার রবকে ভয় করো? পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় তুমি কি কর্কশ সুরে কথা বলো, না নরম সুরে মনগলানো কথা বলো?

তুমি রাসুল ﷺ-এর হাদিস শোনোনি? রাসুল ﷺ জিনা সম্পর্কে বলেন :

كُتِبَ علي ابنِ آدَمَ نَصيبُه مِنَ الزِّنى، مُدرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحالَةَ، فالعَينانِ زِناهُمَا النَّظَرُ، والأُذُنانِ زِناهُمَا الاستِماعُ، واللِّسَانُ زِناه الكَلَامُ، والَيدُ زِنَاهَا البَطشُ، والرِّجلُ زِنَاهَا الخُطى، والقَلبُ يَهوَى ويَتَمَنَّى، ويُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرجُ ويُكَذِّبُه

'আদম-সন্তানের জন্য তাকদিরে জিনার অংশ যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। দুচোখের জিনা হচ্ছে (হারাম জিনিসের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা, দুকানের জিনা হচ্ছে (যৌন উদ্দীপ্ত কথা) শোনা, জিহ্বার জিনা হচ্ছে (যৌন উদ্দীপ্ত) কথা বলা, হাতের জিনা হচ্ছে (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা, পায়ের জিনা হচ্ছে জিনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং অন্তরের জিনা হচ্ছে সেটার ইচ্ছা ও আশা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যে পরিণত করে অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।'[৭৪]

যে তার চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পায়ের মাধ্যমে জিনা করে যাচ্ছে, অতি দ্রুত তাকে শয়তান আসার সবকটি জায়গা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ, তার মাঝে ও প্রকৃত জিনার মাঝে মাত্র একটা স্তরই অবশিষ্ট আছে।

তুমি কি ছাদের দরজা বন্ধ করে চোর আসার আশঙ্কা শেষ করবে না? চোর এলে তো তোমার জীবনের ফুলকে বিমর্ষ করে দেবে, তোমার যৌবনের

---

৭৩. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।

৭৪. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ১৩৬৪০।

সৌন্দর্য কেড়ে নেবে, তোমার সম্মান ও নিষ্কলুষতা কেড়ে নেবে, আর তোমাকে রেখে যাবে দুঃখ ও উদ্বিগ্নতার সাগরে, শাস্তি ও লাঞ্ছনার মাঝে! কিছু সময়ের উপভোগে বহু বছরের লাঞ্ছনা!

যদি কোনো যুবক সত্যিই মন থেকে তোমাকে চায়, তবে সে তোমার পরিবারের দরজায় কড়া নাড়বে, সঠিক পন্থায় তোমাকে চাইবে। এটাই হালাল উপায়, এটাই একমাত্র পথ, যা সফল হয়। অন্যসব বিফল ও লাঞ্ছনাময়।

জনৈক লোক বলেন, 'ভালোবাসার কত ধরন! কেউ সন্তানদের ভালোবাসায় বাঁধা পড়ে যায়। কেউ বোকার মতো ভালোবাসার ফাঁদে পাপ করে। কেউ নশ্বর কিছুকে ভালোবাসে, তাকে রোগী বলা চলে। কেউ ভালোবাসে ভবিষ্যতের চিরস্থায়িত্বকে, যেখানে নবিগণ ও সিদ্দিকগণ তার সঙ্গী হবে।'

আর মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে...

এ আয়াতের শানে নুজুল জানো তুমি?

ইবনে আবি হাতিম বলেন, 'আসমা বিনতে মারসাদ তার এক খেজুর বাগানে ছিলেন। কতক নারী তার কাছে প্রবেশ করতে শুরু করে, তাদের পোশাকের নিম্নাংশ ছিল না, যার কারণে তাদের পায়ের গহনা দেখা যাচ্ছিল, তাদের বুক দেখা যাচ্ছিল, মাথার চুল দেখা যাচ্ছিল। তখন আসমা বলতে লাগলেন, "এ দৃশ্য কত কদর্য!" এরপর আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) আয়াতটি।

ইবনে মারদুবিয়্যাহ আলি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, 'এক লোক রাসুল ﷺ-এর যুগে মদিনার এক রাস্তা ধরে যাচ্ছিল। তখন এক নারীর দিকে তাকাল সে, নারীও তার দিকে তাকাল। শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, তারা পরস্পরের এ তাকানোর ফলে একে অপরকে পছন্দ করে ফেলল। লোকটা সে নারীর দিকে চোখ রেখে হেঁটে চলছিল, হঠাৎ একটা দেয়াল সামনে পড়ল এবং বাড়ি খেয়ে তার নাক ভেঙে গেল। সে বলল, "আল্লাহর কসম, আমি আগে রাসুল ﷺ-কে এ বিষয়ে বলব, এরপর নাকের রক্ত মুছব।"

সে রাসুল ﷺ-এর কাছে সবটা খুলে বলল। রাসুল ﷺ বললেন, "এটা তোমার পাপের শাস্তি।"

তখন আল্লাহ নাজিল করলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবেই অবগত।"'[৭৫]

ইবনে জারির বলেন, 'হাজরামি বর্ণনা করেন, এক নারী রুপার তৈরি দুটো পায়ের মল (গহনা) নিল। পায়ে পরে সে এক কওমের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল আর তখন তার পায়ের মল আওয়াজ করছিল। এরপর আল্লাহ নাজিল করলেন :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা-সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"'[৭৬]

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

'তারা যেন তাদের মাথার কাপড় দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে রাখে।'[৭৭]

এখানে الضرب শব্দের অর্থ ঢেকে দেওয়া, পরিধান করা। خُمُر হলো خِمَار শব্দের বহুবচন, অর্থাৎ যা দিয়ে নারী মাথা ঢাকে। جُيُوب শব্দটি جَيْب শব্দের বহুবচন। এটা হচ্ছে যে কাপড় দিয়ে গলার আশপাশের অংশ ঢাকা হয়, বাংলায় যেটা ওড়নার মতো।

---

৭৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩০।
৭৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
৭৭. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।

একটু আগে যে ঘটনায় এক লোকের নাক ফেটে রক্ত বেরিয়েছিল, এটা ছিল গাইরে মাহরাম নারীর দিকে তাকানোর শাস্তি। রাসুল ﷺ বলেছিলেন, 'এটা তোমার পাপের শাস্তি।'

খেয়াল করলে দেখবে, কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা মুমিনকে তার পাপের শাস্তি সেদিনই দিয়ে দেন, যেদিন সে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, এ শাস্তির প্রভাব নিজের মাঝে অথবা স্ত্রী-সন্তানদের আচরণে দেখা যায়। যেমনই জনৈক নেককার বলেছেন, 'আমি যদি কোনো গুনাহ করে ফেলি, তবে সেটা আমার স্ত্রীর আচরণে ও বাহনের আচরণের মাধ্যমে বুঝে ফেলি।'

অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, শয়তান মানুষকে নেক সুরতে পাপ পরিবেশন করে থাকে। এ বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এটা যে, আমাদের পিতা নবি আদম ﷺ-কে শয়তান বলেছিল :

أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

> 'আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা, যা কোনো দিন ক্ষয় হবে না?'[৭৮]

আদম ﷺ সরল মনে তার কথা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন।

---

৭৮. সুরা তহা, ২০ : ১২০।

একাদশ অধ্যায়

বিয়ের প্রস্তাব

যুবকের বিয়ের প্রস্তাব

অনেক যুবক একজন ইমানদার পূতপবিত্র যুবতি খোঁজে বিয়ে করে ঘর-সংসার করার জন্য। কিন্তু কিছু যুবতি বিয়ের প্রস্তাবদাতা যুবকের প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধায় পড়ে যায়। কারণ, এ যুবতি ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে একজন সুদর্শন, ধনী, শিক্ষিত ইত্যাদি গুণসম্পন্ন যুবক তার জীবনসঙ্গী হবে।

দাম্পত্য জীবনে সফলতার জন্য এ গুণগুলোর কতটুকু ভূমিকা রয়েছে?

উসতাজ মুহাম্মাদ রশিদ আবিদ তার 'লাহজাতুন ইয়া বানাত' বইতে এ ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন :

ধনাঢ্য হওয়া কি আবশ্যক?

অবশ্য একজন যুবতির এতটুকু অধিকার আছে যে, তাকে বিবাহকারী যুবক অবস্থা বিবেচনায় একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মাসিক অর্থের যোগান দিতে পারে। কিন্তু যুবতি যেন কোনোভাবেই অর্থকে দ্বীন ও চরিত্রের ওপর প্রাধান্য না দেয়। যদি স্বামী দ্বীন-ধর্মহীন ও চরিত্রহীন হয়, তাহলে কারুনের সমান সম্পদ দিয়েও বা কী হবে?!

মনে রাখবে, আল্লাহ হলেন রিজিকদাতা। কত যুবক মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন ছিল, কোনো যুবতি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ও তার এ কম অর্থের জীবনকে

আপন করে নিয়েছে—এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে রিজিক বাড়িয়ে দিলেন এবং সে বিত্তবান হয়ে গেল।

আবার কত যুবকের টাকা-পয়সা দেখে যুবতি তাকে বিয়ে করল—বিয়ের পর সে টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেল!

এ জন্য টাকার পরিমাণ নয়; বরং আয়-উপার্জনের উৎসটা দেখো। সে কি হালাল পথে উপার্জন করছে, না হারাম পথে? যার সম্পদ হারাম পন্থায় উপার্জিত হয় অথবা যে অন্যের সম্পদ মেরে খায়, সেসব সম্পদ স্থায়ী নয়।

বৈবাহিক সফলতার ক্ষেত্রে পেশা কোনো ভূমিকা রাখে কি?

কত যুবতি মনে মনে স্বপ্ন লালন করে রেখেছে যে, তার স্বামী ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বা বড় অফিসের বস হবে। কারণ যুবতির ধারণা, এমন কেউ তার সব আশা ও আহ্লাদ মেটাতে পারবে, সুখের জীবন দিতে পারবে তাকে।

অবশ্য যুবতি স্বামী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এক পেশার ওপর আরেক পেশাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে, তবে এ শর্তে যে, তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে, সৌভাগ্যময় ও সুখী জীবন আল্লাহ তাআলাই দেন, পেশা কখনো সুখী জীবন নিশ্চিত করতে পারে না।

তাই তুমি কখনো পেশাকে সবার আগে দেখবে না। সবার আগে গুরুত্ব দেবে বিয়ের প্রস্তাবদাতার দ্বীন, চরিত্র, তাদের পরিবেশ ঠিক আছে কি না। এরপর দেখবে তার পেশা। এমন হাজারো দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে গেছে স্বামীর পেশার কারণে; যদিও স্ত্রী তার পছন্দসই পেশার পাত্রকেই বিয়ে করেছিল।

বৈবাহিক সফলতার জন্য কি পাত্র সুদর্শন হতে হবে?

একজন তরুণী যাকে বিয়ে করবে, তার শারীরিক গড়নে সন্তুষ্ট হতে হবে। নারীর সৌন্দর্যের মাঝে ও পুরুষের সৌন্দর্যের মাঝে পার্থক্য আছে। কারণ, কোনো যুবতি সৌন্দর্য হিসেবে দেখে স্বামীর লম্বা হওয়াকে, আবার কেউ সৌন্দর্য হিসেবে দেখে পুরুষের কাঁধ চওড়া হওয়াকে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পাত্রের যেমন পছন্দ থাকে, তেমনই পাত্রীরও পছন্দের ব্যাপার থাকে। যেমনটি উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেছেন, 'তোমরা অসুন্দর লোকের কাছে জোর করে যুবতিদের বিয়ে দিয়ো না। কেননা, পাত্রের যেমন পছন্দ থাকে, তেমনই পাত্রীরও পছন্দের ব্যাপার থাকে।'

তাই আলিমগণ বলেছেন, পাত্র যেমন পাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাবের সময় দেখবে, তেমনই পাত্রীও পাত্রকে দেখে নেবে যে, পাত্র পছন্দ হয় কি না। বরং এ ক্ষেত্রে পাত্রীর দেখাটাই বেশি প্রয়োজন। যেমনটি ইবনে আবিদিনের পাদটীকায় এসেছে, 'বরং বিয়ের প্রাক্কালে দেখাদেখির সময় নারী পুরুষের চেয়ে অধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কারণ, পুরুষ যাকে পছন্দ করে না, তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে; কিন্তু নারীর সে অধিকার থাকে না।'

অর্থাৎ পুরুষ চাইলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, আর সে জন্য তাকে কোনো কারণ উল্লেখ করতে হবে না; কিন্তু নারী তা পারবে না। এ জন্য যারা পাত্রীর সম্মতিকে গুরুত্ব দেয় না, তারা আসলে ভুলের মধ্যে রয়েছে।

তবে মনে রাখবে, তোমার স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আগে দেখবে তার মধ্যে দ্বীনধর্ম ও চরিত্রের কতটুকু আছে, এরপর দেখবে তার আর্থিক অবস্থা কেমন, সে তোমার আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম কি না, এরপর আসবে সৌন্দর্যের বিষয়। কিন্তু অনেক মেয়ে আছে, সবকিছুর আগে সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়ে ভুল করে। এমন নারীদের কাছে সৌন্দর্যটা মুখ্য, দ্বীনধর্ম-চরিত্র গৌণ!

স্বামী-স্ত্রীর পড়ালেখা এক সমান হওয়া কতটা জরুরি?

যদি স্বামী-স্ত্রী পড়ালেখায় এক সমান হয় অথবা কাছাকাছি হয়, তাহলে সাধারণত কোনো সমস্যা থাকে না। কিন্তু সমস্যা হয় তখন, যখন স্বামীর চাইতে স্ত্রীর পড়ালেখার স্তর বেশি হয়। বিশেষ করে যদি এটা নিয়ে স্ত্রী অহংকারে ভোগে অথবা এটা নিয়ে কোনো সময় স্বামীকে খোঁচা দেয়।

মনে রাখবে, পড়ালেখার স্তর সমান হওয়া না-হওয়া মুখ্য বিষয় নয়। কারণ পড়ালেখা ও চারিত্রিক পরিপক্বতা দুইটা ভিন্ন বিষয়। এমন অনেক মানুষ আছে, যার পড়ালেখা সাধারণ স্তরের; কিন্তু তার চরিত্র খুবই উন্নত। আবার

এমনও আছে যে, যার পড়ালেখা উচ্চ স্তরের; কিন্তু তার চরিত্র, তার চিন্তাভাবনা ও কর্মের অবস্থা সাধারণ স্তরের।

পাত্র-পাত্রী একই রকম স্বভাবের হওয়া জরুরি কি না?

যুবতি দেখল পাত্র দ্বীনদার, সম্পদশালী, সুন্দর, ভালো পরিবারের। ফলে যুবতি বিয়ের জন্য হ্যাঁ বলল। বিয়ে হলো। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না দেখে হঠাৎ করে সবাই চমকে উঠল। বনিবনা না হওয়ার কারণ কী? দ্বীনদারিতে দুজনে সমান, সামাজিক অবস্থাও সমান, সব দিক থেকে সমান, তারপরেও সমস্যা কোথায়?

আসল কথা হচ্ছে, দুজনের স্বভাব দুরকমের। যুবতি মানুষের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের আনন্দ ও উৎসবে যোগ দেওয়াকে পছন্দ করত; কিন্তু স্বামী তার উল্টো, স্বামী একা থাকতে, মানুষের ভিড় পরিহার করে শান্তভাবে বাড়িতে থাকতে পছন্দ করে।

স্ত্রী চাচ্ছে তার বান্ধবী, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করতে; কিন্তু স্বামী চায় তার স্ত্রী বাড়িতে তার খেয়াল রাখবে, সন্তানদের খেয়াল রাখবে।

তাই পাত্রীকে বলা হয় যুবকের আগ্রহের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে, পাত্রী পাত্রের আগ্রহ ও স্বভাব ধীরে ধীরে জেনে নেবে। পাত্রকেও একই কাজ করার উপদেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু উভয়ের জেনে নেওয়া উচিত যে, যখন বড় বিষয়গুলো একরকম—যখন দ্বীন, চরিত্র, সৌন্দর্য, ভালো পরিবার হওয়ার মতো বিষয়গুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এ বিষয়ে উভয়ে উভয়েরটা মেনে নেয়, তখন স্বভাবের ভিন্নতায় বৈবাহিক সম্পর্ককে বিচ্ছেদে পরিণত করা উচিত নয়।

চিন্তার মুহূর্ত

বিয়ে হওয়ার সময়টা আনন্দঘন হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা গেল বিয়ের আকদ হওয়ার পর দায়িত্ব নেওয়ার ভয় ও অপরিচিত লোকের সাথে ঘর করার ভয় উঁকি দেয়, কিছুটা সময় চিন্তায় ও হতভম্বতায় কাটে, নেতিবাচক চিন্তার কারণে অস্থিরতা বাড়ে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> 'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারো আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'[৭৯]

'সাকিনা', 'ভালোবাসা', 'দয়া'—এ চিরস্থায়ী শব্দাবলিকে জীবন বানাও, তাহলে তোমার অন্তরের ভেতরে নিরাপত্তা ও শান্তির আবাস হবে।

কখনো দেখা যায়, আকদের পরে বছর বা বছরের চেয়েও বেশি সময় চলে যায় কোনো পার্থিব কারণে বা পড়ালেখার কারণে, পূর্ণরূপে স্বামীর ঘরে না আসায় দেরি করার ফলে বিভিন্ন সমস্যা ও কথা ওঠে।

কিন্তু সব সময় মনে রাখবে, কখনোই স্বামী ও স্ত্রী সম্পূর্ণ একই স্বভাবের হওয়া সম্ভব নয়। আর বিয়ের দ্বারা এটা উদ্দেশ্যও নয় যে, স্বামী-স্ত্রী সব দিক থেকে একরকম হয়ে যাবে। অন্তত প্রথম প্রথম এমন হবে। উভয়কে শরিয়ত মেনে সংসার করতে হবে, দ্বীন অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে—এটাই তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত।

---

৭৯. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

তার ব্যক্তিত্ব জানার চেষ্টা করো

- শরয়ি সাক্ষাতের মাধ্যমে তোমার স্বামীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো। অবশ্যই এটা হবে আকদের পরে।

- তার সাথে কথা বলে এবং তার বাহ্যিক দিকগুলো দেখে তার স্বভাব ও অভ্যাস সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা নাও। তাকেও তোমার স্বভাব ও চরিত্রের ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা দাও। যদি শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে, উভয়ে উভয়ের ব্যাপারে বাড়িয়ে রং ছড়িয়ে বলেছে, তাহলে বিষয়টা খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। দেখা যাবে বিয়ের পরে দুজনের মধ্যে বনিবনা নেই।

- এমন বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করো, যার মাধ্যমে তার চিন্তাভাবনার দিকগুলো জানা যাবে; যাতে তার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পারো তুমি।

- সব সময় মনে রাখবে, তোমাদের উভয়কেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরে এসে এমন একটা অবস্থানে আসতে হবে, যেখানে তোমাদের স্বভাব পরস্পরের কাছাকাছি ও অনুকূলে হয়, তাহলে দুজনের মধ্যে সুখী দাম্পত্য জীবন সম্ভব হবে।

- পাত্রকে তার নামাজ সম্পর্কে, রবের সাথে সম্পর্ক বিষয়ে, তার রোজা, মসজিদে উপস্থিতি, আমলের ইখলাস বিষয়ে প্রশ্ন করো। তার বন্ধুদের সার্কেল ভালো না খারাপ সেটা জেনে নাও।

- তার সাথে পবিত্র থাকার বিষয়ে আলোচনা করো। জানিয়ে দাও যে, খারাপ দৃষ্টি তোমার আত্মমর্যাদায় আঘাত দেবে, আর জানিয়ে দাও যে, এটা আল্লাহর কাছে আরও বেশি নিকৃষ্ট।

বলো যে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ

'আল্লাহ তাআলা স্বীয় আত্মমর্যাদা প্রকাশ করেন এবং মুমিনও স্বীয় আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। আল্লাহর আত্মমর্যাদায় আঘাত আসে, যখন মুমিন আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কর্মে অগ্রসর হয়।'[৮০]

- আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক যত উন্নত করতে থাকবে, ততই তোমার স্বামীর সাথে আল্লাহর সম্পর্কও ততটা উন্নত হতে থাকবে।

- মনে রাখবে, যখন তোমার স্বামী তোমার চেহারা থেকে অজুর পানি পড়তে দেখবে, নামাজের আলোয় তোমাকে আলোকিত দেখবে, তোমাকে সঠিকভাবে পর্দা করতে দেখবে, তখন তোমার স্বামীও নিজেকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে তাওবা করবে বেশি বেশি করে।

- তোমার স্বামীর মাসিক আয়ে যেটা ক্রয় করা সম্ভব নয়, সেটার আবদার করবে না। তোমার বারবার এটা সেটা চাওয়ার মাধ্যমে আকদ ও বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই নিজেদের মতভেদের কারণ বানিয়ে নিয়ো না।

- তোমার বোনের স্বামী যদি অধিক ধনবান হয়, তবে তার সাথে তোমার স্বামীর তুলনা কোরো না। হয়তো তোমার স্বামী কম সম্পদের মালিক; কিন্তু সে সব সময় তোমার সাথে হাসিখুশি থাকে, তোমাকে বেশি ভালোবাসে। কখনো তোমার স্বামীর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে যেও না। কেননা, এগুলো সম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান।

---

৮০. সহিহু মুসলিম : ২৭৬১।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিয়ের প্রহর

বিয়ে একমাত্র এমন সম্পর্ক, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যুবক-যুবতির মধ্যে সম্পর্ক করে দেন। এটা পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটার মাধ্যমে আল্লাহ নারী-পুরুষের মধ্যে পবিত্র বন্ধন করে দেন। যদি বিয়ে ভালো পরিবেশে, পবিত্র অবস্থায়, বাবার উপস্থিতিতে, অন্যদের দুআর মাধ্যমে হয়, তাহলে বিয়ে টিকে থাকে এবং বিয়ের সম্পর্ক মজবুত থাকে। কিন্তু যদি এ সম্পর্ক অপবিত্রতার মিশেলে হয়, এমন কোনো সম্পর্কের ফলে হয়, যা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে আমাদের লজ্জা হয়, তাহলে এমন বিয়ে খুব দ্রুতই ভেঙে যায়।

বিয়ের আগের ভালোবাসা

আমরা অনেকে জিজ্ঞেস করি, বিয়ের আগে ভালোবাসা সুখী দাম্পত্য জীবন আনে কি না, আদৌ এমন সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছায় কি না?

এক যুবক কোনো যুবতির সাথে পরিচিত হলো। যুবতিকে পছন্দ হলো তার। যুবক তার সব চেষ্টা দিয়ে যুবতির সামনে ভালো ও সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করল। যুবক যখন জানতে পারল যে, যুবতি একজন শান্ত স্বভাবের স্বামীর স্বপ্ন দেখে, তখন যুবক গুরুগম্ভীর ও শান্ত হওয়ার ভান করে; কিন্তু সে ভেতর থেকে তার ঠিক উল্টো!

অনেক যুবক বিয়ের আগে নিজেকে দানশীল ও মিতব্যয়ী দেখায়; কিন্তু বিয়ের পরে দেখা যায় সে আসলে কৃপণ।

একইভাবে অনেক যুবতি নিজেকে খুব ভালো স্বভাবে উপস্থাপন করে, জীবনযাপনে খুবই বাস্তবসম্মত মিতব্যয়ী হিসেবে দেখায়; কিন্তু বিয়ের পরে দেখা যায় সে আসলে খুবই খরুচে, পোশাকআশাক-সাজগোজের পেছনে প্রচুর খরচ করে।

যে যুবতি বিয়ের আগে সম্পর্ক করে, সে আসলে বিয়ের আগেই নিজের মর্যাদা-সম্মানকে ঝুঁকিতে ফেলে, একইসাথে তার পুরো জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলে।

কারণ যে যুবক বিয়ের আগে তার সাথে যোগাযোগ রাখে, যুবতিও পরিবারের আড়ালে তার সাথে যোগাযোগ করে, দেখা করে; এমন যুবক কখনো এমন যুবতিকে মন থেকে সম্মান করে না, সে যদিও সামনাসামনি অনেক সম্মান দেখায়, যতই বলে যে, আমি বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারছি, পরিবারের আড়ালে আমার সাথে দেখা করার কারণ বুঝতে পারছি।

এমন সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত গড়ালেও স্বামী পুরো জীবন তার স্ত্রীর ধোঁকার আশঙ্কায় থাকে। সে মনে করে যেভাবে পরিবারের আড়ালে বিয়ের আগে তার সাথে সম্পর্ক করেছিল, বিয়ের পরেও এ নারী আড়ালে আড়ালে অন্য কারও সাথে সম্পর্ক করতে পারে।

বাস্তবতা হচ্ছে শরিয়তবিরোধী এমন সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ে পর্যন্ত গড়ায় না। কেননা, যুবক সে যুবতিকে বিশ্বাস করে না, যে বিয়ের আগেই নিজেকে তার কাছে সঁপে দিয়েছে, তার সম্ভ্রম তার হাতে তুলে দিয়েছে। ওপরে ওপরে অনেক কিছু দেখালেও মনের ভেতরে এ কথা রাখে যে, এ নারী অন্য কারও কাছে যেতে দ্বিধা করবে না।

পরিবার চায় মেয়েকে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দেবে; কিন্তু মেয়ে তো তাকে পছন্দ করে না

পঞ্চাশ বছর বয়সী এক যুবতি শাইখ ড. ইউসুফ কারজাবিকে বলল, 'তার পরিবার তাকে তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিতে চায়; কিন্তু সে তো তাকে পছন্দ করে না।' তিনি জবাব দিলেন :

'এ যুগে (বিবাহপূর্ব) প্রেম-ভালোবাসার এ সমস্যা অনেক বেড়ে গেছে। এ সবই নাটক-সিনেমা ও গল্প-কাহিনির ফল। মেয়েরা গল্প ও ফিল্মে দেখানো নানান কিছুর সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, অনেক মেয়েই এসব আবেগের কথায় ধোঁকায় পড়ছে। বিশেষ করে কৈশোর ও সদ্য বালিগ হওয়া মেয়েরা। কারণ, এদের অন্তর থাকে খালি, মধুময় কথা এদের অন্তরে বেশ প্রতিক্রিয়া করে, এমনকি যুবকেরা সহজেই মধুর কথা বলে বলে এদের অন্তর দখল করে নিচ্ছে।

কিছু যুবক আছে, এমন ধোঁকাদারির কাজে লেগে আছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তারা কেবল মজা নেওয়ার জন্য এসব করে। বন্ধুদের আড্ডায় একজন আরেকজনের সাথে এসব বলে গর্ব করে যে, আমি আজকে অমুকের সাথে কথা বলেছি, কালকে অমুকের সাথেও বলব, পরশু আরেকজন...।

যুবতিদের প্রতি আমার নসিহত হচ্ছে, তোমরা এসব মনভোলানো কথায় মন দিয়ো না, এসবে বিশ্বাস কোরো না। বরং তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে মা-বাবা-অভিভাবকের কথা শোনা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া। কেবল ভালোবাসার মধুময় কথায় ভেসে গিয়ে বিয়ে করে ফেলা উচিত নয়। বরং সবকিছু বুদ্ধি-বিবেচনায় আনা উচিত প্রথমে। এটা গেল এক দিকের কথা।

আমি অভিভাবকদের বলব, আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে, মেয়ের আগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখা। কোনো বাবা যেন তার মেয়ের ইচ্ছা-আগ্রহকে পাত্তা না দিয়েই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক মেয়েকে বিয়ে না দেয়। মেয়ে রাজি নয় এমন কারও সাথে বিয়ে তো দিয়ে দিল; কিন্তু মেয়ে দাম্পত্য জীবনে এমনভাবে প্রবেশ করবে যে, সে এ সম্পর্কে খুশি নয়, সন্তুষ্ট নয়।

মেয়ের সন্তুষ্টিও জরুরি। কারণ, স্বামীর সাথে তার মেয়ে ঘর করবে। তাই তার সন্তুষ্টি জরুরি এখানে। এর মানে এ নয় যে, যুবক-যুবতি বিয়ের আগে সম্পর্ক করে এরপর বিয়ে করবে। বরং মেয়ে প্রস্তাবদাতাকে দেখবে, তার সম্পর্কে জানবে, এভাবে দেখা ও জানার পর সন্তুষ্টমনে তাকে বিয়ে করবে।

ইসলাম বিয়ের পূর্বে ছেলে-মেয়ের পরস্পরকে দেখার আদেশ করেছে। রাসুল ﷺ বলেন, (فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) "তা (পাত্রপাত্রী পরস্পরকে দেখা) তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।"[৮১]

ইসলামি শরিয়ত চায় সব যথার্থ দিকের ওপর যেন পরস্পরের সন্তুষ্টির সাথে বৈবাহিক জীবন শুরু হয়। যুবতি সন্তুষ্টি হবে এতে। অন্তত এতটুকু হবে যে, তার আগ্রহ প্রকাশ করা ও অভিমত স্পষ্ট বলার স্বাধীনতা তার থাকবে। অথবা যদি সে লাজুক হয়, তাহলে এমন কিছু ইশারা তার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, যা থেকে বোঝা যাবে যে, সে রাজি আছে। যেমন সম্মতি জানতে চাইলে সে চুপ থাকল। হাদিসে এসেছে :

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"বিবধা তার নিজের ব্যাপারে অলির চাইতে বেশি হকদার। আর কুমারীর ব্যাপারে তার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হবে, আর তার অনুমতি হলো তার চুপ থাকা।"[৮২]

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যার একবার বিয়ে হয়েছে, তাকে স্পষ্ট সম্মতির কথা বলতে হবে যে, "আমি রাজি।" অন্যদিকে যখন কুমারী মেয়ের কাছে সম্মতি জানতে চাওয়া হবে, তখন যদি সে লজ্জা পেয়ে চুপ থাকে অথবা মুচকি হাসে, তাহলে সম্মতির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি সে "না" বলে, অথবা কাঁদে, তবে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

নবিজি ﷺ এক নারীর সম্মতি ছাড়াই বিয়ে দেওয়ার কারণে তার বিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিছু হাদিসে এসেছে, এক মেয়ের বাবা চাইল তাকে

---

৮১. সুনানুত তিরমিজি : ১০৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৬৫।
৮২. সুনানুন নাসায়ি : ৩২৬০।

একজনের সাথে বিয়ে দিতে; কিন্তু মেয়েটি রাজি ছিল না। সে নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে অভিযোগ করল।

নবিজি ﷺ তার পিতার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং বিষয়টি ওই মেয়ের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেন। এরপর মেয়েটি বলল, "'আমার বাবা আমার ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাতে আমি অনুমতি দিলাম। কিন্তু আমি চাইছিলাম, নারীরা যেন জানতে পারে যে, বিয়ের ব্যাপারে তাদের অধিকার রয়েছে।'"[৮৩]

এ ব্যাপারে শাইখ কারজাবি বলেন, 'পাত্রীর সম্মতি আবশ্যক। আর অভিভাবকেরও সম্মতি থাকা আবশ্যক। অনেক ফকিহ এ রকম শর্ত করেছেন। তারা বলেন, বিয়ে সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অভিভাবক সম্মত হওয়া আবশ্যক। কারণ, হাদিসে এসেছে :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

"অভিভাবক ছাড়া ও দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হয় না।"[৮৪]

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যদি কোনো নারী বিয়ে করে, তবে তার সে বিয়ে বাতিল, সে বিয়ে বাতিল, সে বিয়ে বাতিল।"[৮৫]

একইভাবে মেয়ের মায়ের সম্মতিও দরকার আছে। যেমন হাদিসে এসেছে :

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

"মেয়েদের (বিয়ের) ব্যাপারে তোমাদের স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে নাও।"[৮৬]

---

৮৩. সুনানুন নাসায়ি : ৩২৬৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৭৪।
৮৪. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪০৭৫।
৮৫. সুনানুত তিরমিজি : ১১০২।
৮৬. সুনানু আবি দাউদ : ২০৯৫।

কারণ, একজন মা তার মেয়ের আগ্রহ ও মানসিকতা সম্পর্কে ভালো জানে। এ প্রক্রিয়াতে একজন যুবতি খুশি মনে, সন্তুষ্টচিত্তে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে পারবে। এ প্রক্রিয়ার ফলে মেয়েও সন্তুষ্ট থাকবে, বাবাও সন্তুষ্ট থাকবে, মাও সন্তুষ্ট থাকবে, স্বামীর পরিবারও সন্তুষ্ট থাকবে। দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে।

তাই বিয়ের বিষয়টা এভাবে হওয়া উত্তম। যেভাবে শরিয়ত চায়, সেভাবে বিয়ে হওয়াই কল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ তাওফিকদাতা।'

শরয়ি আকদের আগে পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক

শরয়িভাবে বিয়ে হওয়ার আগে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে সম্পর্কের সীমানা কতটুকু? কতটুকু অনুমোদিত? আর কোনটা শরয়িভাবে হারাম?

কখনো কখনো দেখা যায় দুই পরিবার বিয়ের ব্যাপারে একমত হয়ে সুরা ফাতিহা পড়ে একটা মতৈক্যে পৌঁছে। শরিয়তে এমন বাগদানের স্থান নেই। এমন বাগদান পাত্র-পাত্রীর মাঝে কোনো রকম উপভোগকে বৈধ করে দেয় না।

অন্যদিকে বিয়ের ক্ষেত্রে সুরা ফাতিহা পড়ার যে প্রচলন মানুষের মাঝে রয়েছে, এটা বিদআত, এর কোনো শরয়ি দলিল নেই। এটা এখানে স্পষ্ট যে, এমন বাগদান হারামকে হালাল করে দেবে না, আর বিয়ের আকদও সম্পন্ন হবে না এভাবে।

তাই বাগদানের পরেও পাত্র-পাত্রী দুজনের মাঝে সে সম্পর্ক থাকবে, যেমন সম্পর্ক থাকে অপরিচিত দুই যুবক-যুবতির মধ্যে। তাদের মাঝে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে না, তারা একে অপরের কিছুই হবে না। তাই দুজনের মেলামেশা করা, কোনো রকম এডভান্টেজ নেওয়াও জায়িজ হবে না, শরিয়তে যে নির্জনতার কথা এসেছে—সে নির্জনতাও জায়িজ হবে না।

এ তো গেল শরিয়তের কথা। আর অন্যদিকে এর সামাজিক কুফল এবং নিয়মের ব্যত্যয়ের দিক থেকেও এটা শরিয়তের আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি এ বিষয়ে শিথিলতার কারণে সামাজিক কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকত, তাহলে

শরিয়তদাতা মহান আল্লাহ এমন কোনো নিষেধ করতেন না, এমনভাবে সতর্ক করতেন না।

দুই পরিবারের মাঝে বিয়ের ব্যাপারে যে মতৈক্য হয়েছে, এটা আসলে একটা দুর্বল প্রাসাদের মতো। কখনো কখনো সেটা কেবল প্রাসাদ তৈরির প্ল্যান মাত্র। এমন পরিকল্পনার ওপরে যতই মতৈক্য হোক না কেন, এটা যেকোনো সময় বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রাখে। দেখা যাবে হঠাৎ করে দুই পরিবারের কারও দিক থেকে কোনো কারণ ও অনুঘটক এসেছে।

তাই পাত্রীর সাথে কিছু সময় উপভোগ করার জন্য পাত্রের আগমন, পাত্রী নিজেকে তার কাছে সঁপে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ পরিণতির। আর সব ক্ষতিই দেখা যাবে পাত্রীর ওপর এসে পড়ছে, তার সুনাম ও মর্যাদায় দাগ লাগছে।

যদি পাত্র সম্পূর্ণ কিছু না করে কেবল হালকাভাবে কিছু করে, তাহলে কেমন হবে? দুজন যদি একটা সময় পর্যন্ত এভাবে থাকল? এ ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, একসময় দেখা গেল এমন কিছু আপতিত হয়েছে, যা তাদের হিসেবেই ছিল না, তখন দেখা গেল বাগদান বাতিল করার প্রয়োজন দেখা দেবে!

যুবকের তো কিছুই হবে না। কিন্তু যুবতি যত স্বপ্ন বুনেছে, সব ভেঙে পড়বে; সে তার মান-সম্মান অনেকটা খুইয়ে বসবে; তার প্রতি মানুষের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া সে এ কল্পনার রাজ্যে তার সবটা খুইয়ে বসতে পারে। এক ঘণ্টার ব্যবধানে দেখা যাবে এক ঘণ্টা আগে তার কাছে সবকিছু ছিল; কিন্তু এক ঘণ্টা পর সে সব খুইয়ে বসেছে!

আর এটা তো স্পষ্ট যে, এমন অবস্থায় কোনো যুবতি কোনো রকম নিয়মের সহায়তা পাবে না, যেখানে তার সুনাম নষ্ট হওয়ার অথবা যুবতির আরেকটা বিয়ের প্রস্তাব আসার মাঝে প্রতিবন্ধকতার কোনো খেসারত পাত্রপক্ষকে দিতে হবে! যুবতি পুরো মোহরও পাবে না, অর্ধেক মোহরও পাবে না, অন্য কোনো বিনিময়ও পাবে না। কেননা, এ সবটাই হয়েছে বিয়ে ও আকদের পরিবর্তে প্রচলিত বাগদানের নামে।

তবে যদি পাত্র-পাত্রী উভয়ের মনে হয় তারা একে অপর থেকে দূরে থাকতে পারবে না, এত দিন তারা ধৈর্য রাখতে পারবে না, তাহলে সহজ পন্থা হচ্ছে, প্রচলিত বাগদান না করে সরাসরি শরয়ি আকদ করে নেবে, শরিয়তসম্মতরূপে বিয়ে করবে; যদিও তখন কাজি সাহেবের কাবিন করা সম্ভব নাও হয়। এভাবে তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক হয়ে যাবে, তাদের জন্য যেকোনো রকম দাম্পত্য আচরণ বৈধ হয়ে যাবে। এরপর যদি আকদের পরে বিয়ে ভাঙা বা বাতিল করার কোনো কারণ ধরা পড়ে, তাহলে বিয়ে তো শরিয়তসম্মতভাবে হয়েছে আর উভয় পক্ষ উভয়ের অধিকার ঠিকভাবে পাবে।

তোমার স্বামীর মধ্যে ভালো কিছুই পাচ্ছ না?

এমনভাবে বোলো না যে, তোমার স্বামীর মধ্যে ভালো কোনো গুণ নেই। কারণ, দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো গুণ আছে অবশ্যই। তুমি কেন তার ভালো গুণগুলো রেখে দোষগুলো একে একে তালিকা করছ? ভালো গুণগুলোরও তালিকা করো। তুমি তার মাঝে থাকা কোন ভালো গুণের কথা জানো না, সেটা তালাশ করো। যখন সে ভালো কোনো কিছু করে, তখন সেটার স্বীকৃতি দাও। তার ভুল ক্ষমা করার চেষ্টা করো।

এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করো :

১. স্বামীর ভালো কাজ লিখে রাখো। এটা হচ্ছে 'কবুল' (মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া)-এর স্তর।

২. তোমার লিখিত তালিকার মধ্যে নেই এমন ভালো গুণ তালাশ করো তার মাঝে। এটা হচ্ছে 'তাকাব্বুল' (গ্রহণ করা)-এর স্তর।

৩. ভালো কিছু করলে তার প্রশংসা করো। এটা হচ্ছে 'তাকদির' (মূল্যায়ন)-এর স্তর।

তুমি নিশ্চয় পড়েছ, প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা رضي الله عنها জাঁতাকলে আটা পিষতে পিষতে তাঁর হাত ফুলে যেত। আবার তিনি পানি আনার পাত্র বহন করতেন নিজের কাঁধে করে। এখান থেকে তুমি জানতে পারছ যে,

জান্নাতি মহিলাদের নেত্রীর কোনো সেবিকা ছিল না, তিনি এখানে শুধু তাঁর স্বামীরই সেবা করছেন না; বরং তিনি এখানে মুমিন মা হিসেবে একটি বাড়িকে সঠিক পরিচর্যায় রাখছেন, যে বাড়িতে সবাই ভালোবাসা ও দায়িত্বজ্ঞানের সাথে বড় হয়। নিজের সবটুকু দিয়ে তিনি তাঁর স্বামী ও সন্তানকে আগলে রেখেছেন।

মুসলিম সংসার এমন কিছু নয় যে, স্বামী কেবল আদেশ করে যায়, আর স্ত্রী সে আদেশ তামিল করে যায়! বরং মুসলিম সংসার হচ্ছে একে অপরের সাথে দুঃখ-সুখ ভাগাভাগি করে নেওয়ার নাম। এখানে উভয়ে সফল। উভয়ে সে দ্বীন মোতাবেক জীবনযাপন করে, যার প্রতি তারা বিশ্বাস এনেছে, দ্বীন মোতাবেক নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে সাজায় তারা।

আসমা বিনতে আবু বকর ﵄ তাঁর স্বামী জুবাইর বিন আওয়াম ﵁-এর সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সেটা আমরা স্মরণ করতে পারি :

'আমি জুবাইরের বাড়ির সব কাজ করতাম। তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করা, ঘোড়াকে খাওয়ানো, ঘাস কেটে দেওয়া, বালতি করে পানি এনে পান করানো, খেজুরের বিচি মাথায় করে বাড়ি থেকে তিন ক্রোশ দূরে তাঁর একটি জমিতে নিয়ে ফেলতাম।'

যদিও জমহুর ফুকাহারা বলেন, নারী কখনো পুরুষের করণীয় কাজ করবে না। কিন্তু এখানে এমন এক দাম্পত্যের কথা বলা হচ্ছে, যে দাম্পত্য মুমিন নারী-পুরুষের মাঝে, যে দাম্পত্য পরস্পরকে প্রাধান্য দেওয়ার ওপরে, যেখানে স্বার্থপরতার লেশ মাত্রও নেই।

স্বামীর জন্য তার বাবা-মার খিদমত করা সহজ করে দাও

তোমার স্বামীর জন্য তার বাবা-মার প্রতি সদাচরণ করা সহজ করে দাও, বিশেষ করে তার মায়ের সেবায় সহযোগী হও। তা ছাড়া স্বামীকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কাজে সাহায্য করো। কারণ, তোমার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি তখন আসবে, যখন তোমার স্বামী তোমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। আর তোমার স্বামীর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি তখন আসবে, যখন তার প্রতি তার মা সন্তুষ্ট

থাকবেন। তুমি কি স্বামীর ধ্বংস চাও, তুমি কি চাও যে, তোমার স্বামী মায়ের সেবা না করে আল্লাহর ক্রোধ কামাই করুক?!

আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "একজন নারীর ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?"

তিনি বললেন, "তার স্বামীর।"

আমি বললাম, "একজন পুরুষের ওপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার?"

তিনি বললেন, "তার মায়ের।"'

তাই বোঝার চেষ্টা করো, যদি তুমি ঠিকমতো স্বামীর সেবা বুঝতে না পারো, তাহলে কীভাবে বুঝবে তুমি স্বামীর কত বড় ক্ষতি করছ, তাকে শাস্তির মুখোমুখি করছ! স্বামীর প্রতি তোমার ভয় যেন আল্লাহর প্রতি ভয় করার অংশবিশেষ হয়। তুমি আল্লাহকে ভয় করো বলেই স্বামীকে ভয় করবে। প্রকাশ্যে-গোপনে সব সময় তার আনুগত্য করবে। তার উপস্থিতিতে-অনুপস্থিতিতে অনুগত থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে আদেশ করেছেন।

বুদ্ধিমতী

একজন বুদ্ধিমান নারী সে নয়, যে তার স্বামীর জিনিসপত্রের প্রতি নজর রাখে, স্বামীর চোখের ওপর দৃষ্টি রাখে, স্বামীর মুখের পদস্খলন পর্যবেক্ষণে রাখে; বরং একজন বুদ্ধিমান নারী হচ্ছে সে, যে নিজের স্বামীর কোন সময় কী প্রয়োজন তা বুঝতে পারে, স্বামী যেভাবে পছন্দ করে সেভাবে সবকিছু করে। এটাই হচ্ছে সে উত্তম দাম্পত্য আচরণ, যার প্রতি রাসুল ﷺ আমাদের উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন :

وَأَعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، وَطَلَبَهَا
مَرْضَاتِهِ، وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ تَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ

'বাকি নারীদের বলে দেবে, তোমাদের কেউ তার স্বামীর প্রতি সুন্দর দাম্পত্য আচরণ করা, স্বামীর সন্তুষ্টি তালাশ করা, স্বামীর পছন্দসই কাজ করা জিহাদের সমান।'[৮৭]

তাই সব সময় খেয়াল রাখবে তোমার স্বামী কী পছন্দ করে, কী চায়। অধিকাংশ পুরুষ শুধু এ জন্য নারীদের পছন্দ করে না যে, তাদের সাথে তারা শারীরিক সম্পর্ক করতে পারে; বরং তারা নারীদের এ জন্যও পছন্দ করে যে, নারীদের মধ্যে নারীত্বের গুণ আছে।

তাই সব সময় নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করো। তোমার স্বামীর পছন্দ ও আগ্রহ সম্পর্কে জানো, তার সাথে সেসবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নাও। তবে যখন তুমি নিজের কর্তব্য আদায় করলে, তখন নিজের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকে বলতে ভুলো না। তোমরা উভয়ে যে জিনিসটার ওপরে নিজেদের অভ্যস্ত করবে সেটা হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আনুগত্য করা, আল্লাহর হারামকৃত বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা যেমন : টেলিভিশন দেখা, খারাপ ওয়েবসাইট দেখা, এমন কিছু করা থেকে দূরে থাকা—যেটা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

কীভাবে নিজের স্বামীকে খুশি রাখবে?

- তোমার স্বামীকে খুশি রাখা, সন্তানদের উত্তম প্রতিপালন করা তোমার দায়িত্ব। মনে রাখবে তোমার প্রতি তার সন্তুষ্টি তোমার জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম। রাসুল ﷺ বলেন :

  أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

  'স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে যে নারী মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৮৮]

- তোমার স্বামী যেটা করতে সক্ষম নয়, সেটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তোমার সব চাওয়া-পাওয়া একত্রে একটা স্তূপ করে স্বামীর মাথার ওপর

---

৮৭. শুআবুল ঈমান : ৮৩৬৯।
৮৮. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪।

চাপিয়ে দেওয়া থেকে দূরে থেকো। নয়তো সে ভয় পেয়ে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। এ জন্য সে আফসোসও করবে না।

- তুমি তোমার স্বামীকে যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে দেখতে চাও, সেসব গুণ একসাথে একত্রে ধারণ করার জন্য তাকে চাপ দিয়ো না। একজন লোকের মাঝে সব ভালো গুণ একত্রিত হওয়া একেবারেই বিরল!

- তোমার সৌন্দর্য, শোভা, শরীরের সুস্থতা, চলনের সৌন্দর্য, কথায় মিষ্টতা রেখো। কর্কশ ভাষায় কথা বোলো না। কটু কথা তো একদম পরিহার করে চলবে। একজন উত্তম নারীর সংজ্ঞায়নে রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ

'যখন স্বামী তার (স্ত্রীর) দিকে তাকায়, তখন সে (স্ত্রী) তাকে আনন্দিত করে।'[৮৯]

- প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় দ্বীন মেনে চলো। ইসলামি পর্দাকে আবশ্যক করে নাও। শিথিলতার কারণে যেন কখনো কোনো সেবক বা চালক বা অন্য কেউ তোমার শরীরের এতটুকু অংশও না দেখে; যদিও সেটা সামান্য সময়ের জন্যও হয়। তোমার স্বামীর গাইরতে লাগতে পারে এটা। সে সব সময় চায়, তোমাকে যেন কোনো গাইরে মাহরাম না দেখে।

- সন্ধ্যায় তোমার স্বামী বাড়িতে আসার আগে তার জন্য সেজেগুজে থেকো; যেন সে তোমাকে সবচেয়ে সুন্দরতম অবস্থায় দেখে। সুন্দর কাপড় পরবে। স্বামী পছন্দ করে এমন সুগন্ধী মেখে নেবে।

- বাড়ির কাজকর্ম যেন তোমাকে স্বামী থেকে দূরে না রাখে। দেখা গেল যখন স্বামী ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরল, তখন তুমি রান্না করা, পরিষ্কার করা, জিনিসপাতি সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত।

---

৮৯. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৬৪।

- বিয়ের আগে টেলিভিশনের পর্দায় ভালোবাসার যে চিত্র দেখেছ, যে দিবাস্বপ্ন দেখেছ, সেসব নিয়ে ভেবে আফসোস কোরো না; কেননা, সেসব অতিরঞ্জন মাত্র।

- বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষ যেমন প্রথমে প্রস্তাব নিয়ে আসে, বিয়ের শুরুটা যখন পুরুষের হাতে, তখন এখানে নারীর ভূমিকা হচ্ছে সম্পর্কের সফলতা ও স্বামীর সাথে মিলিয়ে নেওয়া। তুমি যতই জ্ঞানে-গুণে, মর্যাদা ও পরিবারিক ক্ষমতায় স্বামীর চাইতে বেশি হও না কেন, সব সময় স্বামীর সাথে কোমল আচরণ করবে, তার কাছে সমর্পিত থাকবে, কখনো কোনো বিষয়ে অভিমত দিতে গিয়ে সংঘাত সৃষ্টি করবে না।

- স্বামীর সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। উপকারী কথা বলবে। তোমার চেহারা মিষ্টি হাসিতে উজ্জ্বল রাখবে তার জন্য। আনন্দদায়ক কৌতুক করবে তার সাথে। তোমার হৃদয়ছোঁয়া স্পর্শে তাকে আপ্লুত করবে। স্বামীকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হতে দেবে না, বাজে বকবকানি করবে না। তার সামনে মলিনমুখো থাকা, বিষণ্ন থাকা পরিহার করে চলবে।

- স্বামীর সামনে দেখাও যে, তুমি অন্যসব নারী থেকে দক্ষ, জ্ঞানে-গুণে উত্তম, সবার চেয়ে ভালো। তাহলে তোমার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বাড়বে এবং তোমার ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্বামী গর্ব করবে। এখানে তুমি তোমার সব শক্তি ও জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে।

- বান্ধবীদের সাথে অযথা কথায় সময় নষ্ট করবে না। অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, গায়ক-গায়িকাদের সম্পর্কে লেখা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ে থাকবে না। এসব ভালোবাসার গল্প, রোমান্টিক স্টোরি, কল্পনাপ্রসূত লেখা পড়ে তোমার সময় নষ্ট হবে, মনের ভেতর ভালোবাসা সম্পর্কে অহেতুক ফ্যান্টাসি তৈরি হবে।

এরচেয়ে বরং মস্তিষ্ক ও মনের জন্য ভালো হয় এমন ম্যাগাজিন পড়তে পারো। বাড়ির সমস্যা ও সন্তানদের সমস্যার সমাধানে কী করা যায়, এমন কিছু থাকলে সেটা পড়ো। তোমার যোগ্যতা বাড়াও।

- এমন ভিডিও দেখতে পারো, যেটা তোমার অভিজ্ঞতা বাড়াবে, তোমার জ্ঞানের ভান্ডারে নতুনত্ব আনবে। খারাপ সিরিয়াল দেখে, ফিল্ম দেখে সময় নষ্ট কোরো না।

- পরিবারের সমস্যা উপস্থাপন ও সমাধানে করণীয় নির্ধারণ করার জন্য একটা সময় ঠিক করে নাও। কেবল এ সময়টাতেই এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবে।

- স্বামী বাড়িতে আসামাত্রই তড়িঘড়ি করে অভিযোগ শোনাতে যাবে না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হলে স্বামী বাড়িতে আসলে কেবল নয়; বরং বাড়িতে আসার আগে মোবাইলেই যোগাযোগ করে বিষয়টা জানিয়ে দেবে। অগুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো যথাসময়ে বলবে।

- স্বামীর কাছে এমন কিছু চাইবে না যে, তাকে বাড়িতে পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। যেখানে তুমি মামলা করবে আর স্বামী তখন সন্তানদের ধরে এনে একে একে অভিযুক্তদের বিচার করে তাদের শাস্তি দেবে।

- সন্তানদের সামনে স্বামীর আচার-আচরণের সমালোচনা করবে না। সন্তানদের সামনে তাকে উদ্দেশ্য করে এমন কিছু উচ্চারণ করবে না, যেটা পরবর্তী সময়ে সন্তানরা তাকে বলতে পারে। যেমন : বকবক এসেছে...

- নিজের ঘরের সমস্যা নিজের বাবার বাড়িতে গিয়ে বলবে না। এভাবে কিছু করলে তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে তোমার পরিবারের রাগই বাড়বে। বরং কোনো সমস্যা হলে সেটা নিজের ঘরে স্বামীর সাথে মিটমাট করবে।

- যদি তুমি স্বামীর চাইতে অধিক ধনী পরিবারের হও, অধিক সম্ভ্রান্ত পরিবারের হও, যদি তুমি অধিক শিক্ষিত হও, তাহলে এ নিয়ে স্বামীর ওপর বড়ত্ব দেখাতে যাবে না, অহংকার করবে না।

- যদি স্বামী তোমাকে তার কাছে পেতে চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করবে না। রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকা সত্ত্বেও স্ত্রী না আসে এবং স্বামী তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত যাপন করে, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা সে নারীকে অভিশাপ দিতে থাকে।'[৯০]

- মনে রাখবে, স্ত্রীর ওপর স্বামীর প্রথম অধিকার হচ্ছে, স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হবে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'যদি আমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ করতাম।'[৯১]

- তোমার ওপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে যেয়ো না। রাসুল ﷺ বলেছেন যে, স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা নারীকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি রাসুল ﷺ এমন কাজকে কুফরি পর্যন্ত বলেছেন।

- স্বামীর অর্থ সংরক্ষণে রেখো। তার অনুমতি ছাড়া তার অর্থ খরচ করবে না। যদি তুমি আশ্বস্ত থাকো যে, অমুক বিষয়ে খরচ করলে স্বামী সন্তুষ্ট হবে, তাহলে সে খাতে খরচ করতে পারবে।

- স্বামীর আচরণে রেগে যাবে না। কিছু নারী সবচেয়ে বেশি খারাপ যে কাজটা করে, তা হলো, নিজের স্বামীর আচরণে রেগে যাওয়ার বিষয়টা সবার কাছে ঘোষণা করে দেয়। এমন কিছু কখনো হয়ে থাকে তুচ্ছ কারণে, অভিযোগ করতে থাকার অভ্যাসের কারণে। স্বামী তাকে অবহেলা করছে বলে অভিযোগ করে, এরপর মায়ের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে।

- মনে রাখবে, দুবেলা দুটো রুটি ও পানির সাথে ভালোবাসা, শান্তি, পরস্পরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করার ঘর সে ঘর থেকে অনেক উত্তম, যে বাড়িতে গরু জবাই হয়, ভালো ভালো খাবার রান্না হয়; কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ লেগেই থাকে।

---

৯০. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৬।
৯১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৫৯।

এয়োদশ অধ্যায়

কর্মক্ষেত্রে নারী

পুরুষের মতোই নারী একজন মানুষ। নারী পুরুষের পোশাক, পুরুষ নারীর পোশাক। উভয়ে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। যেমনটা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন। আর মানুষ সৃষ্টিগতভাবে এমন জীব, যে চিন্তা করে এবং কাজ করে। চিন্তা ও কাজ ছাড়া মানুষ হয় না।

আর আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, তাদের মধ্যে কে ভালো আমল করে। মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে আমলে শ্রেষ্ঠ কে।

আমল বা কাজের ক্ষেত্রে পুরুষ যেমন আদিষ্ট, তেমনই নারীও আদিষ্ট। বিশেষ করে উত্তম আমলের প্রতি তো উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পুরুষ যেমন নিজ আমলের কারণে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবে, তেমনই নারীও পুরস্কৃত হবে। যেমনিভাবে আখিরাতে পুরস্কৃত হবে, তেমনই দুনিয়াতেও কিছুটা পাবে।

যেমনটা বলা হয়ে থাকে যে, নারী মানবসমাজের অর্ধাংশ। ইসলাম থেকে কখনো কল্পনা করা যায় না যে, ইসলাম সমাজের এ অর্ধাংশকে অকর্মণ্য রেখে দেবে, এ অর্ধাংশকে কর্মহীন জমাট পাথরের মতো থাকতে বলবে! ইসলাম নারী জাতিকে ফেলে রাখবে, তাদের থেকে উপকার নেবে না, কোনো ভালো কাজে তাদের লাগাবে না—এমনটা হতেই পারে না।

নিঃসন্দেহে নারীদের অনেক কাজ আছে। সবচেয়ে বড় কাজটি হচ্ছে, সন্তানদের উত্তম প্রতিপালন করা। আল্লাহ তাআলা নারীকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কোনো ধরনের বস্তুগত কাজ বা অন্য

কোনো ধরনের কাজ নারীকে এ মহান দায়িত্ব পালন থেকে বিমুখ রাখতে পারবে না। কেননা, একজন নারী ছাড়া কেউই এ কাজটি যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়। আর এ কাজের ওপরই উম্মাহর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ কাজের মাধ্যমেই উম্মাহর সবচেয়ে বড় সম্পদ ও শক্তি গঠিত হবে। এ সবচেয়ে বড় সম্পদ ও শক্তি হচ্ছে মানব সম্পদ।

একইভাবে নারীর আরেকটি কাজ হচ্ছে, বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা, তার স্বামীর দিকে খেয়াল রাখা, সুখী পরিবার গড়ে তোলা। যে পরিবার শান্তি, ভালোবাসা, দয়ার ওপর আধারিত হবে। হাদিসে এসেছে যে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সুন্দর দাম্পত্য আচরণ তার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সমান।

ড. ইউসুফ আল-কারজাবি বলেন :

'তবে এর অর্থ এ নয় যে, বাড়ির বাইরে কাজ করা নারীর জন্য শরয়িভাবে হারাম। স্পষ্ট বক্তব্যসম্পন্ন সুসাব্যস্ত শরয়ি দলিল ছাড়া কেউই কোনো কিছুকে হারাম বলতে পারে না। আর প্রতিটি জিনিস ও আচরণের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, সেটা প্রাথমিকভাবে হালাল থাকে।

এর ওপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, মূলত ঘরের বাইরে কাজ করা নারীর জন্য জায়িজ। কখনো এ কাজ করাটা স্রেফ বৈধ হতে পারে, আবার কখনো ফরজও হতে পারে। যেমন : কেউ যদি বিধবা হয় বা তালাকপ্রাপ্তা হয় বা তার খাবারের কোনো উৎস না থাকে, যদি তার পরিবার না থাকে আর সে যদি কোনো ধরনের আয়-উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে ভিক্ষা বা দানের ওপর নির্ভর করার চাইতে কাজ করে খাওয়াই শ্রেয়।

আবার দেখা যায়, পরিবারের জন্য কাউকে কাজ করতেও হতে পারে, যেমন স্বামীকে সহযোগিতা করার জন্য অথবা সন্তানদের প্রতিপালনের অধিক খরচ বহনের জন্য অথবা বিয়ের আগে ছোট ভাই-বোনদের জন্য অথবা বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে সাহায্য করার জন্য। যেমনটা আমরা দেখেছি শুআইব ﷺ-এর ঘটনায়, পবিত্র কুরআন সুরা কসাসে বর্ণনা করেছে যে, তাঁর দুই মেয়ে ছাগলপালের দেখাশুনা করতেন, আয়াতটি হচ্ছে :

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

'তারা বলল, "আমরা (আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালেরা (তাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পর) সরিয়ে নেয়। আর আমাদের পিতা খুবই বয়োবৃদ্ধ।'[৯২]

আবার হাদিসে এসেছে যে, জাতুন নিতাকাইন উপাধিতে খ্যাত আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ তাঁর স্বামী জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ-কে ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করা, খেজুরের বিচি যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার কাজে সাহায্য করতেন, এমনকি তিনি নিজের মাথায় বহন করে খেজুরের বিচি তাঁদের একটি বাগানে নিয়ে যেতেন, যেটা প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ছিল তাঁদের বাড়ি থেকে।

কখনো দেখা গেল সমাজের প্রয়োজনে নারীকে কাজ করতে হচ্ছে। যেমন : নারীদের চিকিৎসায়, নারীদের শিক্ষাদানে, এমন বহু বিভাগ রয়েছে যেগুলো নারীদের সাথে নির্দিষ্ট। এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে নারীদের মাধ্যমেই এসব কাজ আঞ্জাম দেওয়া।

তাই পুরুষের উচিত যখন প্রয়োজন আসবে, তখন নারীকে এমন কাজ করতে সহযোগিতা করা। জরুরি অবস্থায় নারীকে বসিয়ে রাখা উচিত নয়।

যদিও নারীর ঘরের বাইরে কাজ করা জায়িজ, তবে এখানে কিছু শর্ত আছে :

১. কাজটি মূল থেকে বৈধ হতে হবে। অর্থাৎ কাজটি হারাম হতে পারবে না অথবা হারামের দিকে ধাবিত করে এমনও হতে পারবে না। যেমন : অবিবাহিত একাকী যুবকের সেবিকা হিসেবে কাজ করা, এমন কারও অধীনে কাজ করা—যার সাথে একাকী নির্জনতা হওয়ার আশঙ্কা আছে, নর্তকীর কাজ করা, বারবনিতা হিসেবে কাজ করে মদ পরিবেশন করা—যাদেরকে স্বয়ং রাসুল ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন। রাসুল ﷺ মদ পরিবেশনকারী, বহনকারী, বিক্রেতাকে অভিশাপ দিয়েছেন। অথবা বিমানবালা হিসেবে কাজ করা—যার কাজ হচ্ছে নেশাজাতীয় দ্রব্য পরিবেশন করা। অথবা যে কাজে মাহরাম ছাড়া দূর দেশে সফর করতে হয়, ভিনদেশে একাকী রাত যাপন করতে

৯২. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৩।

হয় ইত্যাদি এমন যত কাজকে ইসলাম বিশেষ করে নারীর জন্য হারাম করেছে, আবার নারী-পুরুষের একত্রে কাজ করাকে হারাম করেছে।

২. মুসলিম নারী বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় নিজের পোশাকের দিকে খেয়াল রাখবে, হাঁটাচলা, কথা বলার দিক থেকে সতর্ক থাকবে; যেন শরিয়তের নিয়ম লঙ্ঘিত না হয়।

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'আর ইমানদার নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।'[১৩]

৩. এমন কাজ হতে হবে, যে কাজের কারণে নারীর ফরজ কর্তব্য ব্যাহত হয় না। যেমন : স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য পালন, সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য পালন। এটা হচ্ছে নারীর প্রথম ও মূল কাজ।

নারীর কাজের ক্ষেত্রে শরয়ি নীতিমালা

ড. মুহাম্মাদ বিন লুতফি আস-সাব্বাগ বলেন :

'বাইরে কাজ করার অধিকার নারীর রয়েছে। যেমনটা কুরআন বলছে :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

'পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে, তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে, তাতে তাদের অংশ রয়েছে।'[১৪]

তবে নারীর এ কাজ অবশ্যই শরিয়ত নির্ধারিত সীমানার ভেতরে হতে হবে। আর সে সীমা হচ্ছে, নারী-পুরুষের অযাচিত মেলামেশা থাকতে পারবে না,

---

১৩. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩১।
১৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩২।

পুরুষের সাথে নির্জনতামুক্ত থাকতে হবে, এ কাজে ফিতনার আশঙ্কা থাকতে পারবে না, কাজের রকম এমন হতে পারবে না—যেখানে নারীকে পুরুষের সাথে কথা বলতে হয়, যে কাজে তার সফলতার জন্য পুরুষদের সাথে নরম ভাষায় কথা বলতে হয় এমনও হতে পারবে না। আর সব সময় পর্দার পাবন্দি করার সুযোগ থাকতে হবে।

নারীর কাজের জন্য উত্তম কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন : শিক্ষাদান, নারীদের চিকিৎসা ও গাইনি বিভাগ। যদি নারী-সংশ্লিষ্ট রোগগুলোর চিকিৎসা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নারী চিকিৎসক পাওয়া যায়, তাহলে অনেক ভালো হয়। এসব ক্ষেত্রে নারীর কাজ কেবল তার জন্যই উপকারী হবে না; বরং উম্মাহর জন্যও প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে।

তাই পুরুষ থেকে দূরে থেকে নারী যদি কাজ করতে পারে, তাহলে তাতে শরিয়ত বাধা দেয় না। তবে অবশ্যই নারীর কাজ করা জরুরি মুহূর্তে হবে এবং আল্লাহর হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নের ওপর অটল থাকতে হবে।

নারীর ঘরের বাইরে কাজ করা তার দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করতে পারে। আর সৃষ্টিগতভাবে নারীর কাজ ঘরের ভেতরেই। ঘরের কাজও কঠিন। ঘরের কাজের জন্য নারীর পূর্ণ মনোযোগ থাকাও জরুরি। বিশেষ করে যদি ঘরে সন্তানসন্ততি থাকে।'

তবে কাজের জন্য তোমার বের হওয়া যেন ইসলাম অনুযায়ী জরুরি হয়। কেবল শেখার জন্য অথবা তুমি ডাক্তার বা শিক্ষিকা হলে তোমাকে 'অমুক ডাক্তার', 'অমুক শিক্ষিকা' বলে ডাকা হবে এ জন্য কর্মক্ষেত্রে আসবে না। বরং যখন কোনো ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা দেখবে, কোনো ক্ষেত্রে যখন বোনদের প্রয়োজন দেখবে, তখনই আসবে কর্মক্ষেত্রে।

মুসলিমদের সবচেয়ে প্রয়োজন যেখানে সে পেশা গ্রহণ করবে। এভাবে ঘর থেকে বাইরে এসে কাজ করা তোমার জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ গণ্য হবে।

WHO-এর এক বক্তব্যে এসেছে, 'কখনো নারীর জন্য এমন পরিবেশে কাজ করা উচিত নয়, যে পরিবেশ তার জন্য উপযুক্ত নয়। কলকারখানার

কাজ, কঠিন কারুশিল্পের কাজ ইত্যাদি। নারীদের জন্য উপযুক্ত অনেক কর্মক্ষেত্র রয়েছে। যেমন : শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক তত্ত্বাবধান, লেখালেখি, প্রকাশনাসহ বহু কম শ্রমসাধ্য কাজ রয়েছে।

অন্যদিকে নারীদের পুরুষদের মতো কাজ করা, যেমন : পুলিশের কাজ, মেকানিকের কাজ, কারখানার কাজ, রাস্তা পরিষ্কারের কাজ, সাধারণ গাড়ি, মালগাড়ি চালানো প্রভৃতি কাজ নারীদের উপযুক্ত নয়। এমন কাজে নিয়োজিত হওয়া নারীর জন্য উচিত নয়।'

ইংরেজ নারীর মতে নারীর কর্মক্ষেত্র

ইংরেজ লেখিকা ল্যাডি কুক 'ইকো' নামক ম্যাগাজিনে লেখেন,

'নারী-পুরুষের সহকর্মক্ষেত্রে পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই নারীরা এমন কর্মক্ষেত্রে যেতে দ্বিধা করে, যে কর্মক্ষেত্র তার সৃষ্টির প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এমন সহকর্মক্ষেত্র যে অঞ্চলে যত বেশি, সে অঞ্চলে জারজ সন্তানের সংখ্যা তত বেশি। আর এটা নারীর জন্য মারাত্মক শঙ্কার ব্যাপার।'

এরপর লেখিকা বলেন, 'আমাদের এমন কর্মক্ষেত্রের কারণে পশ্চিমা নাগরিক জীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে। এখনো কি এটা বোঝার সময় আসেনি? হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু হত্যা রোধ করার এখনো কি সময় আসেনি? এখানে তো শিশুর কোনো অপরাধ নেই। যা অপরাধ সবই করেছে পুরুষ নারীর নরম মনকে কাজে লাগিয়ে।

হে মা-বাবারা, আপনাদের মেয়েদের ল্যাবে বা কারখানায় কাজ করে কিছু টাকা-পয়সা কামানোর লোভ যেন আপনাদের প্রতারিত না করে। আমি তাদের পরিণতির কথা বলছি। তাদেরকে পুরুষদের থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিন। তাদেরকে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর পুরুষদের ওত পেতে থাকার বিষয়ে সতর্ক করুন।

পরিসংখ্যান থেকে আমরা জেনেছি যে, জারজ সন্তান ধারণ করার এ মহাঘাতী ব্যাধি সে অঞ্চলে বেশি, যে অঞ্চলে নারী-পুরুষে অবাধ মেলামেশা হয়। আপনারা কি দেখছেন না যে, সবচেয়ে বেশি জারজ সন্তান সে শ্রেণির নারীদের

মধ্যে রয়েছে, যারা ল্যাবে কাজ করে বা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সেবিকার কাজ করে। আবার অনেক নারী বিপদে পড়ে এসব জারজ সন্তান পেটে ধরছে। যদি অ্যাবরশন করানোর ডাক্তাররা অ্যাবরশন না করাতো, তবে আমরা এখন যত জারজ সন্তান দেখছি, তারচেয়ে বহু গুণ জারজ সন্তান দেখতে হতো। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আমাদেরকে নিকৃষ্ট অবস্থায় এনে ফেলে। পূর্বে এমন কিছুর কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। নাগরিক জীবনে এ এক চরম অবক্ষয়।'

চতুর্দশ অধ্যায়

বাজারে

বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন কেন?

অনেক বোন আছে সব সময় শপিংয়ের মাঝেই বুঁদ হয়ে থাকে। বাজার ছাড়া তাদের যাওয়ার যেন আর কোনো জায়গাই নেই। তাদের চিন্তাভাবনা কেবল কী কিনব, কত দিয়ে কিনব, কোথা থেকে কিনব, এসব প্রশ্নের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

যখনই কোনো নতুন শপিংমলের কথা শুনে, সেদিকে তড়িঘড়ি যেতে থাকে। যখনই কোনো ডিসকাউন্টের কথা শুনে, সেদিকে ছুটতে থাকে!

তাদের মধ্যে কতক তো বাজারে যায় জরুরি জিনিসপাতি কেনার জন্য।

আবার কতক যায় ডিসকাউন্টের ঘোষণা শুনে!

কতক যায় স্রেফ সময় নষ্ট করার জন্য, একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য!

কতক যায় বান্ধবীদের সাথে, আত্মীয়াদের সাথে বাজারে দেখা করার জন্য।

আর কিছু মহিলা আছে বাজারের দিকে যায় প্রাত্যহিক প্রমোদভ্রমণে!

আর কিছু নারী যায় নতুন কী এসেছে তা দেখার জন্য—ফ্যাশন ফলো করা, ট্রেন্ড ফলো করার জন্য।

আবার তাদের মধ্যে কতক আছে বাজার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাদের কাছে 'কখন কোন শপিংমল খুলবে? কখন ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে?' এসব প্রশ্নের যথাযথ জবাব থাকে।

ইসলামি আদব অনুযায়ী চলো

অবশ্য কিছু নারী শরয়ি পোশাক পরে, পর্দা মোতাবেক মাহরামের সাথে বাজারে যায়। কিন্তু কিছু নারী আছে হিজাব ছেড়ে, বাজারের অপরিচিত লোকদের জন্য সেজেগুজে বাজারে যায়।...

বাজারে যাওয়ার আগে রাসুল ﷺ-এর এ হাদিস স্মরণে রাখবে :

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহ। আর সবচেয়ে ঘৃণিত জায়গা হচ্ছে বাজারসমূহ।'[৯৫]

সালমান ফারসি রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ، وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَفِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ

'তুমি বাজারে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তি হোয়ো না, বাজার থেকে প্রস্থানকারী শেষ ব্যক্তি হোয়ো না। কেননা, বাজারে শয়তান ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা দেয়।'[৯৬]

বাজারে যাওয়ার আগে সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, সাজসজ্জা করবে না, মানুষের চোখ আকর্ষিত হয় এমন পোশাকও পরবে না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَخَرَجَتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا

'সুগন্ধি পরে যে নারী মানুষের সামনে গমন করে আর মানুষ তার সে সুগন্ধী পায়, তবে সে এমন এমন।' অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।[৯৭]

---

৯৫. সহিহু মুসলিম : ৬৭১।
৯৬. আল-মুজামুল কাবির : ৬১১৮।
৯৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫৭৮।

তোমার কাছে যে জিনিস নেই, সেটা নিয়ে মানুষের সামনে গর্ব করা থেকে বিরত থাকবে। আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'এক নারী বলল, "আল্লাহর রাসুল, আমার স্বামী আমাকে যে জিনিস দেয়নি, আমি কি কাউকে বলতে পারি যে, আমার স্বামী আমাকে সেটা দিয়েছে?"

রাসুল ﷺ বললেন :

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

"যাকে যা দেওয়া হয়নি, সে যদি সেটা পাওয়ার ভান করে, তবে সে প্রতারণার জন্য দুপ্রস্থ মিথ্যার পোশাক পরিধান করল।"'[৯৮]

লোক-দেখানোর জন্য পোশাক পরা থেকে বিরত থাকবে। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের জন্য পোশাক পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।'[৯৯]

ইবনুল আসির বলেন, 'অর্থাৎ যার পোশাক অন্যদের পোশাক থেকে রঙে-ঢঙে ভিন্ন হবে, মানুষের দৃষ্টি তার দিকে ফিরবে এবং সে অহংকার ও আত্মতুষ্টিতে দম্ভ করে বেড়াবে, তাকে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার পোশাক পরানো হবে।'

বাজারের দুআ

বাজারে প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে নাও। বাজারে যাওয়ার দুআ পড়তে ভুলবে না যেন। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

৯৮. সহিহুল বুখারি : ৫২১৯, সহিহ মুসলিম : ২১২৯।
৯৯. মুসনাদু আহমাদ : ৫৬৬৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬০৭।

كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ

'যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এ দুআ পড়বে, (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) আল্লাহ তার জন্য ১০ লক্ষ নেকি লিখে দেবেন এবং তার ১০ লক্ষ গুনাহ মুছে দেবেন, তার ১০ লক্ষ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।'[১০০]

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম তার অপূর্ব বই (الهاربات إلى الأسواق)-এ বলেন :

'দোকানদারের সাথে সংক্ষেপে ও সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথা বলবে। নরম ভাষায় ও সুর টেনে কথা বলবে না। বিক্রেতাদের সাথে বেশি তর্ক করতে যাবে না। দোকানের নির্জন স্থানে প্রবেশ করবে না। এমন কোনো স্থানে যাবে না, যেখানে তুমিই কেবল কাস্টমার থাকো, আর অন্য কেউ থাকে না।

বাজারে পুরুষের স্পর্শ থেকে সাবধান থাকবে। তোমার বুকের ওপর বোরকা ও আবা থাকলেও বুকের ওপর কাপড়ের মাপ নেবে না। পুরুষের সামনে জুতা পরা ও জুতার মাপ করবে না।

দোকানদারকে বেশি পণ্য নামাতে বলবে না।

নিজের হাত বা আঙুল বিক্রেতার হাতে দেবে না চুড়ি বা আংটির মাফ নেওয়ার জন্য।

সব সময় মনে রাখবে, তোমার স্বামী বা তোমার বাবা তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, বাজারে ঘুরে বেড়ানো নেকড়ে-হায়েনাদের প্রতি নয়।'

মনে রাখবে, নারীর ঘরের বাইরে বেরোনো ওত পেতে থাকা হায়েনাদের জন্য শিকারের সুযোগ।

---

১০০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪২৮, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৯৭৪।

আশ্চর্য যে, অনেক পুরুষ তার স্ত্রী বা মেয়ে বা বোনকে বাজারে পাঠিয়ে নিজে ঘরে বা বন্ধুদের আড্ডায় বসে থাকে! কবি বলেন :

انّ الرجال الناظرين الى النسا *** مثل الكلاب تطوف باللحمان

ان لم تصن تلك اللحوم أسودها*** أكلت بلا عوض ولا أثمان

'নারীর দিকে তাকিয়ে থাকা পুরুষেরা গোশতের আশপাশে ঘুরতে থাকা লালা ঝরানো কুকুরের মতো। যদি কেউ সে গোশতের যথাযথ প্রতিরক্ষা না করে, তবে বিনা মূল্যে যেকোনো কুকুর তাতে মুখ দিতে পারে!'

অপচয় নয়

তোমার স্বামী বা বাবার মাসিক আয় নিয়ে চিন্তা করে তবেই খরচ করবে। অপচয় করবে না। অনেক নারী আছে বাজারে গিয়ে অকাতরে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে থাকে! নারী দুধরনের হয় :

এক. যে নারীর ওপর আল্লাহর কৃপা রয়েছে। সে এটাকে আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের প্রদর্শন মনে করে। এটাতে অপচয় করে না। তার সম্পদ বা তার স্বামীর সম্পদকে আল্লাহর দান মনে করে।

দুই. এ প্রকার নারী লোক-দেখানোকে পছন্দ করে, আর এ জন্য নিজের স্বামীকে সে ঋণের বোঝার তলে ডুবিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। স্বামীর কাছে এটা-ওটা চাইতে চাইতে তাকে অস্থির করে তোলে। তার স্বামী সে যা ইচ্ছে করে, তার আঞ্জাম দিতেই হবে এমন মনোভাব থাকে তার; চাই স্বামী কপর্দকহীন হয়ে যাক।

এসো, আর্থিক বিষয়ে যথোচিত চিন্তা করো। দান করতে শেখো। নিজের ওপর ও স্বামীর ওপর দয়া করো। বাড়িতে একটা বাজারশাখা রাখা জরুরি নয়। বরং তুমি তা-ই কিনবে, যা কেনা জরুরি হবে।

কিরাদ বিন নুহ বলেন, 'আমার গায়ের জামা দেখে শুবা বিন হাজ্জাজ জানতে চাইলেন, "কত দিয়ে নিলে?"

আমি বললাম, "আট দিরহামে।"

তিনি বললেন, "যদি তুমি চার দিরহামে একটা জামা কিনতে আর বাকি চার দিরহাম সদাকা করে দিতে!'"

স্বামীকে বলে যাও

যদি তোমার স্বামী তার অনুমতি নেওয়া ছাড়া তোমার বাজারে যাওয়া পছন্দ না করে, তবে অবশ্যই তার অনুমতি নেবে। অন্যথা তাকে না জানিয়ে, তার অনুমতি না নিয়ে তুমি সব দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করে গেলেও তুমি তার অধিকার লঙ্ঘন করলে। আর ফেরেশতারা তোমার বাজারের দিকে যাওয়া প্রতিটি কদমে তোমাকে লানত করতে থাকবে।

আর এখানে আসলে স্বামীর ব্যক্তিত্বের দিক থেকে তুমি তাকে ভয় করলে, এ ভয়ে তুমি তাকে বলোনি যে, সে শুনলে তোমাকে অনুমতি দেবে না। এভাবে আসলে তুমি প্রথমত আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে অবাধ্য হলে, এরপর তুমি স্বামীর হকের ব্যাপারটা লঙ্ঘন করলে, কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে আদেশ দিয়েছেন স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রে তাকে আনুগত্য করতে। যদি তুমি তার অনুপস্থিতিতে তার অবাধ্য হও, তবে ফেরেশতারা তোমাকে লানত করবে এবং তোমার ওপর আল্লাহ রাগান্বিত হবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নারী—আমাদের দৃষ্টিতে ও পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে

প্রতিনিয়ত পশ্চিমা মিডিয়ায় শোনা যায়, নারীদের নির্যাতন করা হচ্ছে, নিপীড়ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে তারা বোঝাতে চায় যে, নারীদের ওপর এ নির্যাতনের মূল হোতা ইসলাম!

কাফিররা মিথ্যা বলে। এটা তাদের স্বভাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের চারপাশে এমন বহু মানুষকে পাওয়া যায়, যারা এসব মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডায় বিশ্বাস করছে। স্বাধীনতার মিথ্যাবুলি ও পশ্চিমা সমাজে নারীর অধিকার রক্ষার মিথ্যাবুলিতে ধোঁকায় পড়ছে।

যখন পশ্চিমা মিডিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবতার কথা বলে, তখন সেখানে প্রথম যুগের মুসলিমদের কথা বলে না; অথচ বিজ্ঞান ও মানবতার প্রথম সবক তো তারাই দিয়েছিল। মুসলিমদের নাম উল্লেখ করলেও খুবই বিরল। বরং তারা এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়ে দেয় অধুনা ইউরোপীয় সভ্যতাকে।

যখন পশ্চিমা মিডিয়া মানুষের অধিকার ও ধর্মীয় শুদ্ধিকরণের গণহত্যার কথা বলে, তখন তারা স্পেনে লাখো মুসলিমের গণহত্যার কথা উল্লেখ করে না, সে কুখ্যাত ইনক্যুজেশনের কথা ভুলেও মুখে আনে না!

এমনকি কয়েক বছর আগে হওয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কথাও তারা বেমালুম চেপে যায়! সেখানে হওয়া গণহত্যা, নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন ও সম্মানহানির কথা তাদের মুখেই ওঠে না!

নারী নির্যাতন বলতে বোঝায়, মারধর করা, কষ্ট দেওয়া, খারাপ ব্যবহার করা, যে কাজে আগ্রহী নয় এমন কাজ করতে বাধ্য করা। শারীরিক, মানসিক উভয়

দিকটাই এখানে অন্তর্ভুক্ত। ধর্ষণ করা, উত্যক্ত করা, হয়রানি করা, কর্মক্ষেত্রে ভয় দেখানো, পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করা এসবই নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত।

বসনিয়াতে নারীরা যে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, ইরাকের বন্দিশালায় দখলদারদের হাতে যে ধর্ষণ, নির্যাতন, সম্মানহানির ঘটনা ঘটেছে এসব তুলে ধরে না তারা। ফলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, পশ্চিমা মিডিয়া 'নারী নির্যাতন' বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও আসলে তারা বাস্তবতা তুলে ধরছে না; বরং নিজেদের মিডিয়া দিয়ে ইসলামের ওপর আঘাত করাই তাদের উদ্দেশ্য। বসনিয়া ও ইরাকসহ বহু জায়গায় নারীরা নির্যাতিত হয়েছে কথিত মানবতার ধারকবাহকদের হাতে, সেসব চিত্র তুলে না ধরাই পশ্চিমা মিডিয়া নারীর সম্মান কতটুকু করে সেটা আমরা বুঝতে পারি। এসব জায়গায় হওয়া নারীর ওপর শোষণ ও নির্যাতন পশ্চিমা সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। কোনো জায়গায় যদি তাদের হাতে না হয়, তাহলে তাদের চোখের সামনে হয়েছে। অন্যদিকে মুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম নারীদের বন্ধ্যা করার যে মিশন নিয়ে তারা নেমেছে, সেটাকেই বা কী করে ভুলতে পারি! অনেক দেশে তারা মুসলিম নারীদের গর্ভনিরোধক ওষুধ খেতে বাধ্য করে।

নারীর সম্মানে সবচেয়ে বড় চপেটাঘাত হলো, 'নারীদের দিয়ে ব্যবসা করা।' এসব তো বিশ্বের সভ্য দেশগুলোতে চলে! সেখানে নারীদের ওপরে কত রকমের নির্যাতন-নিষ্পেষণ হয়, তার কোনো ইয়ত্তা নেই!

জাতিসংঘের ধামাচাপা দেওয়া পরিসংখ্যানেও যদি দেখি, তবে দেখা গেছে প্রতি বছর সাত লাখের ওপরে নারী পাচার হচ্ছে। তাদেরকে বিভিন্ন কদর্য কাজে লাগাচ্ছে এরা। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নারী নির্যাতনের শিকার।

নারী নির্যাতনের ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে নারীরা প্রবল ভীত হয়ে যায়, তলপেটের ব্যথা, ডাইরিয়া, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দেয়। কারও এ শারীরিক বেহাল অবস্থা জীবনভর থাকে, কেউ দেখা গেছে মানসিকভাবে পুরো জীবনই বিপর্যস্ত থাকে। এদের কেউ কেউ মদ ও নেশার আশ্রয় নেয় পূর্বের স্মৃতি ভোলার উদ্দেশ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল রিপোর্ট বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন নারী পুরুষের হাতে প্রহারের শিকার হয়। প্রতি বছর সাত লাখের মতো নারী ধর্ষণের শিকার হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর ৮১ মিলিয়ন স্ত্রী যৌন সহিংসতার শিকার হয়!

এক গবেষণায় দেখা গেছে, ফ্রান্সে ৯৫% সহিংসতার শিকার হয় নারীরা!

কানাডায় ৬% পুরুষ নিজ স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করে।

ভারতে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জন নারী সহিংসতার শিকার হয়। ভারতের ৪০% নারী হয়তো মারধর অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়।

পেরুতে প্রতি বছর পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা সকল মামলার মধ্যে ৭০% মামলা হচ্ছে নারী নির্যাতনের!

এভাবে প্রতিনিয়ত পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নারীদের সম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য নামের আড়ালেও নারী নির্যাতন চলছে যেমন : হুমকি প্রদান, সম্পদের জন্য জোর করা। তা ছাড়া নারীর নারীত্বকে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মতো নিকৃষ্ট ব্যবহার তো আছে, অভিনেত্রী বানানোর নামে নারী নির্যাতন, মডেল বানানোর নামে নারী নির্যাতন প্রভৃতির কথা না-ই বা বললাম।

অন্যদিকে পর্নো ইন্ডাস্ট্রি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে যুবতিদের কিনে নিচ্ছে নোংরা ফিল্মগুলো তৈরির জন্য, তাদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করানোর জন্য।

২০০৪ সালের ৫ মার্চ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল 'নারী নির্যাতন' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশ করে।

যদিও তারা এসব রিপোর্টে নারী নির্যাতন নিয়ে বলছে এবং সারা বিশ্বের রিপোর্ট তুলে ধরছে; কিন্তু এসব রিপোর্ট আসল অবস্থার চিত্রায়ণ করতে পারেনি। বাস্তবতা এরচেয়ে বহুগুণ ভয়ানক।

অনেক নারী সম্মান হারানোর ভয়ে তার ওপর কৃত নির্যাতনের কথা মুখ ফুটে বলে না। অনেকে লজ্জায় বলে না। অনেকে এ ভয়ে কিছু বলে না যে, এসব প্রকাশ করলে আরও বেশি সহিংসতার মুখে পড়তে হবে তাকে।

জাতিসংঘ, WHO-সহ অন্যান্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীর ১৭% নারী সারা জীবনের মধ্যে একবার হলেও মারধর বা সহিংসতার সম্মুখীন হন। আর ১০% নারী ধর্ষণের শিকার হন।

অন্যদিকে পৃথিবীতে এখন প্রায় ৬০ মিলিয়ন কন্যাসন্তান জীবিত থাকত; কিন্তু তাদের অস্তিত্বই নেই পৃথিবীতে। বিভিন্ন দেশের গর্ভপাত করার ফল এটা। তারা সন্তান চায় না, অথবা বিশেষ করে কন্যাসন্তান চায় না বলে গর্ভপাত করে ফেলে। ইসলাম কি গর্ভপাত হারাম করেনি? (হ্যাঁ, যদি কখনো কোনো নারীর প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন হতে পারে।)

ইসলাম কি জাহিলি যুগের নবাগত কন্যাসন্তান প্রোথিত করা হারাম করেনি?

পারিবারিক নির্যাতন

পরিবারেও কয়েকভাবে নির্যাতন হয়। শারীরিক নির্যাতন যেমন চড়-থাপ্পড়, লাথি মারা, পা দিয়ে মাড়ানো, প্রবল প্রহার করা থেকে শুরু করে মানসিক নির্যাতন যেমন : ভয় দেখানো, হেয় করা, লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, মিলিয়ন মিলিয়ন নারী তার জীবনে মারধরের শিকার হয় অথবা যৌনসম্ভোগের জন্য তাদের জবরদস্তি করা হয় অথবা যেকোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

জাতিসংঘের রিপোর্ট মোতাবেক যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন নারী তার স্বামীর হাতে প্রহারের শিকার হয়।

কানাডায় প্রতি বছর ৬১ মিলিয়ন ডলার ওঠে নারী নির্যাতনের জরিমানা হিসেবে। এ জরিমানা দিয়ে উক্ত নারীর শারীরিক ক্ষতির চিকিৎসা করা হয় এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

নিউজিল্যান্ডে ২০% নারী তার স্বামীর হাতে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

রাশিয়াতে প্রতিদিন ৩৬ হাজার নারী তার স্বামীর হাতে প্রহারের শিকার হয় বলে একটি বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে।

২০০০ সালে স্পেনে প্রতি ৫ দিনে একজন নারী নিহত হয়েছে তার স্বামীর হাতে। ২০০৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ২ জন নারী নিহত হয়েছে তার স্বামীর হাতে।

এসবই পশ্চিমাদের পরিসংখ্যান। এত ভয়াবহ চিত্র! আর তারাই কি না বলছে, ইসলাম নারী নির্যাতনকে স্বীকৃতি দিয়েছে!

কেন তারা নিজেদের বাস্তবতার দিকে তাকায় না?! নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে! ফলে তারা ইসলামের প্রতি নিজেদের কালো হিংসার কারণে অন্ধ হয়ে গেছে!

যৌন সহিংসতা

যৌন সহিংসতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তর হচ্ছে ধর্ষণ। একই সাথে আছে এসব ধর্ষণের ফলে হওয়া গর্ভাবস্থা। আছে ব্যভিচারের আধিক্যের ফলে হওয়া বিভিন্ন যৌনরোগ। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এইডস। তা ছাড়া ধর্ষণের শিকারের লজ্জা লুকোতে অনেক নারীর ধর্ষণের খবর অজানাই থেকে যায়। তাই যত ধর্ষণ হয়, তারচেয়ে অনেক কম রিপোর্টে আসে। আর এসব ধর্ষণের কেইসে শাস্তি হয় না বললেই চলে। শাস্তি হলেও সেটা বিরল।

রিপোর্টমতে, সারা বিশ্বের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন নারী ধর্ষণ বা ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয় তার জীবনে।

মার্কিন বিচার-বিভাগের ২০০০ সালের রিপোর্ট হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৯০ সেকেন্ডে একজন নারী ধর্ষিত হয়।

ফ্রান্সে প্রতি বছর ২৫০০ নারী ধর্ষিত হয়।

যুদ্ধকালে নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতনের সহিংসতা মহামারি আকার ধারণ করেছে। এদিকে গণধর্ষণকে যুদ্ধের একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে বিধর্মীরা। ইরাক যুদ্ধের সময় ও ২০০৩ এর এপ্রিলে যুদ্ধের পরে বাগদাদে ৪০০'র অধিক আট বছর বয়সী মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে আমেরিকানদের হাতে। [তথ্যসূত্র : হিউম্যান রাইটস ওয়াচ]

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় যথাক্রমে ২০ হাজার ও ৫০ হাজার নারী পাঁচ মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৯৯২ সালে।

কসোভোর গ্রামাঞ্চলে ৩০-৫০% নারী এমন ছিল, যারা সার্ভিয়ান সেনাদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়ে গভাবস্থায় বা সন্তান প্রসবের অবস্থায় ছিল। [১৯৯২ সালের অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট]

কাদের হাতে হয়েছে এসব পাশবিকতা? এসব কি ইউরোপিয়ানদের হাতে হয়নি? এসব কি সভ্যের বেশধারী আমেরিকানদের হাতে হয়নি? মানুষের কানে কি এসব পৌছে না, মানুষ কি এসব দেখে না যে, সভ্যতার ধ্বজাধারী এসব দেশে কী ঘটছে?!

এসব রাষ্ট্র নারীকে যথাযথ সম্মান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলে, নারী নির্যাতনের একটা বিশাল অংশ অজানায় থেকে যায়।

রিপোর্ট অনুযায়ী নারী নির্যাতনের এসব খবর আমাদের কাছে না পৌছার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি কারণ হচ্ছে, নির্যাতনের কথা প্রকাশ করলে অপরাধকারী তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ভয় আছে, সে নারীর কাছে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ নেই, নারীর জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কাজ করে, সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা, নির্যাতনের কথা মুখ ফুটে বললেও ন্যায়বিচার পাওয়ার কোনো আশা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের কেইসের মাত্র ১৬% নারী পুলিশের কাছে যায়। যদি পুলিশ তাদের নাম না প্রকাশের নিশ্চয়তা দেয়, তবে ধর্ষণের কেইসের ৫০% নারী পুলিশের কাছে গিয়ে কেইস ফাইল করার সম্ভাবনা আছে, আর বাকি ৫০% তখনও কেইস ফাইল করতে আসবে না।

ব্রিটেনের ২০০৩ সালের পরিসংখ্যান মোতাবেক ধর্ষণের কেইসের মাত্র ১৩% নারী পুলিশের কাছে আসে।

দণ্ডিতের শাস্তি থেকে পার পেয়ে যাওয়া

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনকারীর কোনো শাস্তি হয় না। অনেক দেশে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো আইনই নেই! ২০০৩ সালে পৃথিবীতে ৫৪টি দেশে নারী বৈষম্যের আইন থাকলেও ৭৯টি দেশে গৃহাভ্যন্তরে হওয়া নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কোনো আইনই ছিল না।

ফ্রান্সের হিউম্যান মেডিসিন ফাউন্ডেশন একটি গবেষণা শুরু করে, ৭ বছরের পরিসংখ্যানে তারা বলে নারী-মৃত্যুর ৫১% কেইসে তার স্বামীই হত্যাকারী হয়।

Deplomatic World মাসিক পত্রিকার ২০০৪'র অক্টোবর সংখ্যায় এসেছে নারী নির্যাতনের এক নৃশংস রিপোর্ট :

- জার্মানিতে প্রতি ৪ দিনে ৩ জন নারী নিহত হয়।
- ইংল্যান্ডে প্রতি ৩ দিনে ১ জন নারী নিহত হয়।
- ফ্রান্সে প্রতি ৫ দিনে ১ জন নারী নিহত হয়। অর্থাৎ প্রতি মাসে ৬ জন নারী নিহত হয়।
- স্পেনে পারিবারিক সংঘাতে প্রতি ৪ দিনে ১ জন নারী নিহত হয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টের সারাংশে বলে, আজকের এ পৃথিবীতে নারী নির্যাতনে বহু রকম মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে পরিবার স্তরে প্রতি বছর ৬০০ নারী প্রাণ হারায়। অর্থাৎ প্রতিদিন ২ জন নারী নিহত হয়।

উল্লেখ্য যে, পারিবারিক সংঘাত কেবল একটা অঞ্চলে বা একটা স্তরের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উদাহরণত ফ্রান্সের পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারী নির্যাতনের

এমন ঘটনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে নির্যাতনকারী যথেষ্ট শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা, সমাজের বিশেষ স্থানধারী।

দুঃখজনক হচ্ছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও এটা হচ্ছে। মাঠপরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তিউনিসিয়ার ৩৩% নারী, মিসরের ৩৪% নারী, ফিলিস্তিনের ৫৪% নারী পারিবারিক সংঘাতের শিকার হচ্ছে।

পশ্চিমাদের দুরবস্থা দেখো

বিয়ে ছাড়াই যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া কিশোরীদের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এসব কিশোরীদের তারা নাম দিয়েছে Teen Moms। এমন কিশোরীদের সংখ্যা অনেক হারে বেড়ে গেছে, যারা এক বা একাধিক পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখছে। ফলে মা-বাবাহীন শিশুদের সংখ্যাও বহুগুণে বেড়ে গেছে।

এখানেই তো ক্ষান্ত নয় তারা। তাদের যৌন উন্মাদনা এখন স্বাভাবিক নারী-পুরুষে জমে না। তাই তারা নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর পন্থা বেছে নিচ্ছে। ফলে তৈরি হয়েছে হোমোসেক্সুয়াল ও লিসবিয়ান নামের নতুন দুটি দল।

গর্ভপাত নামক মহামারি

গর্ভপাত এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। WHO-এর এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, ১৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৪৬ মিলিয়ন নারী প্রতি বছর গর্ভপাত করছে। মোট গর্ভবতী নারীর সংখ্যা বছরে ২১০ মিলিয়ন। সে হিসেবে গর্ভবতী নারীদের মধ্যে প্রায় ২২% নারী প্রতি বছর গর্ভপাত করছে!

পরিসংখ্যানে এটাও বলা আছে যে, এর মধ্যে ২৬ মিলিয়ন নারী অফিসিয়ালভাবে গর্ভপাত করছে। আর বাকি ২০ মিলিয়ন নারী আনঅফিসিয়ালভাবে গর্ভপাত করছে। কিন্তু যেসব দেশে গর্ভপাত করা নিষিদ্ধ, সেসব দেশের অবস্থা নিরূপণ করা আরও বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এ পরিসংখ্যানের তুলনায় অবস্থা আরও বেশি ভয়াবহ।

পূর্ব ইউরোপে গর্ভপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে প্রতি হাজারে ৯০ জন নারী গর্ভপাত করছে।

অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপে প্রতি হাজারে ১১ জন নারী গর্ভপাত করছে।

মিসরে প্রতি হাজারে ২৩ জন নারী গর্ভপাত করছে। WHO-এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকায় প্রতি হাজারে ৩৯ জন নারী গর্ভপাত করছে।

বিপর্যয় স্পষ্ট হয়েছে আরও বেশি রূপে অবিবাহিতদের মধ্যে। কারণ, এখানে প্রতি হাজারে ৭৫ জন নারী গর্ভপাত করছে। গবেষকদের মতে, প্রায় অর্ধেক আমেরিকান নারী (৪৩%) জীবনে অন্তত একবার গর্ভপাত করেছে।

এইডস ও নারী

Unifem তার সর্বশেষ রিপোর্টে প্রকাশ করেছে,

এইডসে আক্রান্তদের প্রায় ৫১% হচ্ছে নারী। অর্থাৎ এইডসে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের চেয়েও বেশি। প্রতিদিন এইডসে আক্রান্ত হওয়া ১৬ হাজার মানুষের মধ্যে ৫৫% হচ্ছে নারী!

বর্তমানে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় এইডসকে। এমনই অবস্থা বিরাজ করছে ইউরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকায়।

প্রতি বছর বিশ্বে ৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর রোগ কোনো না কোনো দিক থেকে এইডসের সাথে সম্পর্কিত।

এটা তো সবার জানা যে, যারা নিকৃষ্ট পন্থায় যৌন সম্পর্ক করে অথবা এইডসে আক্রান্তদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তারাই এইডসে আক্রান্ত হয়। কিন্তু তুমি জানো কি?

- যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ১৯০০ তরুণী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। আর তার মধ্যে ২০% তরুণী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে তার বাবার দ্বারা!

- আমেরিকায় প্রতি বছর মিলিয়নের মতো শিশু হত্যা করা হচ্ছে ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে।

- ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ১৭০ জন তরুণী যৌন সহিংসতায় শারীরিক আঘাত পাচ্ছে।

- স্পেনে পুলিশবিভাগ প্রতি বছরে ৫ লাখেরও অধিক নারী নির্যাতনের কেইস ফাইল করছে।

- আমেরিকার পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর ৬ মিলিয়ন নারী প্রচণ্ড মারধরের শিকার হয়।

- ৮ মিলিয়ন আমেরিকি নারী সন্তানদের নিয়ে একাকী বাস করে জীবন যাপন করে যাচ্ছে অন্যদের কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই।

- গত ১০ বছরে প্রায় ১ মিলিয়ন নারী পতিতাবৃত্তিতে যুক্ত হয়েছে জীবিকা নির্বাহের জন্য।

পশ্চিমারা নারীর অধিকার বলে বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে, নারী স্বাধীনতার স্লোগান দিতে দিতে মোটেই দম ফেলে না। কোথায় তাদের সে নারী অধিকার? কোথায় নারী স্বাধীনতা? কোথায় নারীর প্রতি সম্মান?! এই কি তাদের নারী অধিকারের নমুনা?! এমন নারী অধিকারই কি তারা মুসলিম নারীদের দিতে চাচ্ছে? নিজেদের কামনা চরিতার্থ করতে মুসলিম নারীদের অর্ধউলঙ্গ করতে চাইছে! মুসলিম নারী তাদের জন্য মদ পরিবেশন করবে, অথবা তাদের সমুদ্রতীরে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে এমনটাই কি তারা আশা করছে! যেকোনো সমাজকে দখল করার সবচেয়ে সহজ পথ হচ্ছে, সে সমাজের নারীদের চরিত্রহীন করে দেওয়া, যেমনটা এখন পশ্চিমা চিন্তাবিদরা আওয়াজ তুলেছে!

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রিটেনে পুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখা ৩৭% নারী তার স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডের দ্বারা মারধরের শিকার হয়।

ফ্রান্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, ফ্রান্সে বছরে ২ মিলিয়নেরও বেশি নারী মারধরের শিকার হচ্ছে।

মানচিত্রের অন্যদিকের দেশ আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি নারী নির্যাতন হয়। স্বামীরা স্ত্রীদের যেভাবে ইচ্ছা নির্যাতন করছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৫৯% পুরুষ তাদের অধীনে থাকা নারীকে মারধর করে।

কোথায় এসব জঞ্জাল আর কোথায় সুমহান ইসলাম! এরা এসব জঞ্জাল দিয়ে ইসলামের ওপর আক্রমণ করতে চায়?! তারা বলে, 'আল্লাহর কিতাবে নারীদের প্রহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' এমনকি তারা ড. ইউসুফ কারজাবির 'হালাল-হারাম' বইটা ফ্রান্সে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এ বইতে নারীকে প্রহার করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ইসলাম যে রকম প্রহারের বৈধতা দিয়েছে, সে প্রহার হবে নারীকে সঠিক পথে আনার সর্বশেষ চেষ্টা। আর প্রহারের জন্য ব্যবহার করতে বলেছে মিসওয়াকের মতো কিছুকে। এখানে তো নারী নির্যাতন উদ্দেশ্য নয়; বরং নারীকে সঠিক পথে রাখা উদ্দেশ্য। কোথায় এ রকম শিক্ষামূলক প্রহার আর কোথায় পশ্চিমাদের নারী নির্যাতন!

বিদায় হজের দিন রাসুল ﷺ বলেন :

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ، أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

'নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ। আর তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় কোনো পুরুষকে তোমাদের ঘরে স্থান দেবে না। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে হালকা প্রহার করবে।'[১০১]

---

১০১. সহিহ মুসলিম : ১২১৮, সুনানু আবি দাউদ : ১৯০৫।

স্ত্রীকে প্রহার করার বিষয়ে ইসলামের বিধান

শাইখ মুহাম্মাদ গাজালি বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহ প্রভৃতি শরিয়তের দলিলসমূহে কেবল দুই জায়গাতে নারীকে প্রহার করার বৈধতা পাওয়া গেছে। এক. নারী অবাধ্য হলে। অর্থাৎ অহংকার দেখালে, স্ত্রী যদি স্বামীর ওপর অহংকার দেখায়, তাকে মানতে অস্বীকার করে, তখন সে নারীকে প্রথমত দাম্পত্য সম্পর্কের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবে। রাগান্বিত অবস্থায় তার থেকে পৃথক রাত যাপন করবে। দুই. এ ধরনটি বেশি গুরুতর। যদি স্ত্রী বাড়িতে এমন কাউকে জায়গা দেয়, যাকে নিয়ে স্বামীর মনে তার স্ত্রী ও উক্ত পুরুষের মধ্যে কোনো খারাপ সম্পর্কের সন্দেহ জাগে, তখন স্ত্রীকে আদব শেখানোর জন্য প্রহার করার বৈধতা আছে।

মিসওয়াকের মতো কিছু দিয়ে স্ত্রীকে আদব শেখানোর ব্যাপারে মুফাসসিরগণ একমত। তাদের মতে, প্রহার কোনোভাবে মারাত্মক আঘাতের মাধ্যমে হবে না, আর মুখের ওপরও আঘাত করা যাবে না। কেননা, হাদিসে এসেছে, (وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ) 'মুখের ওপর প্রহার কোরো না এবং তাকে গালমন্দ কোরো না।'[১০২]

প্রহারের কথা বলা হয়েছে হালকাভাবে; তাই কোনোভাবেই কেউ তার স্ত্রীকে প্রহারের ক্ষেত্রে এ সীমা লঙ্ঘন করতে পারবে না। আর এমন কিছু ভাবতে পারবে না যে, তার এ প্রহারের জন্য তাকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে না।'

যে অবস্থায় স্ত্রীকে প্রহার করা নিষিদ্ধ

তিন অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে না। অবাধ্য স্ত্রীকে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহার করতে পারবে না, যতক্ষণ না প্রহারের আগের দুটি স্তরের করণীয় আদায় করছে। এক. উপদেশ দেওয়া। দুই. পৃথক বিছানায় রাত যাপন করা।

---

১০২. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪২, মুসনাদু আহমাদ : ২০০১১।

ইসলাম কষ্টদায়ক প্রহার করতে নিষেধ করেছে। যেমন হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ، أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) 'আর তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় কোনো পুরুষকে তোমাদের ঘরে স্থান দেবে না। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে হালকা প্রহার করবে।'[১০৩]

আতা ﷺ বলেন, 'আমি ইবনে আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, "হালকা প্রহার কী?"

ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, "মিসওয়াক বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে প্রহার করা।"'

আর আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধমূলক প্রহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

'অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করো না।'[১০৪]

আমাদের মনে রাখা উচিত, রাসুল ﷺ নয় বিয়ে করেছেন; কিন্তু কখনো কোনো দিন কোনো স্ত্রীকে একবারের জন্যও তিনি প্রহার করেননি। বরং এমন পুরুষকে ভর্ৎসনা করেছেন যে পুরুষ দিনের বেলায় স্ত্রীকে মারধর করে, আর রাতের বেলায় তার সাথে একই বিছানায় শুতে লজ্জা করে না।

রাসুল ﷺ বলেন :

بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا

'তোমাদের কেউ কেন তার স্ত্রীকে ষাঁড় বা গোলামকে পিটানোর মতো পিটাবে? পরে হয়তো সে আবার তার সাথে গলাগলিও করবে।'[১০৫]

---

১০৩. সহিহ মুসলিম : ১২১৮, সুনানু আবি দাউদ : ১৯০৫। (এ আলোচনায় বইয়ে উল্লেখিত ইবারতটি হাদিসগ্রন্থসমূহে না পাওয়ায় এ হাদিসটি আমরা উল্লেখ করেছি। - অনুবাদক)
১০৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।
১০৫. সহিহুল বুখারি : ৬০৪২।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে উচ্চ সম্মান

কোথায় এসব পশ্চিমারা আর কোথায় ইসলাম। এসব লোক নারীকে কেমন সম্মান দিয়েছে? ! আর ইসলাম কেমন সম্মান দিয়েছে?

মেয়ে হিসেবে ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে, সে রকম আর কেউ দিতে পারেনি। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন কিংবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে যদি তাদের সাথে ভালো আচরণ ও প্রতিপালন করে, আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[১০৬]

ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে। 'এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "লোকদের মাঝে আমার সদাচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে?"

রাসুল ﷺ : তোমার মা।

সাহাবি : এরপর কে?

রাসুল ﷺ : তোমার মা।

সাহাবি : এরপর কে?

রাসুল ﷺ : তোমার মা।

সাহাবি : এরপর কে?

রাসুল ﷺ : তোমার বাবা।'[১০৭]

---

১০৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৯১৬।

১০৭. সহিহুল বুখারি : ৫৯৭১, সহিহ মুসলিম : ২৫৪৮।

পশ্চিমারা নিজেদের দেশগুলোতে নারীদের ওপর হওয়া নির্যাতন ও নিষ্পেষণে চোখ মুদে রাখে। আর আমাদের দ্বীনের ওপর হঠকারিতা দেখিয়ে আমাদের নারীদেরকে বেহায়াপনা-নির্লজ্জতার দিকে ডাকে নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার নাম দিয়ে। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, যেন তারা সেসব জানেই না!

অথচ স্বয়ং রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

'নারীরা তো পুরুষের মতোই।'[১০৮]

প্রতিটি মুসলিমকে তার পরিবারের প্রতি সদাচরণ করার উৎসাহ দিয়ে রাসুল ﷺ বলেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।'[১০৯]

যখন জীবন্ত প্রোথিতকে জিজ্ঞেস করা হবে

ইসলাম আসার আগে নারীরা ছিল সস্তা পণ্যের মতো। তাদের সাথে পশুর মতো আচরণ করা হতো। বর্ণিত আছে, সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল رضي الله عنه যখন রাসুল ﷺ-এর সামনে বসতেন, তখন তার মুখে গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠত।

নবিজি ﷺ তার এ অশেষ উদ্বেগের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, জাহিলি যুগে আমি আমার স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে এক দীর্ঘ সফরে গিয়েছিলাম। কয়েক বছর পর ফিরে এলাম। এসে দেখলাম, আমার স্ত্রী

১০৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৩৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৬১৯৫।
১০৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছে। আমি দেখলাম, সে শিশুদের সাথে খেলছে। শিশুরা যেমন খুবই সুন্দর হয়, সেও তেমন অত্যন্ত সুন্দরী ছিল।

নিষ্পাপ শিশুটি আনন্দের সাথে খেলছিল। এরপর আমি তাকে হাতে ধরে নিয়ে তার মাকে বললাম, "তাকে সাজিয়ে দাও।" সে বুঝতে পারছিল যে, আমি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে যাচ্ছি!

প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে কাঁদতে তার মা তাকে সাজিয়ে দিল। চিন্তায় উদ্বেগে সে অস্থির হয়ে গেল। সাজাতে সাজাতে বলতে লাগল, "ওগো, তুমি এ আমানতে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না!"

সাজিয়ে দেওয়ার পর আমি এ অনুপম সুন্দর শিশুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কোনো উপত্যকায় গেলাম। সেখানে আগে একটা কুয়ো দেখেছিলাম, সেটা খুঁজতে লাগলাম। একসময় সে কুয়োর পাশে এলাম। কুয়োতে এক ফোঁটা পানিও নেই।

কুয়োর পাশে দাঁড়িয়ে আমার ছোট্ট মেয়ের দিকে তাকালাম। তার নিষ্পাপ উজ্জ্বল চেহারা দেখে আমার মন নরম হয়ে এল। কিন্তু পরক্ষণেই তার বিবাহ, তার নির্যাতিত হওয়া, তাকে নিয়ে আমার যে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে, তার কথা ধীরে ধীরে আমার মনকে গ্রাস করল। আমার হৃদয় কঠিন হয়ে গেল।

আমি দুদিক থেকে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। একদিকে আমার নিষ্পাপ ছোট্ট কন্যা আর একদিকে লজ্জা ও অপমানের সম্মুখীন হওয়া।

সবশেষে আমি আমার সব শক্তি একত্র করে তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলাম। তাকিয়ে দেখতে থাকলাম, নিশ্চিত হতে চাইলাম সে মরেছে কি না! কিছুক্ষণ পর আমি তাকে বলতে শুনলাম, "বাবা! বাবা! আমানতের বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে।" সে বারবার বলতে থাকল। একসময় তার কণ্ঠ আর শোনা গেল না!

আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুল, যখনই এ ঘটনা মনে পড়ে, তখন ভীষণ চিন্তা-উদ্বেগে আমি মৃতপ্রায় হয়ে যাই। আমি তখন আকাঙ্ক্ষা করতে থাকি, আমি যদি বিস্মৃতির গভীরে হারিয়ে যেতাম।'

নবিজি ﷺ তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন আব্দুল্লাহর গাল বেয়ে দাড়ি টপকে চোখের পানি পড়ছে। নবিজি ﷺ তার উদ্দেশে বললেন :

'আব্দুল্লাহ, যদি জাহিলি যুগের কোনো অপরাধের জন্য কারও ওপর হদ কায়িম করতাম আমি, তাহলে তোমার ওপর হদ কায়িম করতাম এখন। কিন্তু যে ইসলাম গ্রহণ করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়।'

কন্যাসন্তানের প্রতিপালন

কন্যাসন্তানের প্রতিপালনের ব্যাপারে নবিজি ﷺ একটি অনুপম নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। কন্যাসন্তানের প্রতিপালনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

'যাকে এরূপ কন্যাসন্তানের ব্যাপারে কোনোরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'[১১০]

ইসলাম উৎসাহ দিয়েছে মা-বাবা যেন উত্তমভাবে মেয়েদের প্রতিপালন করে। হাদিসে এসেছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ

'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকে আর সে তাদের বাসস্থান দানে (আশ্রয় দানে) এবং তাদের দুঃসময়ে ধৈর্যধারণ করে, বিশেষ করে তাদের

১১০. সহিহুল বুখারি : ১৪১৮, সহিহ মুসলিম : ২৬২৯। পুরো হাদিসটি হলো, আয়িশা রা. বলেন, 'এক মহিলা তার দুটি কন্যাশিশু সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার নিকট একটি খেজুর ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে খেজুরটি নিজে না খেয়ে তা দুভাগ করে কন্যাদুটিকে দিয়ে দিল। এরপর মহিলাটি বেরিয়ে যাওয়ার পর নবিজি ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট এ ঘটনা জানালে তিনি বললেন, "যাকে এরূপ কন্যাসন্তানের ব্যাপারে কোনোরূপ পরীক্ষা করা হয়, সে কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।"'

প্রতি দয়া করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'

এ কথা শুনে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর রাসুল, যদি দুটি কন্যাসন্তান থাকে?'

রাসুল ﷺ বললেন, 'দুটি কন্যাসন্তান থাকলেও এ ফজিলত।'

এবার সাহাবি জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর রাসুল, একটি কন্যাসন্তান থাকলে?'

রাসুল ﷺ বললেন, 'একটি কন্যাসন্তান থাকলেও।'[১১১]

ধারণা শুদ্ধ করে নাও

নারী সম্মানের অধিকারী। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

'নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি।'[১১২]

আদম-সন্তান দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়ই উদ্দেশ্য।

রাসুল ﷺ-এর হাদিস (مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ) 'নারী বুদ্ধি ও দ্বীনের দিক থেকে দুর্বল...।'[১১৩] এবং (فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ) 'নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড়টি বেশি বাঁকা।'[১১৪] এ হাদিসদ্বয় নিয়ে অনেকে ভুল ধারণা করে বসে।

এ হাদিসগুলোর অর্থ অনেকে ভুল বুঝে থাকে। এ হাদিসগুলোতে নারীকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নারীর শারীরিক কাঠামো কেমন—তা উঠে

---

১১১. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৩৪৬।
১১২. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭০।
১১৩. সহিহুল বুখারি : ৩০৪, সহিহ মুসলিম : ৭৯।
১১৪. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩১, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।

এসেছে। এ হাদিসগুলো নারীর সম্মান কম করতে বলে না; বরং নারীর সম্মান কুরআন ও হাদিস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

পুরুষের মতোই নারীকেও দুনিয়াতে তার সকল নাগরিক কাজ ও অপরাধমূলক কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

'যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব।'[১১৫]

নারীও একজন মানুষ, যার নিজস্ব সত্তা ও ব্যক্তিত্ব রয়েছে, সে তার জীবনসঙ্গী বাছাই করে নেওয়ার জন্য স্বাধীন। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

'কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।'[১১৬]

যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করে, তাহলে স্বামীর স্বীকৃতিক্রমে সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে অথবা কাজির সিদ্ধান্তমতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এ ভিত্তিতে যে, স্বামী তাকে যে মোহর দিয়েছিল, সেটা ফেরত দেবে যদি স্বামীর পক্ষ থেকে সে নারীর কোনো ক্ষতি না করা হয়।

সাবিত বিন কাইসের স্ত্রী রাসুল ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন, "আল্লাহর রাসুল, সাবিত আমাকে দ্বীন ও সচ্চরিতের বিপরীত কিছুতে জোর করে না; কিন্তু আমি কুফরির ভয় করি।"

রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি তার দেওয়া বাগান ফিরিয়ে দেবে?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

---

১১৫. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।
১১৬. সহিহুল বুখারি : ৫১৩৬, সহিহ মুসলিম : ১৪১৯।

এরপর তিনি বাগান ফিরিয়ে দিলেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন।'

নারী একজন পূর্ণ মানুষ, যে পারিবারিক জীবনে পুরুষের অংশীদার হয়। কারণ, যদি নারী পুরুষের জন্য পোশাকস্বরূপ হয়, তাহলে পুরুষও নারীর জন্য পোশাকস্বরূপ। যেমনই আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।'[১১৭]

নারী-পুরুষ পরস্পরকে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। আল্লাহ তাআলা পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন উপার্জনের জন্য ও পরিচালনা করার জন্য। আল্লাহ বলেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একককে অন্যের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এ জন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধনসম্পদ হতে ব্যয় করে।'[১১৮]

আর নারীদের প্রস্তুত করেছেন সন্তান প্রতিপালন ও গৃহ-ব্যবস্থাপনার জন্য। রাসুল ﷺ বলেন :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ

'নারী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক এবং তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'[১১৯]

নারীর সামাজিক দায়িত্ব ও দাওয়াতের কাজের দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১১৭. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৭।

১১৮. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

১১৯. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪৪৯১।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেয় দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।'[১২০]

নারীর আর্থিক মালিকানা

আজকের যুগের নারী আন্দোলন ছাড়াই, পার্লামেন্টের ভোটাভুটি ছাড়াই ইসলাম নারীকে না-চাইতেই এ অধিকার দিয়ে দিয়েছে। ইসলামের বিধান হচ্ছে, বিবাহিত নারী তার পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। নারীর নিজস্ব সম্পদ স্বামীর সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপমুক্ত থাকবে। স্ত্রীর সম্পদ থেকে স্বামী একটুও নিতে পারবে না। স্বামীর জন্য এটা জায়িজ হবে না।

তবে যদি স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে দেয়, তবেই কেবল স্বামী সেখান থেকে কিছু নিতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

'আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।'[১২১]

স্বামী তার স্ত্রীর সম্পদের কোনো লেনদেন করতে পারবে না, তবে অনুমতিসাপেক্ষে করতে পারবে।

---

১২০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৭১।
১২১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৪।

নারী কি একেবারেই খারাপ?

'নাহজুল বালাগাহ' নামক গ্রন্থে আমিরুল মুমিনিন আলি বিন আবু তালিব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নারীর সবটাই মন্দ। অনিষ্টতা তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

এ উক্তি কি ইসলামের অবস্থান তুলে ধরেছে?

এ প্রশ্নের জবাবে ড. ইউসুফ কারজাবি বলেন :

'দুটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি :

এক. যেকোনো বিষয়ে ইসলামের অবস্থান নির্ধারিত হবে আল্লাহর বাণী ও রাসুলের হাদিসের মাধ্যমে। এ ছাড়া বাকি যা আছে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে, কখনো বর্জিত হবে।

দুই. সমালোচক ও গবেষকদের নিঃসন্দেহে জানা আছে যে, "নাহজুল বালাগাহ" গ্রন্থে আলি ؓ-এর দিকে নিসবতকৃত কিছু উক্তি সহিহ নয়। অর্থাৎ সনদ বিবেচনায় পরিত্যাজ্য। এ সিদ্ধান্তের ওপর গবেষকদের কাছে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে।

তাই "নাহজুল বালাগাহ"তে উল্লেখিত সব উক্তি দিয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করা যাবে না যে, দেখো, আলি ؓ কী বলছেন।

এমনকি যদি কেউ আলি ؓ থেকে এ কথাটি সহিহ সনদেও বর্ণনা করে থাকে, তবুও এ কথাটির প্রত্যুত্তর করা আবশ্যক। কারণ, এটা দ্বীনের উসুল ও ইসলামি নুসুসের একদম বিপরীত ও সাংঘর্ষিক।

আলি বিন আবু তালিব ؓ কীভাবে এ কথাটি বলতে পারেন; অথচ তিনি কুরআন থেকেই জেনে নিয়েছেন যে, সৃষ্টিগত দিক থেকে, আমল ও আমলের প্রতিদানের দিক থেকে নারী-পুরুষ সমস্তরের। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

'তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, "তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক কোনো আমলকারীরই কর্মফল আমি নষ্ট করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।"'[১২২]

রাসুল ﷺ বলেন :

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ

'সতি নারী, ভালো বাসস্থান ও ভালো বাহন (লাভ করা) আদম-সন্তানের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত।'[১২৩]

তিনি আরও বলেন :

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

'আল্লাহ যাকে নেককার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে অর্ধেক দ্বীন পালনে সাহায্য করেছেন। তাই সে যেন বাকি অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।'[১২৪]

أَرْبَعٌ مَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: (ومنها) وَزَوْجَةً لَا تُتْبِعُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ خَوْنًا

'যাকে চারটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, তাকে দুনিয়া-আখিরাতের সব কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এমন স্ত্রী, যে তার নিজের ব্যাপারে এবং তার স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে না।'[১২৫]

১২২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯৫।
১২৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৪৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৮০।
১২৪. শুআবুল ঈমান : ৫১০১, মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৮১।
১২৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া : ৩/৬৫।

রাসুল ﷺ নিজের সম্পর্কে বলেন :

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

'পার্থিব জিনিসের মাঝে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে। আর সালাতে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।'[১২৬]

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সুস্পষ্ট। তাহলে কী করে আলি رضي الله عنه এসবের বিরোধিতা করে বলতে পারেন যে, নারীর সবটাই মন্দ!

যদি সত্যিই এ উক্তি আলি رضي الله عنه-এর হয়ে থাকে, তবে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করব, 'আপনার স্ত্রী, আপনার দুপুত্র হাসান-হুসাইনের মায়ের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

স্বয়ং আলি رضي الله عنه কি তাঁর স্ত্রী ও নারীদের নেত্রী ফাতিমা رضي الله عنها-এর সম্পর্কে এমন কথা বরদাস্ত করবেন! মুসলিমদের কেউ কি এমন কথা বরদাস্ত করবেন!

অন্যদিকে স্বয়ং নবিজি ﷺ আমাদেরকে নারীর ফিতনা থেকে সতর্ক করে বলেছিলেন :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

'আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।'[১২৭]

কোনো কিছু ফিতনার কারণ হওয়া থেকে সতর্ক করার অর্থ এ নয় যে, তার সবটাই খারাপ। বরং এ হাদিসের মর্ম হচ্ছে, এ জিনিসের মারাত্মক প্রভাব মানুষের ওপর পড়বে এবং এটা মানুষকে আল্লাহ ও আখিরাত থেকে বিমুখ করবে।

যেমন আল্লাহ তাআলা সন্তান ও সম্পদের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন :

---

১২৬. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৩৯, মুসনাদু আহমাদ : ১২২৯৪।
১২৭. সহিহুল বুখারি : ৫০৯৬।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এমন করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'[১২৮]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সম্পদকে ফিতনার কারণ বলেছেন, অন্যদিকে অন্য আয়াতে সম্পদকে ভালোও বলেছেন। আর সন্তান হচ্ছে আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামত; যদিও এ আয়াতে সন্তানকে ফিতনার কারণ বলা হয়েছে।

তাই বলা যায়, নারী ফিতনা থেকে সতর্ক করা সম্পদ ও সন্তানের ফিতনা থেকে সতর্ক করার মতো। এর অর্থ এ নয় যে, এসব পুরোটাই খারাপ। বরং এসবের সাথে এতটা চরমরূপে অন্তরকে লাগানো নিষিদ্ধ, যতটা কাউকে ফিতনায় লিপ্ত করে এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয়।'

তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক

আজিজে মিসরের এ বাক্য কুরআনে উঠে এসেছে এভাবে :

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

'নিশ্চয় তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক।'[১২৯]

আবার কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।'[১৩০]

---

১২৮. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯।
১২৯. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৮।
১৩০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭৬।

তাহলে কি নারীর ছলনা বা চক্রান্ত শয়তানের চক্রান্তের চাইতেও মারাত্মক?

এমন প্রশ্ন আসার কোনো কারণই নেই। কেননা, শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল হওয়ার আয়াতটি পড়লে প্রকৃত বিষয়টা বুঝে আসে। আল্লাহর ক্ষমতার মোকাবিলায় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল বলা হয়েছে। কারণ, প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর কাছে দুর্বল ও ছোট, আর আল্লাহ হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বড়। পুরো আয়াতটা হচ্ছে :

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'যারা ইমানদার, তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে আর যারা কাফির, তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।'[১৩১]

আর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, পুরুষের চক্রান্তের চেয়েও নারীর চক্রান্ত মারাত্মক। নারীর চক্রান্ত বেশি শক্তিশালী হওয়ার কারণ হচ্ছে, নারী পুরুষের চেয়ে শক্তিতে দুর্বল। আর যে শক্তিতে কোনো কিছু হাসিল করতে পারে না, সে ষড়যন্ত্র ও কৌশলে তা হাসিল করে।

১৩১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৭৬।

ষোড়শ অধ্যায়

ইমানের আলোর দিকে

সবচেয়ে বড় পরীক্ষা

যখন পরীক্ষার সময়টা ঘনিয়ে আসে, তখন অনেক বাড়িতে যেন প্রচণ্ড বিপদ নেমে আসে, জরুরি অবস্থা জারি হয়ে যায়, সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, প্রস্তুতি নিতে থাকে, সকলেই সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকে।

এমন প্রস্তুতি ও পরিশ্রম প্রশংসনীয় ও প্রতিদানের উপযুক্ত, যদি নিয়ত ঠিক রাখা হয়, যদি এ পরীক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

কিন্তু যে পরীক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের মধ্যে কে কে সে পরীক্ষার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছে? আমরা ভুলে আছি। ভ্রমে আছি। অথচ দুনিয়ার যে পরীক্ষাকে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি, তা চূড়ান্ত পরীক্ষার তুলনায় কতই না তুচ্ছ!

দুনিয়ার পরীক্ষা একটা নির্দিষ্ট বই অথবা নির্দিষ্ট শাস্ত্রের ওপরে হয়। অন্যদিকে আখিরাতের পরীক্ষায় যে বইটি নিয়ে আসা হবে, সেখানে পরীক্ষার্থীর ছোট-বড় কোনো কর্মই বাদ পড়বে না।

وَيَقُولُونَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

'আর তারা বলবে, "হায় ধ্বংস আমাদের, এটা কেমন কিতাব যে, ছোট-বড় কোনো কাজই ছেড়ে দেয়নি; বরং সবকিছুর হিসাব

রেখেছে।" তারা যা করেছে, তা সামনে উপস্থিত পাবে, আর আপনার প্রতিপালক কারও প্রতি জুলুম করবেন না।'[১৩২]

ছোট-বড় সব গুনাহ লেখা থাকবে :

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

'ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে।'[১৩৩]

দুনিয়ার পরীক্ষা নির্দিষ্ট পরীক্ষার হলে হয়—যেখানে চেয়ার বিছানো থাকে, টেবিল পাতানো থাকে, নাতিশীতোষ্ণ আরামদায়ক আবহাওয়ায় পরীক্ষা হয়।

কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষার আবহাওয়া হবে বড় ভয়ানক, অবস্থা খুবই গুরুতর, চারদিকে বিপদের আশঙ্কা, অন্তর থাকবে কম্পমান।

দুনিয়ার পরীক্ষায় গার্ড থাকে তোমার মতোই কোনো মানুষ। কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষায় গার্ড হবেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, তিনি না কোনো কিছু ভোলেন, আর না কোনো কিছু বিস্মৃত হন, তিনি সবকিছুকে ইলমের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন।

দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা অনেক বেশি, আর অকৃতকার্যের সংখ্যা তুলনায় কম। কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষায় কম পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হতে পারবে।

দুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সম্মান ও সার্টিফিকেট পায়; কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা জান্নাত লাভে ধন্য হয়।

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

---

১৩২. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৯।
১৩৩. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ৫৩।

'সুতরাং যাকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম হবে। বস্তুত পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১৩৪]

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأَعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ

'জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর রাস্তার মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। প্রতিটি স্তরের পরস্পরের মাঝে আসমান ও জমিনের ব্যবধান সমান দূরত্ব। তাই যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, তখন জান্নাতুল ফিরদাওস চাও। কারণ, এটা হচ্ছে জান্নাতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ স্থান আর তার ওপরেই দয়াময়ের আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ উৎসারিত হয়।'[১৩৫]

দুনিয়ার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে এক স্তর নিচে থেকে যেতে হয়, একটা স্তর কম পায়। দুনিয়ার অকৃতকার্যতা তো কিছুই নয়। কেননা, দুনিয়া তো আল্লাহর কাছে মাছির পাখার মতো। কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষার অকৃতকার্যতা মানে সব সময়ের অকৃতকার্যতা ও ক্ষতিগ্রস্ততা।

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

'বলুন, "ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে। জেনে রেখো, এটাই হলো সুস্পষ্ট ক্ষতি।"'[১৩৬]

---

১৩৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৮৫।
১৩৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০।
১৩৬. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ১৫।

দুনিয়ার পরীক্ষায় সর্বোচ্চ এতটা খারাপ ফলাফল হতে পারে যে, পরীক্ষার্থী ফেল করবে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকে। কিন্তু আখিরাতের পরীক্ষায় দ্বিতীয় কোনো সুযোগ নেই, এ পরীক্ষা থেকে পালানোরও কোনো অবকাশ নেই।

তখন ক্ষতিগ্রস্ত ও শিথিলতাকারী বলবে :

رَبِّ ارْجِعُونِ

'হে আমার রব, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন।'[১৩৭]

তখন কি কারও এমন আশা পূরণ করা হবে? কারও এমন চাওয়া কি পূরণ করা হবে?

যখন তারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, জ্বলন্ত আগুনের নিকটবর্তী হবে—তখন অবস্থা হবে :

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

'আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব।"'

তখন ধমক দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলবেন :

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

'আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল।'

---

১৩৭. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৯৯।

এরপর সবশেষে এ কথা বলা হবে :

فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

'কাজেই (শাস্তি) আস্বাদন করো; জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[১৩৮]

দুনিয়া থেকে সাবধান

জনৈক নেককার বলেন, 'যে দুনিয়ার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে, সে সতর্ক হয়। যে দীর্ঘ সফরের কথা নিশ্চিতরূপে জানে, সে সফরের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ওই ব্যক্তির বিষয়টি কতই না আশ্চর্যের! যে কোনো বিষয় নিশ্চিত জেনেও পরে তা ভুলে যায় আর মানুষকে ভয় করে; অথচ আল্লাহই একমাত্র যোগ্য সত্তা যে, কেবল তাঁকেই ভয় করা হবে।'

কবির কথায় :

'জীবন থেকে পাথেয় সংগ্রহ করো আখিরাতের জন্য, আল্লাহর জন্য আমল শুরু করো, সর্বোত্তম পাথেয় সংগ্রহ করো। দুনিয়ার প্রতি বেশি ঝুঁকে যেয়ো না যেন; কেননা, যত সম্পদই তুমি সংগ্রহ করো সবই নিঃশেষ হবে। তুমি কি সে দলের এমন সঙ্গী হতে চাও, যাদের সবার কাছেই পাথেয় আছে; কিন্তু তুমি রয়ে গেলে পাথেয়হীন?!'

না, আল্লাহর কসম, আমরা এমন হতে চাই না। আমরা চাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বোত্তম পাথেয় সংগ্রহের তাওফিক দিন।

মানুষ যখন দুনিয়ার অভিমুখী হচ্ছে, তখন তুমি আল্লাহর অভিমুখী হও।

মানুষ যখন দুনিয়া নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে, তখন তুমি আল্লাহর নৈকট্য নিয়ে আনন্দিত হও।

---

১৩৮. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৩৭।

মানুষ যখন তার বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্য গ্রহণ করছে, তখন তুমি আল্লাহকে নিজের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করো।

আল্লাহকে হৃদয়ের সবটা দিয়ে ভালোবাসো, তাঁর সামনে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাকে সম্মানিত করবেন, মর্যাদামণ্ডিত করবেন।

যখন তুমি মানুষকে দুনিয়ার বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত দেখবে, তখন তুমি আখিরাতের আমলে মশগুল হও।

যখন তুমি দেখবে, মানুষ তাদের বাহ্যিক অবয়বকে সাজানোতে ব্যস্ত, তখন তুমি তোমার আত্মিক অবয়বকে সাজিয়ে তোলো।

যখন মানুষ বাগান পরিচর্যা করে, প্রাসাদ তৈরি করে, তখন তুমি কবরের পাথেয় জোগাড় করো, কবরকে আবাদ করো।

যখন মানুষ অন্যের দোষত্রুটি তালাশে ব্যস্ত থাকে, তখন তুমি নিজের দোষত্রুটি তালাশ করে সেসব শুধরাতে থাকো।

এ দুনিয়া পাথেয় সংগ্রহের স্থান। এ দুনিয়াতে পাথেয় জোগাড় করে আখিরাতে পাঠাতে থাকো।

জনৈক নেককার বলেন :

'মুত্তাকিরা আগে চলে গেছে, আমরা ফিরে এসেছি পেছনে।

তারা সব মোহ ত্যাগ করেছে; কিন্তু আমরা বাঁধা পড়ে গিয়েছি দুনিয়ার সাথে।

তারা সত্যের বাহনে করে এগিয়ে গেছে আর নৈকট্যের সুঘ্রাণে অন্তরকে মোহিত করেছে।

কান্না তাদের অভ্যাস, ক্ষুধা তাদের খাদ্য, নীরবতায় তারা কথা বলে যায়।

রাত যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তারা জেগে জেগে ইবাদতে ব্যস্ত।

যখন সুবহে সাদিক ওঠার সময় হয়, তখনও তারা ক্ষমা প্রার্থনায় রত।'

দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ

দুনিয়বিমুখতা হচ্ছে অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্ত করা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ কত চমৎকার করে বলেছেন, 'মানুষের অন্তরের বিশৃঙ্খলা কেবল আল্লাহর দিকে অভিমুখী হলেই নিরাময় হয়। অন্তরের একাকিত্ব আল্লাহর সান্নিধ্যে আসলে তবেই ঘুচবে। অন্তরের উদ্বেগ কেবল আল্লাহকে জানার মাধ্যমেই দূর হবে। অন্তরের চিন্তাকে আল্লাহর নিকটে আসা ও তাঁর দিকে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই শান্ত করা সম্ভব।'

জনৈক নেককার বলেন, 'অন্তরের সুস্থতা পাঁচটি কাজে। এক. তাদাব্বুরের সাথে কুরআন তিলাওয়াত। দুই. পেট খালি রাখা। তিন. রাতের ইবাদত। চার. শেষ রাতের বিনম্র কান্না। পাঁচ. নেককারদের সাথে ওঠাবসা করা।'

জনৈক নেককার বলেন, 'দুনিয়াকে যদিও প্রস্ফুটিত ফুলের মতো লাগে; কিন্তু এটা জীবিত থাকে নশ্বরতার পানি দিয়ে।

যে জন দুনিয়াকে করেছ আপন, তুমি কি জানো না দুনিয়াও ধ্বংসশীল, তুমিও মরণশীল?

তুমি কি দেখছ না, দুনিয়াটা স্রেফ সে প্রেমিকার মতো, যে ভালোবাসার আশা দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে চলে যায়?

দুনিয়াতে যারা কত শত পাপ করেছে, কোথায় তারা, কেমন তাদের অবস্থা? তারা কি নিজেদের কর্মের ফল নিয়ে যায়নি সাথে? অবশ্যই যেমন কর্ম করেছে, তেমনই ফল পাচ্ছে।

তারা কি এখন কবরের অন্ধকারে নয়, একাকী বৃথা ক্রন্দনে লিপ্ত নয়?

সীমালঙ্ঘনের সিলসিলা শেষে এখন কি তারা লাঞ্ছিত-অপদস্থ নয়?

তারা যে পাথেয় তালাশ করেছিল, এখন কোথায় তাদের সে পাথেয়?

চির সত্য মৃত্যু এল, এখন তারা কি তেমন পেয়েছে—যেমনটা হবে বলা হয়েছে?

আল্লাহর কসম, তারা তো তা-ই পেয়েছে, যা অগ্রে পাঠিয়েছে...

তাদের মধ্যে কতক দুর্ভাগা, আর কতক সৌভাগ্যবান।'

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন :

وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আমার সম্মানের কসম, আমি আমার বান্দার মধ্যে দুই ভয় ও দুই নিরাপত্তা একত্র করব না। যদি সে আমাকে দুনিয়াতে ভয় করে, আমি তাকে আখিরাতে নিরাপত্তা দেবো। আর যদি সে আমাকে দুনিয়াতে ভয় না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে ভয়ের মধ্যে রাখব।'[১৩৯]

জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণে রাখো

উসমান বিন আফফান ﵁ যখন কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন অশ্রুতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'যখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলা হয়, তখন তো আপনি কাঁদেন না; কিন্তু কবরের কাছে এলেই এভাবে কাঁদেন কেন?!'

তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ

'কবর হচ্ছে আখিরাতের প্রথম মনজিল। যদি কেউ এখানে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তার জন্য বাকিটা সহজ হবে। আর যদি কেউ এখানে শাস্তি থেকে না বাঁচে, তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো তার জন্য আরও বেশি কঠিন হবে।'[১৪০]

---

১৩৯. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৪০।
১৪০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৬৭।

মুজাহিদ ﷺ বলেন, 'আদম-সন্তানের সাথে কবরের প্রথম কথা হবে এ রকম : আমি পোকামাকড়ের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি সঙ্গীহীন নির্জনতার ঘর, আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘর, আমি এগুলো রেখেছি তোমার জন্য, তুমি কী প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ?'

জনৈক নেককার বলেন, 'জাহান্নামের আগুন যতটুকু সহ্য করতে পারবে, ততটুকু পাপ করতে পারো। জান্নাতের জন্য ততটুকু আমল করো, যতটুকু তুমি তাকে মন থেকে চাও।'

আমাদের কেউ কি জাহান্নামের আগুন এক সেকেন্ডের জন্যও সহ্য করতে পারবে? আমাদের কারও মনে কি জান্নাতের চেয়ে বড় কোনো আশা আছে?

আল্লাহর বড়ত্বের কথা স্মরণে রাখো

আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করে দেখো। এ বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এ জমিন, ওই আসমান, সাগর-পাহাড়-পর্বতমালা সবই তাঁর সৃষ্টি। আরও কত অজানা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন! সব সময় আল্লাহর সাথে থাকার চেষ্টা করো; যাতে তিনি তোমার সাথে থাকেন সব সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখেন।'[১৪১]

সব সময় সেসব লোকের একজন হওয়ার চেষ্টা করবে, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাকে উত্তম আমল করার তাওফিক দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

১৪১. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৪।

'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোনো ক্ষতি নেই, কেননা) আল্লাহ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আর তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।'[১৪২]

খেয়াল করো, আল্লাহ বলছেন, (يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) 'তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।' আল্লাহ তাআলা জানেন যে, মানুষ জীবনের বহু দিক থেকে বহু কষ্ট-কাঠিন্যের সম্মুখীন হবে, এমন কণ্টকময় জীবন তাকে দ্বীনের বিপরীতে যেতে প্ররোচিত করবে, নফস ও শয়তান থেকে ওয়াসওয়াসা আসবে, এসব প্রতিরোধ করে দ্বীন অনুযায়ী জিহাদ ও অন্যান্য আমল তারাই করতে পারবে, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন।

রাসুল ﷺ-এর এ হাদিসটি মনে রাখবে :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'যার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে : এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছু থেকে তার কাছে বেশি প্রিয় হওয়া। দুই. কাউকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। তিন. কুফরিতে ফিরে যাওয়া সে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমনটা ঘৃণা করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।'[১৪৩]

---

১৪২. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫৪।
১৪৩. সহিহুল বুখারি : ১৬।

প্রথম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা : আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ভালোবাসা তার মন দখল করে রাখবে। এ ভালোবাসার ওপরে সে অন্য কোনো কিছুকে প্রাধান্য দেবে না। আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা। রাসুল ﷺ-কে ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তাঁর অনুসরণ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'বলুন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"'[১৪৪]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : মানুষকে ভালোবাসতে হবে দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য, কোনো ধরনের বাসনা বা দুনিয়াবি কোনো উদ্দেশ্যের জন্য নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে সে প্রচণ্ড ঘৃণা করবে, এ জন্য সে আদর্শ ও দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে রাখবে।

আম্মার বিন ইয়াসার ﷺ-এর মা সুমাইয়া ﷺ। এ পরিবারের সব সদস্যই আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছিলেন। আবু জাহেল এল সুমাইয়া ﷺ-এর কাছে। তাঁকে বলল মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বীকার করতে। সুমাইয়া ﷺ অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে কুফরি থেকে রক্ষা করেছেন, এখন আমি কুফরি বাক্যের দ্বারা নিজের জিহ্বাকে অপবিত্র করব না।' আবু জাহেল তাঁকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। ইসলামের প্রথম শহিদ।

১৪৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ৩১।

অন্তরকে শুদ্ধ, সুন্দর, নম্র ও জীবন্ত করে তোলো। আর মস্তিষ্ককে সচেতন, সতর্ক ও দূরদর্শী করে তোলো। সব ধরনের উপকারী জ্ঞান ও তথ্যে সজ্জিত করো মস্তিষ্ককে। জনৈক নেককার বলেন, 'যখন মানুষ বিভিন্ন রকম নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করে, তখন তুমি নিজের মস্তিষ্ককে কাজ দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করো।'

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا اكْتَسَبَ مُكْتَسِبٌ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمٍ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدًى

'কোনো উপার্জনকারীই ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের মতো অন্য কিছু অর্জন করতে পারেনি, ইলম তার ধারককে হিদায়াতের পথ দেখায় এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে।'[১৪৫]

দূরদর্শিতাকে রক্ষা করো। গুনাহ ও তাওবাহীনতা যেন তোমার দূরদর্শিতাকে ঢেকে দিতে না পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

'আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই।'[১৪৬]

জনৈক নেককার বলেন, 'আল্লাহর স্মরণে থাকা অন্তরের মুমিনগণ সব সময় আল্লাহর সন্তুষ্টির ছায়াতলে থাকে। কারণ, তারা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি ও রাসুল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। তারা সুখের সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করতে ভোলে না, বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর ফয়সালাতেই তাদের সন্তুষ্টি।'

---

১৪৫. আল-মুজামুল আওসাত : ৪৭২৬।

১৪৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৪০।

সত্যিই কি আমরা ইমানদার?

এক শিক্ষক তার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ইমানদার?'

- জি। আমরা ইমানদার। আলহামদুলিল্লাহ।

- তোমাদের ইমানের অবস্থা বলো?

- আমরা সুখের সময় কৃতজ্ঞতা আদায় করি, দুঃখের সময় ধৈর্য ধরি, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট।

- তাহলে তোমরা ইমানদার।

কবি সত্য বলেছেন :

ولست أرى السّعادة جمع مالٍ ••• ولكنّ التقيّ هو السّعيدُ

'আমি অঢেল সম্পদের সঞ্চয়ে সৌভাগ্য দেখি না, প্রকৃত সৌভাগ্যবান যে তাকওয়াবান।'

তাকওয়া ও ইহসান

তাকওয়া হলো, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তাতে যেন তিনি তোমাকে লিপ্ত না দেখেন। আর তিনি যা আদেশ করেছেন, সেটাতে যেন তোমাকে বিমুখ না দেখেন।

উমর বিন খাত্তাব ﵁ একবার উবাই বিন কাব ﵁-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই ﵁ বললেন, 'কখনো কি কাঁটাযুক্ত পথ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে?'

উমর ﵁ বললেন, 'হ্যাঁ।'

- তখন কী করেছেন?

- জামা গুটিয়ে প্রচণ্ড চেষ্টা করে কাঁটা এড়িয়ে সে পথ পার করেছি।

- ওটাই হলো তাকওয়া।

ওটাই তাকওয়া। কেবল কাঁটার জায়গায় গুনাহ আসবে। গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়াটাই তাকওয়া। মনের ভেতর সব সময় আল্লাহর বড়ত্বকে প্রোথিত রাখো। যত কাজ ও আমল করো, সবকিছু আল্লাহ দেখছেন এটা মনে রাখবে।

ইহসান কী? রাসুল ﷺ বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ; যদি তাঁকে নাও দেখে থাকো, তিনি তো তোমাকে দেখছেন।'[১৪৭]

কোনো কাজ করার আগে ভেবে নেবে, কাজটা কি তুমি মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য করছ, না আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের আশায় করছ?

আল্লাহ তাআলা ইমাম হাসান বসরির ওপর রহম করুন। তিনি বলেন :

'আল্লাহ সে বান্দার ওপর রহম করুন, যে কাজের আগে তার নিয়ত নিয়ে চিন্তা করে। যদি কাজটা আল্লাহর জন্য হয়, তাহলে সে কাজ চালিয়ে যায়। আর যদি কাজটা আল্লাহর জন্য না হয়, তাহলে সে তা ত্যাগ করে।'

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ তার এক গভর্নরের কাছে লেখেন :

'অতঃপর, সে ব্যক্তির মতো আমল করো, যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের কাজকে সংশোধন করেন না।' অর্থাৎ উত্তম আমলকারী হও।'

উমর ﵀ জানতেন যে, তাকওয়া বাহ্যিকতায় নয়; বরং অন্তরে তাকওয়ার বসবাস। যখন অন্তর নামের এ অঙ্গ ঠিক হয়ে যাবে, তখন পুরো দেহই ঠিক হয়ে যাবে।

১৪৭. সহিহুল বুখারি : ৫০, সহিহু মুসলিম : ৮।

পূর্ববর্তী আলিমরা একে অন্যকে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতেন :

'যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মাঝে সবকিছু ঠিক করে নিয়েছে, আল্লাহ তার ও মানুষের মাঝে সবকিছু ঠিক করে দেবেন।'

রাতের ইবাদতের মাধ্যমে, রাতের বেলা তাহাজ্জুদ, জিকির, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদতের স্বাদ ও খুশুর মজা অনুভব করো। আল্লাহ তোমাকে যা শিখিয়েছেন, সেটা তোমার আশপাশের মানুষকে শেখাও। ইমানকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন সবারই রয়েছে।

নবিজি ﷺ-এর হাদিস মনে রাখবে :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

'আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছে দাও।'[১৪৮]

আল্লাহর অভিমুখী হও... মনের যত কালিমা আছে, সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নাও। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মূল কথা এ নয় যে, তোমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য অঢেল ইলমের অধিকারী হতে হবে। বরং প্রত্যেক মুসলিম দ্বীনের যতটুকু সঠিক জ্ঞান রাখে, ততটুকু অন্যের কাছে পৌঁছে দিলে দাওয়াতের ফরজ আদায় হবে তার।

এসো, কিছু সময় ইমানের চর্চা করি

জনৈক নেককার বলেন, 'তোমাদের জন্য সর্বপ্রথম লড়াইয়ের ময়দান হচ্ছে, তোমাদের নফস। নফসকে যদি পরাজিত করতে পারো, তাহলে অন্য সবকিছু তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি নফসের জিহাদে পরাজিত হও, তাহলে অন্য সবকিছুতেও পরাজিত হবে। তাই নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা শিখে নাও।'

উমর বিন খাত্তাব ؓ বলেন, 'নেতৃত্ব দেওয়ার আগে দ্বীন বুঝে নাও।'

---

১৪৮. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬১।

সালাফে সালিহিনের মাঝে ইমানের চর্চা হতো। তারা পরস্পরকে বলতেন, 'এসো, কিছু সময় ইমানের চর্চা করি।'

এসো বোন, কিছু সময় আল্লাহকে নিয়ে আলোচনা করি, আশা করি তিনি আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার সুযোগ দেবেন, আমাদেরকে নেক আমল করার তাওফিক দেবেন।

উমর ﷺ বলেন, 'তিনটি জিনিস না থাকলে আমি দুনিয়াতে থাকতে চাইতাম না। এক. মধ্য রাতের তাহাজ্জুদ। দুই. উত্তম কথার মজলিশ, যে মজলিশে মানুষ এমনভাবে উত্তম কথা বলে, যেমন মানুষ বাগান থেকে ফল সংগ্রহ করে। তিন. মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের জন্য সে ঘোড়া প্রস্তুত করা, যা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে।'

ধৈর্যশীল মুমিন নারীর জান্নাতি জীবন কত যে সুখের হবে! কত সুন্দর হবে তোমার জান্নাতের জীবন! তোমার রব তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তুমি কি এ নিয়ামতে সন্তুষ্ট?'

তুমি বলবে, 'কেন সন্তুষ্ট হব না, আপনি তো আমার সব চাওয়া পূরণ করেছেন, আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়েছেন।'

রব বলবেন, 'আমি তোমাকে এর চেয়েও বেশি কিছু দেবো।'

এরপর তিনি তাঁর চেহারা থেকে পর্দা সরাবেন, তুমি তাঁকে দেখতে পাবে! যতক্ষণ তুমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকবে, ততক্ষণ অন্য কোনো কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপও করবে না।

কিন্তু কেউ নিজের কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে করতে জান্নাত লাভের সুযোগ হারায়। কারণ :

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

> 'জান্নাতকে বেষ্টন করা হয়েছে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা, আর জাহান্নামকে বেষ্টন করা হয়েছে বিভিন্ন খাহিশাতের দ্বারা।'[১৪৯]

---

১৪৯. সহিহ মুসলিম : ২৮২২।

আজ মুসলিম নারীরা তাদের আদর্শ থেকে কত দূরে! সালাফের যুগের মুসলিম নারীরা কোথায় আর আজকের মুসলিম নারীরা কোথায়! কত ব্যবধান!

আজ নারীরা পোশাক পরা, কথা বলা, সাজসজ্জা করতে গিয়ে কতভাবেই না শরিয়তের লঙ্ঘন করছে! এরপর যখন তুমি তাদের কাউকে নসিহত করতে যাবে, তখন সে বলবে, সব নারীই তো এমন করছে। আমার কি একলার দোষ! এত জনের ভিড়ে তাদের বিপরীত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বীনের আদর্শের ওপর অটল থাকা কোথায় গেল!

যে ঘর আগে কুরআন তিলাওয়াতে মুখরিত হতো, সে ঘর থেকে এখন গানের আওয়াজ আসে, নোংরা নাটক-সিরিয়ালের আওয়াজ আসে!

তবুও তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'যে মুসলিম আল্লাহর আনুগত্য করে, সে কিছু না কিছু পাপও করে। আবার যে মুসলিম পাপ করে যায়, সেও কিছু না কিছু ইবাদত করে।'

আদম-সন্তান মাত্রই ভুল করে। তবে সে ভুলকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তাওবা করে।

বর্ণিত আছে, কারুন সব সময় মুসা ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যেত। এমনকি এক নারীকে বহু সম্পদ দিয়ে তাকে এ কথা বলার জন্য রাজি করিয়ে নেয় যে, 'মুসা ﷺ তার সাথে জিনা করেছে!'

বনু ইসরাইলের মাঝে মুসা ﷺ কথা বলছিলেন। তখন এ নারী এসে গাল চাপড়াতে লাগল, চুল ছিঁড়তে লাগল।

মুসা ﷺ বললেন, 'কী হয়েছে? এ রকম করছ কেন?'

সে নারী সবাইকে দেখিয়ে বলল, 'এ লোক আমার সাথে জিনা করেছে।'

মুসা ﷺ হতভম্ব হয়ে বললেন, 'আল্লাহর দোহাই দিয়ে জানতে চাইছি, আমি এমন কিছু করেছি?'

নারী এবার বলল, 'না। আল্লাহর কসম।'

মুসা ﷺ বললেন, 'তাহলে এমনটা কেন বললে একটু আগে? কে তোমাকে এটা করার জন্য বলেছে?'

সে বলল, 'কারুন।'

মুসা ﷺ তখন বদদুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি কারুনকে কঠিন শাস্তি দিন।'

কারুন বসবাস করত স্বর্ণের বাড়িতে। তার বাড়ি জমিনে ধসে যেতে লাগল। সে ঘরের ভেতর স্থির জমাট হয়ে থাকল। এদিক সেদিক নড়াচড়া করতে পারছিল না। আল্লাহ বলেন :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

'অতঃপর আমি কারুন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দিলাম।'[১৫০]

ধীরে ধীরে বাড়িটা ধসে যেতে লাগল। কারুন তখন চিৎকার করে বলতে লাগল, 'বাঁচাও মুসা! বাঁচাও মুসা!' মুসা ﷺ তখন চুপ হয়ে থাকলেন। সাড়া দিলেন না। মুসা ﷺ তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি চাইলেন, আল্লাহ যেন কারুনকে তার বাড়িঘর সমেত জমিনের নিচে ধসিয়ে দেন।

আল্লাহ বললেন, 'মুসা, কেন তোমার অন্তর কঠিন হলো? আমার সম্মান ও মাহাত্ম্যের কসম, সে তোমাকে যে কথা বলে ডেকেছে, যদি সে কথায় আমার কাছে প্রার্থনা করত, তাহলে আমি তাকে উদ্ধার করতাম।'

তাই সব সময় মনে রাখবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। তাই যখন গুনাহ হয়ে যায়, তখন আল্লাহর কাছে তাওবা করো। যখন গুনাহ করতে অগ্রসর হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে বিরত থাকো।

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'মুমিন গুনাহ করে। এরপর বিষণ্ন মনে তাওবা করে কাঁদতে কাঁদতে জান্নাতে প্রবেশ করে।'

---

১৫০. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮১।

সাইদ বিন জুবাইর ﷺ বলেন, 'এমনও আছে যে, কেউ কোনো গুনাহ করে ফেলল। এরপর সে তাওবা করে এ গুনাহ তার চোখের সামনে ঝুলতে থাকতে থাকতে একসময় জান্নাতে প্রবেশ করে।'

আত্মসমালোচনা করো

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 'একজন বুদ্ধিমান চার কাজে সময় দেয়। এক. কিছু সময় সে তার রবের সাথে একান্ত আলাপনে থাকে। দুই. কিছু সময় আত্মসমালোচনায় কাটায়। তিন. কিছু সময় এমন বন্ধুদের সাথে কাটায়, যারা তার দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়। চার. কিছু সময় সে বৈধ উপভোগে কাটায়। এ শেষ সময়টা তাকে পূর্বোক্ত তিন সময়ে সহযোগিতা করে, তাকে শক্তি সঞ্চয় করে দেয়।'

উমর বিন খাত্তাব ﷺ কত সুন্দর করে অসিয়ত করেছিলেন,

'তোমাদের হিসাব গ্রহণের আগেই, নিজেই নিজের হিসাব (আত্মসমালোচনা) করে নাও। তোমাদের আমল ওজন হওয়ার আগেই, নিজেই নিজের আমল ওজন করে নাও। সর্বোচ্চ উপস্থাপনের দিনের জন্য প্রস্তুতি নাও। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ) "সেদিন তোমাদের (বিচারের জন্য) হাজির করা হবে আর তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না।"'[১৫১]

যখন কোনো নামাজে কমতি করো, তখন কিছু টাকা দান করে নিজেকে শাস্তি দাও।

যদি কখনো নেককার বোনদের বা আত্মীয়াদের সাথে সাক্ষাতে যেতে অলসতা আসে, তাহলে দ্রুত ছুটে যাও, নিজের নফসকে শাস্তি দাও।

নফসকে শিক্ষা দিতে কয়েক রাত নফল নামাজ আদায় করো। এটা তোমার আত্মসমালোচনা ও আত্মরক্ষায় সহযোগী হবে।

১৫১. সুরা আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ১৮।

যে যুগে ইমান ধরে রাখা হাতের ওপর কঙ্কর ধরে রাখার মতো, সে যুগে নেক আমলের প্রতিযোগিতা করো, ছোট-বড় সব নেক আমল করো, প্রত্যেক ময়দানে কিছু না কিছু ভালো কাজ করো। তুমি তো জানো না কোন আমল তোমার জান্নাতে যাওয়ার অসিলা হয়!

সহপাঠীদের কারও সাথে একটা দ্বীনি ভিডিও শেয়ার করলে, অথবা কাউকে পথে যেতে যেতে কিছু নসিহত করলে, এ সামান্য কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে গেলে!

এরচেয়ে বড় কিছু হচ্ছে, যদি তুমি গুনাহ থেকে বিরত থাকো, ইবাদতে অলসতা না করো। যারা শিথিলতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে গুনাহ করে যায় এবং গুনাহ করাকে তুচ্ছ বিষয় মনে করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন :

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

> 'আর তোমরা এটাকে নগণ্য ব্যাপার মনে করেছিলে; কিন্তু আল্লাহর নিকট তা ছিল গুরুতর ব্যাপার।'[১৫২]

এক লোক রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, অমুক নারী...' এ বলে লোকটি তার নামাজ, রোজা ও প্রচুর ইবাদতের কথা বললেন। সাথে বললেন যে, কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে জবান দিয়ে কষ্ট দেয়।

রাসুল ﷺ বললেন, 'সে জাহান্নামি।'

লোকটি বললেন, 'আল্লাহর রাসুল। অমুক নারী...' তিনি সে নারীর নামাজ, রোজা ও কম ইবাদতের কথা বললেন। এরপর বললেন, 'সে পনিরের মতো সামান্য কিছু দান করে; কিন্তু নিজের প্রতিবেশীকে জবান দিয়ে কষ্ট দেয় না।'

রাসুল ﷺ বললেন, 'সে জান্নাতি।'[১৫৩]

এক লোক উমর رضي الله عنه-এর কাছে এসে বললেন, 'আমাকে অসিয়ত করুন।'

---

১৫২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৫।
১৫৩. মুসনাদু আহমাদ : ৯৬৭৫।

উমর ﷺ বললেন, 'আমি তোমাকে তিন জিনিসের অসিয়ত করছি। এক. সব সময় আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার করবে। দুই. সব সময় মনে রাখবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। তিন. সব সময় মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ রাখবে।'

সময় বিবেচনা করো

হাসান বসরি ﷺ বলেন, 'আদম-সন্তান, তুমি কিছু দিনের সমষ্টি মাত্র। যখন একটি দিন চলে যায়, তখন মূলত তোমার একটা অংশ চলে যায়। এভাবে একটা অংশ যেতে যেতে তোমার সবটাই শেষ হয়ে যায়, তুমি শেষ হয়ে যাও।'

জনৈক নেককার বলেন, 'কর্মের তুলনায় সময় অনেক কম। তাই সময় ঠিকমতো সংরক্ষণ করো। যদি তোমার কোনো কাজ থাকে, তবে যথাসময়ে তা করে ফেলো।'

হাসান বসরি বলেন, 'প্রতিদিন ফজর ডেকে বলে, আদম-সন্তান, আমি এক নতুন সৃষ্টি। তোমার কর্মের সাক্ষী। তাই আমাকে গনিমত মনে করে যথাযথ ব্যবহার করো। কারণ, কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর ফেরত আসব না।'

কুরআন পড়ো

কেউ কেউ গান শুনতে পছন্দ করে বা সিনেমা দেখতে পছন্দ করে। তাদের দেখা যায় কখনো রেডিওয়ের চাবি ঘুরিয়ে চ্যানেল ধরার চেষ্টা করে বা নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম-সিরিয়ালের জন্য এক রকম ওত পেতে থাকে। এমন না হয়ে যদি তুমি কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে নাও, তোমার ব্যস্ততা হবে কুরআন নিয়ে, টিভি-রেডিওমুখী হলে না তুমি—কেমন হবে তবে?!

অনেক মেয়ে গল্প-উপন্যাস ও ম্যাগাজিন পড়ার মাঝে বুঁদ হয়ে থাকে, তাহলে তুমিও বুঁদ হয়ে থাকো, তবে সে সবে নয়, কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে! এভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে রাসুল ﷺ-এর দেখানো পথে চলে। প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে তুমি। কুরআন যার হৃদয় মাঝে বিরাজ করে,

যার কানে কুরআনের সুর বাজে, যার চোখে কুরআনের দৃশ্য ফুটে ওঠে, যার জিহ্বা কুরআনের স্বাদ নেয়, সে-ই তো সঠিক পথের দিশা পায়।

এক অমুসলিম। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর বলে, 'যদি দেখা-শুনার ইচ্ছে পূরণ হতো, তাহলে যথেষ্ট ছিল।'

আর আমরা মুসলিমরা বলব, 'যদি তোমার ইমানের নিয়ামত ও বোধশক্তি থাকত, তাহলে যথেষ্ট ছিল।'

তাই আল্লাহ তাআলা যত নিয়ামত দিয়েছেন, সেসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করো। এ দুআ সব সময় মনে রাখবে :

'হে আল্লাহ, আমাকে আবশ্যক কৃতজ্ঞতা আদায়ের শক্তি ও ধৈর্য দিন। নিয়ামতের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার শক্তি দিন। আমাকে বীরত্ব ও শক্তি দিন সে কাজ করার জন্য, যেটা আপনি আমার মাধ্যমে করাতে চান। আমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি ও প্রজ্ঞা দিন; যাতে আমি ভালো-খারাপের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি; যেন আমি সন্তুষ্টি ও কর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।'

- যখন তুমি দ্বীন আঁকড়ে থাকা কোনো মুসলিম নারীকে দেখো, তখন ভালোবাসা দিয়ে তাকে বোঝার চেষ্টা করো। তার সান্নিধ্য গ্রহণ করো। কারণ, আল্লাহর কাছে ভালোবাসার অনেক মূল্য।

রাসুল ﷺ একটি হাদিসে কুদসিতে বলেন :

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আমার সম্মান ও পরাক্রমের খাতিরে পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য নুরের তৈরি মিম্বার থাকবে। তাদের এ মর্যাদা দেখে নবিগণ ও শহিদগণও ঈর্ষা করবেন।"'[১৫৪]

---

১৫৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯০।

- সব সময় আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করে দুআ করবে। চাওয়ার মতো চাইবে। গুনাহর ক্ষমা ও জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপত্তা চাইবে। দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য চাইবে। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا

'নিশ্চয় তোমাদের রব চিরঞ্জীব, দানশীল। তাঁর কোনো বান্দা নিজের দুই হাত তুলে তাঁর নিকট দুআ করলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।'[১৫৫]

- তবে দুআর প্রতিফলন দেখতে তাড়াহুড়ো কোরো না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ إِبِطُهُ يَسْأَلُ اللهَ مَسْأَلَةً، إِلَّا آتَاهَا إِيَّاهُ مَا لَمْ يَعْجَلْ

'যে ব্যক্তি এমনভাবে দুআ করে যে, হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করে দুআ করতে করতে তার বগল পর্যন্ত দেখা যায়, তখন আল্লাহ তাকে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা দিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে।'

সাহাবিগণ জানতে চাইলেন, 'আল্লাহর রাসুল, তাড়াহুড়ো কেমন?'

রাসুল ﷺ বললেন, (يَقُولُ: قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ وَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا) 'সে (যদি এমন কিছু) বলে যে, "আমি চাইলাম, কত বার চাইলাম; কিন্তু পেলাম না কিছুই।"'[১৫৬]

- আল্লাহ তোমার দুআয় সাড়া দেবেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকো। রাসুল ﷺ বলেন :

ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ

---

১৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৮৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮৬৫।
১৫৬. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৬০৪।

- 'তোমরা দুআ কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করো। জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় অন্যমনস্ক উদাসীন মনের দুআ কবুল করেন না।'[১৫৭]

- আল্লাহর বিধান অমান্যকারী, প্রতিহতকারী, শরিয়ত প্রয়োগে শিথিলতাকারীদের পদস্খলন যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। অচিরেই এমন একদিন আসবে, যেদিন জালিমরা নিজেদের হাত কামড়ে বলতে থাকবে :

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا

'হায়, আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম!'[১৫৮]

- তোমার দ্বীন ও আকিদা নিয়ে গর্ব করবে। কারণ, তুমি আল্লাহর নিকট সম্মানিত।

- অভ্যাস ও আচার-আচরণে কাফিরদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবে। বরং ইসলামের আলোকে নিজেকে সাজিয়ে নেবে। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১৫৯]

সেসব দুঃসাহসী মহিলার ব্যাপারে কী বলবে, যারা বাজারে গিয়ে দোকানদারের সাথে হেসে-রসে কথা বলে! যেন কেউ তার স্বামী বা ভাইয়ের সাথে কথা বলছে, এতটা খুলে যায় দোকানদারের সামনে! এমনকি কখনো কখনো হাস্য-রস দুনিয়াবি মাত্রাও ছাড়িয়ে ফেলে। এ সবকিছু কেবল কিছুটা দাম কমানোর জন্য!

---

১৫৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪৭৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৮১৭।
১৫৮. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৭।
১৫৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১।

দেখা যায়, কোনো নারী ড্রাইভারের সাথে নির্জনে থাকে। তারা দুজন একা। যেখানে দুজন নারী-পুরুষ একা হয়, সেখানে তারা দুই থেকে তিন হয়ে যায়। কারণ, তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান।

এ নারী জানে যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করছে। আল্লাহর নিয়ামত দিয়েই সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছে! যদি আল্লাহ চান, তবে সাথে সাথে সেসব নিয়ামত উঠিয়ে নিতে পারেন।

বিশ্বাস হচ্ছে না! তাহলে হাসপাতালে গিয়ে দেখো। সেসব নারীর অবস্থা দেখো, যারা অসুস্থ। দেখো, তাদের মধ্যে কতক আছে মাত্র তারুণ্যে পা দিয়েছে, মাত্র যৌবনের ফুল ফুটেছে; কিন্তু তাদের কেউ হয়তো কেবল চোখ নাড়াতে পারছে, বাকি শরীর একেবারে নিথর হয়ে পড়ে আছে। যদি তুমি একটা ছুরি নিয়ে তার হাত-পা কেটে ফেলো, তবুও সে টের পাবে না।

আবার কেউ আছে এমন যে, তার আশা হচ্ছে, যদি কারও সাহায্য ছাড়া নিজেই ওয়াশরুমে যেতে পারত! তাদেরকে বাচ্চাদের মতো ডাইপার পরতে হয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য!

তোমার মতোই কেউ খাচ্ছে-দাচ্ছে, হাসছে-খেলছে, হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ করেই কোনো গাড়ি এক্সিডেন্টে অথবা ব্রেইন স্ট্রোকে নিথর হয়ে গেছে! ১০ বছর... ২০ বছর... অথবা তার চেয়েও বেশি সময় এভাবেই পড়ে আছে!

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ

'আপনি বলুন, "বলো তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে তোমাদের আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে?" দেখুন, আমি কীভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিদর্শনাবলি বর্ণনা করি। এরপরেও তারা বিমুখ হচ্ছে।'[১৬০]

১৬০. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৪৬।

তবে এর অর্থ এ নয় যে, যারাই হাসপাতালের বেডে এভাবে পড়ে থাকে, এভাবে অসুস্থ থাকে, তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত বা এসব তাদের হাতের কামাই। এ জন্য সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলতে হবে। কারণ, আল্লাহর ভয় যারা ত্যাগ করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উদ্বিগ্নতার কাছে হার মেনো না

জানি, প্রিয়জন হারানো বড় বেদনাদায়ক। কিন্তু মৃত্যু ছোট-বড়, ধনী-গরিব কারও মাঝেই পার্থক্য করে না। যার যখন মৃত্যু লেখা আছে, সে তো চলে যাবেই। তার সাথে গড়ে ওঠা স্মৃতিগুলো পীড়া দেবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কখনো এ কারণে নিজেকে অতীতের সাথে বেঁধে রেখো না। কোনো নিকটজন বা প্রিয়জনের মৃত্যুর পর উদ্বিগ্নতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ো না যেন।

মনে রাখবে, রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর শোক সামলে ওঠার মতো কেউই ছিল না। কিন্তু মুসলিমরা রিসালাতের পতাকা উঁচু রেখেছেন তাদের প্রিয় নবির মৃত্যুর পরও। তারা জীবনের চেয়েও প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেললেও উদ্বিগ্নতার হাতে নিজেদের সঁপে দেয়নি; বরং হিদায়াতের মশাল নিয়ে ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্বময়। অন্তরে অন্তরে ইমানের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন বহু মানুষের বুকে। তারা রাসুল ﷺ-এর দাওয়াত নিয়ে পুরো বিশ্ব জয় করে চললেন একে একে।

নিজের কল্যাণে খারাপ পরিস্থিতিকে মেনে নাও, নিজের করণীয় দায়িত্ব পালন করো। কখনো কখনো দুর্ভোগ আসে নতুন আশা নিয়ে; তাই উদ্বিগ্নতার সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজের ভেতরের শক্তি ও দক্ষতার উদ্ভাবন করে নাও। নিজের ভেতর দৃষ্টি দিয়ে দেখো, তোমার ভেতর কোনো সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে কি না।

অন্যদের কষ্ট নিয়ে ভাবো। তাদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও।

কোনো মানুষের সাথে নিজের মনকে এতটা জড়িয়ে ফেলো না যে, তার বিদায় তুমি মেনে নিতে পারছ না। কেননা, প্রত্যেক মিলনের পর বিচ্ছেদ তো রয়েছেই। জীবনের শেষে মৃত্যু তো আছেই।

আল্লাহর প্রশংসা করো যে, এসব বিপদ আরও বেশি ভয়ংকর হতে পারত; কিন্তু আল্লাহ সহজেই সারিয়ে দিলেন। উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলেন :

'আমার ওপর যখন বিপদ আসে, তখন আমি চার কারণে আল্লাহর প্রশংসা করি। এক. বিপদ আমার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করেনি। দুই. বিপদ ততটা কঠিন হয়নি, যতটা আসলে হয়ে থাকে। তিন. আল্লাহ আমাকে সে বিপদে ধৈর্য ধরার শক্তি দিয়েছেন। চার. কিয়ামতের দিন তিনি এ বিপদের জন্য আমাকে প্রতিদান দেবেন।'

হতাশা থেকে মুক্তির উপায় কী?

তরুণ বয়সে নিরাশা ও বিষণ্নতা আসা স্বাভাবিক। কে এমন আছে, যে উদ্বিগ্নতা ও হতাশার স্তর পার করে না?! কিন্তু...

- মনে রাখবে, দুনিয়ার কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। একইভাবে উদ্বিগ্নতাও স্থায়ী হবে না। এমনকি আনন্দও স্থায়ী হয় না। তাই যখন বিষণ্নতা বা নিরাশা অনুভব করো, তখন আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো যে, অচিরেই আল্লাহ এ বিপদ কাটিয়ে দেবেন। উদ্বিগ্নতার সময়ে পঠিতব্য দুআ পড়ো। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

- মনে রাখবে, হতাশা কেবল তোমার বয়সীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বড়রাও নিরাশার শিকার হয়। তবে অধিকাংশ সময় ছোটরা হতাশায় বেশি মুষড়ে পড়ে। কিন্তু যদি তোমার জীবনকে ব্যস্ততায় আটকে ফেলতে পারো, তবে সেটাই করো, কাজে ব্যস্ত থাকো, উপকারী কাজে সময় লাগাও।

- এ বিশ্বাস রাখবে যে, যত ধরনের চিন্তা-উদ্বিগ্নতার শিকার হবে তুমি, সবটার ওপরই তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে, সাওয়াব পাবে তুমি। রাসুল ﷺ বলেন :

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

'মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি সামান্য কাঁটাও যদি তার

দেহে বিঁধে, এ সবের কারণে আল্লাহ তার কিছু গুনাহ মাফ করে দেন।'[১৬১]

রাসুল ﷺ-কে সব সময় চিন্তায় থাকতে হতো বিবিধ কারণে। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। তাই হতাশ হোয়ো না, উদ্বিগ্ন হোয়ো না। আল্লাহ তাআলা তোমার ধৈর্যের ওপর তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

- বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো। তাঁর জিকিরের মাধ্যমেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। রাসুল ﷺ-এর শিখিয়ে দেওয়া দুআ মুখস্থ করে নাও, তিনি দুআ করতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের দাপট (আগ্রাসন) থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[১৬২]

- দ্বীনের ক্ষেত্রে যারা অগ্রগামী, সেসব বোনের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলো। তাদের সঙ্গ গ্রহণ করো। শয়তানের বিরুদ্ধে তাদের সঙ্গকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করো।

- যখনই দুনিয়া তার কাঠিন্য নিয়ে আসে, তখনই সর্বোচ্চ প্রিয়জনের কাছে ফিরে আসো। তাঁর কাছে আশ্রয় নাও। তাঁর দরজায় এসে নিজেকে সঁপে দাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে সঠিক দিশা দেখিয়ে দেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

---

১৬১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৪১।
১৬২. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৩।

'কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে? কে বিপদাপদ দূর করেন? এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'[১৬৩]

১৬৩. সূরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।
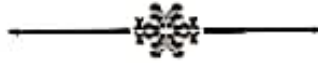
সপ্তদশ অধ্যায়

তুমি একজন দায়ি

দাওয়াতের কাজ ইসলাম পুরুষদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং নারীরাও এ দায়িত্ব পালন করেছেন যথাযথভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে, আর তারাই হলো সফলকাম।'[১৬৪]

নারীদের ওপরে দাওয়াতের দায়িত্বের ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে :

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

'তোমরা সংগত কথা বলবে।'[১৬৫]

আর যেহেতু নারীদের সাথে বিশেষায়িত বিষয়াদিতে নারীরা বেশি স্পষ্ট করে কথা বলতে পারবে অথবা অনেক নারী পুরুষের কাছে এসব বিষয় জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করতে পারে, তাই নারীরাই নারীদেরকে এসব বিষয়ে জানাবে এবং শেখাবে।

---

১৬৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৪।
১৬৫. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩২।

ইবনে আরাবি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা এখানে রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীদের আদেশ দিয়েছেন, তাঁরা যেন তাঁদের পরিবারসম্বন্ধীয় নাজিল হওয়া কুরআনের আয়াত ও তার মর্ম, তাঁদের সাথে রাসুল ﷺ-এর কর্ম ও বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন; যাতে সবাই তা জানতে পারে এবং রাসুল ﷺ-এর যথাযথ অনুসরণ করতে পারে।'

প্রথমে নিজেকে গুছিয়ে নাও

ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত হও। ইসলামের শিক্ষায় জীবন পরিচালনা করো। অন্যকে ইমান ও আমলের দিকে ডাকো। কিন্তু কখনো কারও ব্যাপারে তাড়াহুড়ো কোরো না। কেননা, সময় নিজেই একজন চিকিৎসক, সময় নিজেই একজন দায়ি। শিক্ষা-দীক্ষায় ধীরে ধীরে আগানোই উত্তম। এমনটাই শরিয়তের শিক্ষা।

বোন, সতর্ক থাকবে, কখনো ইসলামের কোনো বিধান পালনে শিথিলতা করবে না। ফরজসমূহ ঠিকমতো পালন করো, বেশি বেশি নফল আদায় করো। হারাম থেকে, মাকরুহ ও সন্দেহজনক কাজগুলো থেকে বিরত থাকো।

গোপনে ও প্রকাশ্যে পরিচ্ছন্ন হও সব রকম পঙ্কিলতা থেকে। যদি গুনাহ হয়ে যায় বা কমতি হয়ে যায় বা কোনো কিছুতে শিথিলতা হয়ে যায়, তবে তাওবা করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নাও। বিশ্বাস রাখো, আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুলকারী ও দয়াময়। এরপর একনিষ্ঠতার সাথে সৎপথের ওপর অবিচল থাকো।

তোমার জীবনের লক্ষ্য

জীবনের একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করো। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিজেকে ব্যস্ত রাখবে তুমি। নিজেকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কী চাও?

সম্পদ?

সুদর্শন যুবক?

মানুষের প্রশংসা?

উচ্চ শিক্ষা ও ক্যারিয়ার?

নাকি তুমি চাও আল্লাহকে?!

এ উম্মতের এখন এমন মায়েদের প্রয়োজন, যাদের জীবনের লক্ষ্য সুদর্শন যুবকের সাথে বিয়ে করা হবে না, যারা রাস্তার ভবঘুরে যুবকদের কথায় ভুলবে না। এমন মায়েদের দরকার, যারা নিজেদের চেহারায় বেয়ে পড়া অজুর পানিকে সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হিসেবে দেখবে, যাদের আচরণে লজ্জা থাকবে, যারা পূর্ণরূপে পর্দা করবে।

মনে রাখবে বোন, মানুষ যে রূপ দেখলে তোমাকে পছন্দ করবে, সে রূপ ঢেকে রাখার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন। তুমি কি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে!

ম্লান মুখে সমাজের দিকে তাকিয়ো না। এটা তোমাকে কষ্ট ও হতাশাই দেবে যে, তুমি তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলবে, এ সমাজ ইসলাম থেকে কত দূরে... এ সমাজে কোনো কল্যাণ নেই, কোনো আশা নেই!...

বরং তুমি সব সময় আল্লাহর এ বাণী স্মরণে রাখবে :

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

'(হে রাসুল) আপনি আকাঙ্ক্ষা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়।'[১৬৬]

---

১৬৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১০৩।

বিশেষ মুসলিম যুবতি হও তুমি

হয়তো তুমি কোনো শিক্ষাঙ্গনের প্রাঙ্গণে অথবা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে। তুমি এমন সময়ে উপনীত হয়েছ, এমন বয়সে উপনীত হয়েছ, যখন তোমার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হবে। তাই তোমাকে বলা প্রয়োজন...

- সর্বপ্রথম আল্লাহর ওপর ভরসা করো। এরপর আত্মবিশ্বাস রাখো। তবে অহমিকায় পা দিয়ো না।

- নিজের ব্যক্তিত্বকে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করো। নিজের ব্যক্তিত্বকে স্থাপন করো। তবে হঠকারিতা বা অহংকারে পড়ো না যেন।

- তোমার আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নাও। তবে বেশি স্বেচ্ছাচারী হোয়ো না।

- যত ইচ্ছে ও স্বপ্ন আছে, তার সব পূরণ করতে গিয়ে নফসের কামনার জালে পড়ো না। কারণ :

• নফস অনর্থকতা ও অলসতা পছন্দ করে; কিন্তু তুমি তো অলসতা ও শিথিলতা করতে পারো না।

• নফস বিলাসিতা ও বাহ্যিক সৌন্দর্যকে পছন্দ করে। এ ক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি-প্রজ্ঞা কাজে লাগাও। বিলাসিতা না করে মিতব্যয়ীর পোশাক পরো।

• নফস পানাহারের প্রতি লোলুপ হয়; তাই খাবারে অপচয় কোরো না। নিজের ওজন ও গড়নের প্রতি খেয়াল রাখো।

• ইমানের অস্ত্রে সজ্জিত হও; যাতে তোমার ইচ্ছাশক্তি মজবুত হয়; যেন তুমি নফসে আম্মারার ওপর বিজয়ী হতে পারো।

মনে রাখবে, যখন অন্যরা তোমার অভিমত নেয়, তোমার পরামর্শ নেয়, তোমাকে শোনার সময় নীরব থাকে, তখন তুমি সে একজন 'বিশেষ মুসলিম যুবতি' হতে পারলে আল্লাহর রহমতে। তখন এ নিয়ামতের শুকরিয়ায় আল্লাহর প্রশংসা করো। আলহামদুলিল্লাহ বলো। এমন স্বতন্ত্রতার ওপরে আরও বেশি জোর দাও। আরও বেশি ইলম শেখো, আরও বেশি ইসলামি সংস্কৃতি আপন

করে নাও। তোমার বোন ও বান্ধবীদের মধ্যে এ কল্যাণ ছড়িয়ে দাও। তুমি এখন দেওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছ। দাওয়াত দাও, আমল করে আল্লাহর কাছে বিনিময়ের দুআ করো।

আমরা অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত

কামার লোহা পিটিয়ে শত কষ্টে জীবনের ময়দানে নতুন পণ্য নিয়ে আসে...

কাঠমিস্ত্রি কাঠ খোদাই করে, কেটেকুটে নতুন কিছুর সৃজন করে...

তেমনই দ্বীনের দায়িগণ হচ্ছে জীবনের কারিগর, তারা মানুষের মতো নতুন প্রাণের সঞ্চার করে...

- কুরআনের উদ্দেশ্যাবলি বোঝার চেষ্টা করো। কেবল আক্ষরিক অর্থ বুঝতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হোয়ো না, এমন হোয়ো না কুরআনের আয়াতের ভুল উপলব্ধি নিয়ে যে,

  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

  'হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব। যদি তোমরা সৎপথে থাকো, তাহলে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'[১৬৭]

এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করা চলে না। এ জন্য আয়াতের শানে নুজুল ও প্রেক্ষাপট জানতে হবে। এ আয়াত দাওয়াত দেওয়াকে নিরুৎসাহিত করে না; বরং এখানে হঠকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে ধমক দেওয়া হয়েছে।

- তোমার কথায় বেশি বেশি কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দাও। মানুষের জীবনের ঘটনা বা ইতিহাস বলার পরিবর্তে উদ্দেশ্য সফল হয় এমন কুরআনিক ঘটনা শোনাও। প্রচলিত প্রবাদের মতো কিছু ব্যবহারের পরিবর্তে কুরআনের কোনো বক্তব্য তুলে ধরাই শ্রেয়।

---

১৬৭. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১০৫।

দাওয়াতের পদ্ধতি

সত্যকে বিজয়ী করতে জোর করে সত্য বোঝাতে যেয়ো না, তাহলে মানুষকে হারাবে, মানুষ তোমার থেকে দূরে সরে পড়বে।

বরং তুমি নম্রভাষী হও, দাওয়াতের ক্ষেত্রে ও আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান হও।

সেসব উপলক্ষ ও সুযোগ কাজে লাগাও, যখন তোমার দাওয়াত সফল হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা থাকে।

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
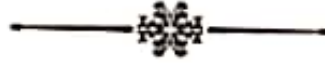
তথ্যসূত্র

১. নাজাহ জামিল হাশিম কৃত আদওয়াউন আলাত তরিক, সাহার প্রেস, জিদ্দা।

২. ইতিসাম আহমাদ কৃত আল-মারআতু ফি রাকবিল ইমান, দারুল ইতিসাম, কায়রো।

৩. মাজদি ফাতহি কৃত উখতাহু আলা তাশতাকিনা ইলাল জান্নাহ, দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৪২১ হিজরি।

৪. মুহাম্মাদ রশিদ কৃত লাহজাতুন ইয়া বানাত, মাকতাবাতুল মানারিল ইসলামিয়া, কুয়েত।

৫. মুহাম্মাদ সায়িদ রমাদান আল-বুতি কৃত ইলা কুল্লি ফাতাতিন তু'মিনু বিল্লাহ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৮৩ ইসায়ি।

৬. আবুল ফুতুহ মানসুর কৃত হামসুল কুলুব ১, দারুল উলুম, শারজাহ, ২০০০ ইসায়ি।

৭. মাজদি ফাতহি কৃত উখতাহু নাফসুকা ফাজাহিদি, দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৪২১ হিজরি।

৮. ড. হাফিজ নাজাহ কৃত উখতাহু ইন্নি উহিব্বুকা ফিল্লাহ, দারুল মুজাতামা লিন নাশরি ওয়াত তাওজি, জিদ্দা, ১৪১৯ হিজরি।

৯. আবুল আতা নাজমি খলিল কৃত রিসালাতুন ইলাল উসরাতিল মুসলিমা, মাকতাবাতুন নুর, কায়রো।

১০. ড. উমর নাসির সুলাইমান কৃত ফাতায়াতুনা বাইনাত তাগরিব ওয়াল আফাফ, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ।

১১. ড. আয়িজ আল-কারনি কৃত রিসালাতুন ইলা ফাতাতিল ইসলাম, রিয়াদ।

১২. আলি তানতাবি কৃত ইয়া বিনতি, দারুল মানারাতি লিন নাশরি ওয়াত তাওজি, জিদ্দা, ১৯৯৮ ইসায়ি।

১৩. আবুল ফুতুহ মানসুর কৃত হামসুল কুলুব ২, দারুল উলুম, শারজাহ, ২000 ইসায়ি।

১৪. মাজদি ফাতহি কৃত উখতাহু আলা তুখাফিনাল কাবর, দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৪২১ হিজরি।

১৫. মুহাম্মাদ কুতুব কৃত কদইয়াতু তাহরিরিল মারআহ, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, ১৪১০ হিজরি।

১৬. ড. আকরাম রিজা, ইয়াসআলুনানি, দারুত তাওজি ওয়ান নাশরিল ইসলামিয়া।

১৭. ড. ওয়াহবাহ জুহাইলি কৃত আত-তাফসিরুল মুনির, দারুল ফিকর, দিমাশক।

১৮. ড. ইউসুফ কারজাবি কৃত ফাতাওয়া মুআসারা।

১৯. ড. মুহাম্মাদ সায়িদ রমাদান আল-বুতি কৃত মাআন নাস (মাশওয়ারাতুন ওয়া ফাতাওয়া), দারুল ফিকর, দিমাশক।

২০. মুহাম্মাদ গাজালি কৃত কাজায়াল মারআহ, দারুশ শুরুক, কায়রো।

২১. কুরতুবি কৃত আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

২২. আলি তানতাবি কৃত ফাতাওয়া, দারুল মানারাহ, জিদ্দা।

২৩. আব্দুল হামিদ বিলালি কৃত উখতি গাইরাল মুহাজ্জাবাতি, মাল মানিউ মিনাল হিজাব? দারুদ দাওয়াহ, কুয়েত, ১৯৯৩ ইসায়ি।

২৪. মুহাম্মাদ আলি আবশিহি কৃত রাসায়িলুন ইলা ইবনাতি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৯৮৪ ইসায়ি।

২৫. মুহাম্মাদ রশিদ আবিদ কৃত তাআম্মুলাতু মুসলিমিন, দারু ইবনি হাজম, বৈরুত ১৯৯৭ ইসায়ি।

২৬. ড. মুহাম্মাদ বিন লুতফি আস-সাব্বাগ কৃত তাহরিমুল খালওয়াতি বিল মারআতিল আজনাবিয়া, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮০ ইসায়ি।

২৭. ড. সালমান ফাহাদ আওদাহ কৃত দালিলুত তালিবাতিল মুমিনা, মাকতাবাতুল উম্মাহ, আল-কাসিম, ১৪১১ হিজরি।

২৮. মুহাম্মাদ রশিদ আবিদ কৃত হিওয়ারুন মাআ ইবনাতি, দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৯৯৯ ইসায়ি।

২৯. তাইসির আহমাদ জাবিদ কৃত বারজুকি হাজাশ শাহর, দারু ইবনি হাজম, বৈরুত, ২০০২ ইসায়ি।

৩০. সাইয়িদ মাজদি ফাতহি কৃত উখতাহু আইনা আনতি মিনাল কুরআন? দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৪২২ হিজরি।

৩১. মুহাম্মাদ বিন রিয়াদ আহমাদ কৃত আল-আফাফ, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ২০০৪ ইসায়ি।

৩২. মুহাম্মাদ বিন রিয়াদ আহমাদ কৃত রাসায়িলুন ইলা মুমিনা, আলামুল কুতুব, বৈরুত, ২০০৪ ইসায়ি।

৩৩. খালিদ আব্দুর রহমান কৃত শাখসিয়াতুল মারআতিল মুসলিমা ফি দুয়িল কুরআন।

৩৪. মুহাম্মাদ রশিদ আবিদ কৃত মিন আজলি তাহরিরিন হাকিকিয়িন লিল মারআহ, দারু ইবনি হাজম, বৈরুত।

৩৫. ড. লাইলা আহদাব কৃত আসয়িলাতুন মুহারাজাহ ওয়া আজুবাতুন সারিহা।

৩৬. সাইয়িদ মাজদি ফাতহি কৃত উখতাহু লি মিসলি হাজা ফাআয়িদ্দি, দারুল মুহাম্মাদি, রিয়াদ, ১৪১৬ হিজরি।

৩৭. ইসলাম অনলাইন কৃত নাহওয়া বুলগিন আমনিন, মাতবুআতু ইসলাম অনলাইন, কাতার, ২০০২ ইসায়ি।

৩৮. ড. লাইলা আহদাব কৃত নাহওয়া হায়াতিন বিলা মাশাকিল, মাশাকিলুন শাবাবিয়্যা, মারকাজুর রয়াতি লিত তানমিয়াতিল ফিকরিয়া, দিমাশক, ২০০৩ হিজরি।

৩৯. ফাওজিয়া সালামাহ কৃত মাশাকিলুল বানাত, মাডবুলি বুকশপ, কায়রো, ১৯৯৪ হিজরি।

৪০. মারইয়াম খুমাইস কৃত সুবুলুল ইফফাহ ওয়া খুতুরাতুল ইনহিরাফি ওয়া আসবুবুহু, দারুল ওয়াফা, আল-মানসুরা, ১৯৯৭ ইসায়ি।

৪১. মাজদি ফাতহি কৃত উখতাবু আহজিরি সুয়াল খাতিমাহ, দারুল মুহাম্মাদিয়া, রিয়াদ, ১৪৪২ হিজরি।

৪২. ক্রিস ডেস্টোপ কৃত তিজারাতুন নিসা ফি উরুব্বা, আল-আহালি লিত-তবাআতি ওয়ান নাশর, দিমাশক, ১৯৯৭ ইসায়ি।

৪৩. ড. মুহাম্মাদ ফাহাদ কৃত ইয়াসআলুনানি আনিত তাহাররুশিল জিনসি, মাকতাবাতুল মানার, কুয়েত, ২০০০ ইসায়ি।

৪৪. ওয়াহবি সুলাইমান কৃত আল-মারআতুল মুসলিমা (ওয়া লাইসাজ জাকারু কাল উনসা), দারুল কলম, দিমাশক, ১৯৯৯ ইসায়ি।

৪৫. হাইদার কিফাহ কৃত আল-মুসলিমাতুল মুআসারা : ইলতিজামুন ওয়া দাওয়াতুন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৯৫ ইসায়ি।

৪৬. হায়দার কিফাহ কৃত আল-মুসলিমাতুল মুআসারা... ইলা আইনা, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত।

৪৭. আব্দুল মুতাআলি কৃত আল-মুসলিমাতুল আসরিয়া ইনদা বাহিসাতিল বাদিয়া, দারুল আনসার, ১৯৮১ ইসায়ি।

৪৮. ড. নাজাহ হাফিজ কৃত রিসালাতুন ইলা ইবনাতি (নাসিহাতুন লিকুল্লি বিনতিন), দারুল ফাজিলাহ, কায়রো।

৪৯. ড. মুহাম্মাদ আলি কৃত আমালুল মারআতি ফিল মিজান, আদ-দারুর সাউদিয়াহ, জিদ্দা।

৫০. ড. মুস্তফা সিবায়ি কৃত আল-মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানুন।

৫১. ড. ফাতিমা নুসাইফ কৃত হুকুকুল মারআতি ওয়া ওয়াজিবাতুহা ফি দুয়িল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, তিহামাহ, জিদ্দা, ১৯৯২ ইসায়ি।
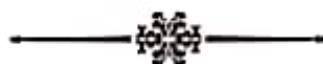
প্রিয় বোন, আপনি কি জানেন, আপনি আপনার জীবনের ফায়সালাকারী দিনগুলো পার করছেন? এই সময়গুলো আপনি কীভাবে কাটাচ্ছেন সেটিই ঠিক করে দেবে কেমন হবে আপনার অনাগত ভবিষ্যৎ। আমরা তো বলব, আপনি আসলে কৈশোর কিংবা যৌবনের দিনগুলো পাড়ি দিচ্ছেন না; বরং আপনি আপনার ভবিষ্যৎ গড়ছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ার বিষয়টি কি আপনার মাথায় আছে?

আমরা জানি, আপনি জীবনের এপারে যেমন ওপারেও অনেক বড় হতে চান, অনেক সুন্দর হতে চান, অনেক শ্রেষ্ঠ হতে চান। আপনি উভয় জাহানে কল্যাণ ও সাফল্যের সোনা ফলাতে চান। তাই না? কিন্তু বিষয়টি খুব একটা সহজ নয়। কারণ, বর্তমান জাহিলি সমাজব্যবস্থার অভিশাপে আপনার কৈশোর ও যৌবনের পথগুলো ঝোপঝাড়, খানাখন্দ আর আলো-আঁধারিতে পরিপূর্ণ। তার ওপর কুপ্রবৃত্তি, শয়তান, জিন্নাত ও খান্নাস প্রতিটি মুহূর্ত লেগে থাকবে আপনার পেছনে। ইন্টারনেটের অন্ধকার জগৎ আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ফেসবুক, ইউটিউব, অসৎসঙ্গ আপনার কৈশোর ও যৌবনের সোনাফলা উর্বর দিনগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা আর দুর্দমনীয় জৈবিক তাড়না আপনার দাম্পত্য জীবনের মধুর আয়োজনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইবে। আপনার পাশে যদি কোনো গাইড না থাকে কিংবা আপনার হাতে যদি কোনো গাইডবুক না থাকে, তাহলে আপনার গন্তব্যে পৌঁছা বেশ কঠিন।

প্রিয় বোন, কৈশোর ও যৌবনের দুর্গম পথগুলো সফলভাবে পাড়ি দেওয়ার শুভকামনা নিয়ে আপনাদের প্রিয় পাবলিকেশন রুহামা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে অসাধারণ এই গাইডবুক : 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণী'।...